রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

ছন্দোগুরু

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিবেদন

তেইশ বছর আগে (১৩২৮ ফাল্গুন) বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। প্রায় এক বছর পরে সেটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৩২৯ পৌষ-চৈত্র, ১৩৩০ বৈশাখ)। আমি তখনই অনুভব করি যে, বাংলা ছন্দের অধিকাংশ বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা; বস্তুত বাংলা কাব্যে যে অজস্র ছন্দের ব্যবহার চলছে তার প্রায় সবগুলিই হয় রবীন্দ্রনাথের রচিত, না-হয় তাঁর দ্বারা পরিমার্জিত; তাঁর নিজের উদ্‌ভাবিত ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা তো বলাই বাহুল্য, প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগেরও এমন কোনো ছন্দ নেই যা তাঁর স্বাভাবিক ছন্দপ্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে উজ্জ্বলতর ও নবতর রূপ ধারণ না করেছে। তার দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে "বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি বিশ্বভারতীকর্তৃক প্রকাশিত 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' পুস্তকে মুদ্রিত হয়। পরে কিছু পরিবর্তিত ও সংশোধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হয়ে স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপেও প্রকাশিত হয়। এটি রচনা করতে গিয়ে অনুভব করি একটিমাত্র প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে রবীন্দ্র-ছন্দের যথোচিত বিশ্লেষণ দূরে থাকুক তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়াও দুঃসাধ্য। তখনই রবীন্দ্র-ছন্দের ঐতিহাসিক ও নীতিগত পূর্ণ পরিচয় দিয়ে একখানি বই লেখার সংকল্প প্রকাশ করি (বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ পৃ ১০৬)। কিন্তু নানা কারণে তখন সে সংকল্প কার্যে পরিণত হয়নি। আরও দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে উক্ত পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় (১৯৪১ মে) Rabindranath and Bengali Prosody নামে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখি। এই উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথের

ছন্দের উপর বই লেখার পূর্ব সংকল্পটি আবার মনে উদিত হয়। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটে। সেই সময়ে পূর্বাশা-সম্পাদকের অনুরোধে উক্ত পত্রিকার 'রবীন্দ্রস্মৃতি'-সংখ্যায় (১৩৪৮ আশ্বিন) "রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে যে প্রেরণা অনুভব করি তারই ফলে রবীন্দ্র-ছন্দ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই এবং ১৩৪৮ সালের পূজার ছুটিতেই এটি সমাপ্ত হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় তখন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এক হিসাবে তা ভালোই হয়েছে। ঠিক এই সময়েই আমি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে বিশ্বভারতীতে বাংলাসাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হই এবং কিছুকাল পরেই শান্তিনিকেতনে আসি। এখানে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করার যে সুযোগ ঘটে এই গ্রন্থের উন্নতিসাধনে তার সদ্‌ব্যবহার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যে-সমস্ত নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি প্রয়োজনমতো সে-সমস্তই এর অন্তর্ভুক্ত করেছি, বস্তুত এই অবকাশে গ্রন্থখানি অনেকাংশেই পুনর্লিখিত হয়েছে। রচনাসমাপ্তির প্রায় চার বৎসর পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের আনুকূল্যে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে।

সাহিত্যের কোনো বিশেষ অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনামূলক পুস্তক প্রকাশ করা নিঃসন্দেহেই দুঃসাহসের কাজ। বাংলা দেশে বিশেষজ্ঞ পাঠকের সংখ্যা খুবই বিরল। তাই সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রেখেই পুস্তকখানি রচনা করতে হয়েছে। ফলে বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান ও কৃতিত্ব কি, সে আলোচনা-প্রসঙ্গে বহুস্থলেই বাংলা ছন্দের সাধারণ ও বিশেষ নীতিগুলির ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। এজন্যে পুস্তকখানি একাধারে সাধারণ ছন্দ-ব্যাকরণ ও রবীন্দ্র-ছন্দের আলোচনার রূপ ধারণ করেছে। একই গ্রন্থে এই উভয়প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ করা সহজ নয়। এ-বিষয়ে কতখানি কৃতকার্য হয়েছি সে বিচার করার অধিকারী আমি নই।

এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আলোচনায় কিভাবে অগ্রসর হয়েছি সে বিষয়ে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে যতরকম ছন্দ প্রচলিত আছে তার মধ্যে কোন্‌গুলি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্‌ভাবিত ও প্রবর্তিত শুধু তাই দেখিয়ে এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই আমি নিরস্ত হইনি। রবীন্দ্র-ছন্দের ক্রমবিকাশ তথা অন্যান্য কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের তুলনা এবং বাংলা ছন্দের বিবর্তনে তার স্থান নির্ণয়, ইত্যাদি ঐতিহাসিক আলোচনাতেও প্রয়াসী হয়েছি। প্রয়োজনমতো সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ছন্দের প্রসঙ্গও উত্থাপন করতে হয়েছে। বলা উচিত যে, এসব বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হইনি। গ্রন্থের আয়তন, পাঠকের প্রয়োজন ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করে আমাকে সংযত হতে হয়েছে। তা-ছাড়া ছন্দ সম্বন্ধে একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থে রবীন্দ্র-ছন্দ আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ের আলোচনা করেছি, পুনরুক্তি নিবারণের উদ্দেশ্যে সেগুলিও এ-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিনি।

ছন্দের আলোচনা নিয়ে কিছুকাল পূর্বে (১৩৩৮-৩৯) বাংলাসাহিত্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সে বিতর্কের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আমাকে কয়েক বার ছন্দ-বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।[১] এখানে বলে রাখা ভালো যে, ছন্দের বিশ্লেষণ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য খুবই কম, মতভেদ প্রধানত পরিভাষা নিয়ে। এই পুস্তকে আমি সমস্ত বিতর্ক পরিহার করে আলোচ্য বিষয়কে যথাসাধ্য সরলভাবে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছি। প্রায় এক পাদশতাব্দী কালের (১৩২৮-৫১) আলোচনা ও অভিজ্ঞতায়

১ এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি প্রধানত দ্রষ্টব্য

লেখকের—বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ (বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ), ছন্দ-জিজ্ঞাসা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব (ঐ মাঘ ও ফাল্গুন), তৃতীয় পর্ব (ঐ ১৩৩৯ বৈশাখ), বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ (পরিচয় ১৩৩৯ বৈশাখ), ছন্দ-বিচার (বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ), বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ (ঐ ভাদ্র)।

রবীন্দ্রনাথের—বাংলা ছন্দ (বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ), পুনশ্চ বক্তব্য (বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ), ছন্দ-বিতর্ক (পরিচয় ১৩৩৯ শ্রাবণ) নবছন্দ (ঐ কার্তিক)।

আমি যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি শুধু তাই এখানে উপস্থাপিত করেছি। বলা নিষ্প্রয়োজন, দীর্ঘকালের আলোচনায় মতেব বিবর্তন ঘটা অনিবার্য। এই পুস্তকে আমি আমার সর্বশেষ অভিমতই ব্যক্ত করেছি। পরিভাষারচনা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। অধিকাংশ পরিভাষাই আমার কৃত; অন্যের কৃত যে-সব পরিভাষা গ্রহণীয় বলে বোধ করেছি সেগুলি অসংকোচে স্বীকার করে নিয়েছি। অনাবশ্যকবোধে এ-গ্রন্থে পারিভাষিক শব্দগুলির যাথার্থ্য বিচারে বেশি অগ্রসর হইনি, সে বিচার মুখ্যত ছন্দোবিষয়ক সাধারণ পুস্তকের এলাকাভুক্ত। প্রয়োজনবোধে যে-সব পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে গ্রন্থশেষে তার নির্দেশ দেওয়া গেল। আলোচ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করবার অভিপ্রায়ে আমি দৃষ্টান্ত-উদ্ধারে কিছুমাত্র কার্পণ্য করিনি। যথেষ্টসংখ্যক দৃষ্টান্ত সম্মুখে না থাকলে ছন্দের নিয়ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সহজ হয় না।

পুস্তকখানি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নূতন করে লেখা, পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলনমাত্র নয়। তবে স্থানে স্থানে, বিশেষত গোড়ার দিকে, 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান'-নামক পূর্বোক্ত রচনাটিকে আংশিকভাবে অনুসরণ করেছি। তা-ছাড়া 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ'-বিষয়ক শেষ অধ্যায়টি এবং 'পরিশেষ'এর 'ছন্দ-সংলাপ'নামক অংশদুটির প্রথমটি অংশত এবং দ্বিতীয়টি সমগ্রভাবে পূর্বপ্রকাশিত রচনার প্রায় অপরিবর্তিত পুনঃপ্রকাশ। শেষ অধ্যায়টি ও 'ছন্দ-সংলাপ খ' অংশটি "রবীন্দ্রস্মৃতি প্রবাসী" (১৩৪৮ আশ্বিন) থেকে গৃহীত। আর ক-এর প্রথম চারটি বিভাগ 'ছন্দ-বিচার' নামে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ)। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছন্দ-বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হবার কিছুকাল পরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি (১৩৩৮ চৈত্র)। তখন যে আলোচনা হয়েছিল আনুপূর্বিকভাবে লিপিবদ্ধ করে আমি সেটি তাঁর কাছে পাঠাই। তিনি আমার প্রতিবেদনটি আগাগোড়া দেখে ও স্থলে স্থলে নিজের উক্তিগুলি কিছু সংশোধন বা পরিবর্তন করে প্রকাশের জন্য অনুমোদন করেন এবং সর্বশেষে 'পুনশ্চ বক্তব্য' নামে একটি মন্তব্য লিখে দেন। রবীন্দ্রনাথের

স্বহস্তে সংশোধিত ও পরিবর্তিত এই ছন্দ-বিচার প্রতিবেদনটির পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। 'ছন্দ-সংলাপ ক' অংশের 'ছান্দসিকের নিবেদন' নামক পঞ্চম বিভাগটি নূতন লিখিত।

রসমাধুর্য এবং ভাবগৌরবই রবীন্দ্রসাহিত্যের একমাত্র সম্পদ্ নয়, রচনাকলার অভিনব বৈচিত্র্যও সে সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টি তথা ভাবগৌরব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর রচনাকলার আলোচনা প্রায় হয়নি বলা চলে। অথচ এই রচনাকলার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট অবকাশ ও বিশেষ সার্থকতা আছে। 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'ই বোধ করি এ-ক্ষেত্রে প্রথম বই।

ভারতবর্ষে ছন্দের সমাদর অতি প্রাচীন কাল থেকেই, প্রথমে অন্যতম প্রধান বেদাঙ্গরূপে এবং পরে অন্যতম প্রধান কাব্যাঙ্গরূপে। আধুনিক কালে বাংলা কাব্যে এই অঙ্গটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাধনায়। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যের আঙ্গিক আলোচনায় তাঁর ছন্দশিল্পকেই প্রথম স্থান দেওয়া অসংগত নয়। এই সামান্য পুস্তকখানির দ্বারা যদি পাঠকদের রবীন্দ্রছন্দ-জিজ্ঞাসা কিছুমাত্র পরিতৃপ্ত হয় এবং অধিকতর অনুসন্ধানের পথে কিছুমাত্র সহায়তা হয়, তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থের অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন আছি। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে আরও অনেক দিক্ থেকে আলোচনা করা যেত। কিন্তু জিজ্ঞাসুদের প্রয়োজন তথা সাধারণ পাঠকের ঔৎসুক্যের সীমার প্রতি লক্ষ্য রেখে সূক্ষ্মবিশ্লেষণগত সমস্ত জটিলতা ও বিতর্ক পরিহার করতে এবং পুস্তকের বিষয়বস্তুকেও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে। তবু আশা করি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সমস্ত কথাই আলোচিত হয়েছে। যদি ভবিষ্যতে কখনও প্রয়োজন হয় তাহলে গ্রন্থখানিকে আরও পূর্ণতা দান করার প্রয়াস করা যাবে। বইটিকে যথাসাধ্য ভ্রমপ্রমাদহীন করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এইজাতীয় আলোচনাকে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিহীন

করা সহজ নয়। অজ্ঞাতসারে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। পাঠক ও সমালোচকগণ সে-বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিশেষ উপকৃত হব।

আমি যখন প্রথম বাংলা ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখন যাঁদের উৎসাহবাণী আমার মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তাঁদের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ও কাজি নজরুল ইসলামের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্তব্য। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। অতঃপর যারা এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশে নানা প্রকারে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের কথাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের সময়ে শ্রীযুক্ত অমল হোমের আগ্রহাতিশয়ের ফলেই 'বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধটি রচিত হয়। এই প্রবন্ধ রচনা ও পুস্তিকা-আকারে প্রকাশের সময় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বিকাশচন্দ্র নন্দীর সাগ্রহ আনুকূল্য নানাকারণে আমার পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই সময়ে হুগলি তেলিনিপাড়াবাসী আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও বহু সহায়তা পেয়েছি। 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানির উৎসাহ ব্যতীত পূর্বোক্ত ইংরেজি প্রবন্ধটি কখনও রচিত হত না। এই প্রবন্ধটি রচনার সময়ে আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুধীর সেন আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ' আলোচনার মূলে রয়েছে পূর্বাশা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রেরণা। এই গ্রন্থ রচনাকালে দৌলতপুর কলেজের প্রাক্তন ও তদানীন্তন বহু ছাত্রের কাছেও আমি যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে ও শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্যের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাদর আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকপদ গ্রহণ তথা 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি রবীন্দ্রসাহিত্য-আলোচনার উপাদানসমূহ ব্যবহারের সুযোগ লাভের ফলে নানাভাবে গ্রন্থখানির উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছি। গ্রন্থখানির প্রকাশ ও সৌষ্ঠবসম্পাদনে

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের সুহৃদ্‌সুলভ আগ্রহ ও যত্ন আমাব পক্ষে খুবই আনন্দের বিষয় হয়েছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্তৃপক্ষ 'রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা'র অন্তর্ভুক্ত করে পুস্তকখানিকে যে মর্যাদার অধিকারী করলেন লেখকের পক্ষে তা কম গৌরবের বিষয় নয়। প্রুফসংশোধনাদি নেপথ্যবিধানে আমার অক্ষমতাকে বহুলাংশে প্রচ্ছাদন করেছে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র করের দক্ষতা। মুদ্রণপ্রমাদ আবিষ্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ে আমার কন্যা শ্রীমতী অপালা ও শ্রীমতী গার্গীর সাগ্রহ সহায়তা পেয়ে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করেছি। সর্বশেষে উল্লেখ করব আমার স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীমান্ অমিয়কুমার সেনের নাম; এই গ্রন্থ সম্পাদনের প্রত্যেক স্তরেই তাঁর মেধাবী মনের সহযোগিতা পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি; অধিকন্তু 'নির্দেশিকা'-টি তাঁরই সংকলিত। এঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৫২

প্রবোধচন্দ্র সেন

সূচি

১	রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ	১
২	বাংলার ছন্দোগুরু	২
৩	ছন্দসন্ধানের যুগ	৪
৪	মাত্রাবৃত্ত রীতি	৬
৫	মাত্রাবৃত্ত রীতির পূর্বাভাস	১০
৬	প্রত্ন ও নব্য মাত্রাবৃত্ত রীতি	১৫
৭	বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ	১৮
৮	স্বরবৃত্ত রীতি	২৭
৯	প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগে স্বরবৃত্ত রীতি	২৮
১০	যৌগিক রীতি	৩৩
১১	যৌগিক রীতির পূর্বাভাস	৩৮
১২	যৌগিক ছন্দের নীতি	৪০
১৩	যৌগিক ছন্দে ধ্বনিনিষ্ঠা	৫১
১৪	ছন্দের আকৃতি ও পর্ববৈচিত্র্য	৫৪
১৫	মাত্রাবৃত্ত পর্ব : চতুর্মাত্রক পর্ব	৫৫
১৬	পঞ্চমাত্রক পর্ব	৬৭
১৭	ষণ্মাত্রক পর্ব	৭২
১৮	সপ্তমাত্রক পর্ব	৭৪
১৯	পর্বসমাবেশবৈচিত্র্য	৮০
২০	স্বরবৃত্ত পর্ব	৮৫
২১	স্বরবৃত্ত ছন্দের নীতি	৯১
২২	পূর্ণমাত্রক স্বরবৃত্ত ছন্দ	৯৬

২৩	অতিপর্ব	৯৯
২৪	প্রবহমান লঘু যৌগিক পয়ার	১০৪
২৫	প্রবহমান দীর্ঘ যৌগিক পয়ার	১১০
২৬	যৌগিক মুক্তক বন্ধ	১১৪
২৭	মুক্তক বন্ধের বিবর্তন	১২০
২৮	স্বরবৃত্ত বন্ধ : স্বরবৃত্ত মুক্তক	১২৭
২৯	মাত্রাবৃত্ত বন্ধ	১৩৫
৩০	মাত্রাবৃত্ত মুক্তক	১৩৯
৩১	ছন্দস্পন্দ, ছন্দোবন্ধ ও মিল	১৪৫
৩২	ভাষারীতি ও ছন্দোরীতি	১৫৯
৩৩	ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ	১৭০
৩৪	গদ্যকবিতার ছন্দ	১৭২
	পরিশেষ · ছন্দ-সংলাপ	
	ক। পদ্যকবিতার ছন্দ	১৮২
	কবির পুনশ্চ বক্তব্য	১৯৭
	ছান্দসিকের নিবেদন	১৯৯
	খ। গদ্যকবিতাব ছন্দ	২১০
	নিদেশিকা	২১৭
	সংশোধন ও সংযোজন	২২৩

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রূপকার। রূপদৃষ্টির যে-প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, তার নবনবোন্মেষশালিতার পর্যাপ্ত পরিচয় বহু ক্ষেত্রে বহু রূপে সঞ্চিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পুরোহিত; তাঁর কবিপ্রাণে "সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে" যে-বাঁশি চিরকাল মন্দ্রিত হয়েছে তাতে শুধু তাঁর জন্মভূমি নয়, সমস্ত পৃথিবীই মুখরিত হয়েছে। যে সুন্দরের আরাধনায় তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাব সন্ধানে তাঁকে নিত্যই কত নব নব ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়েছে তা কারও অজানা নয়। রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও নিত্যনবীনতার কারণ এই যে, তাঁর জীবনদেবতাই তাঁকে বহু বিচিত্র ও নিত্যনবীন রূপে দেখা দিয়েছেন। তাই কবি নিজেই তাঁকে বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে সম্ভাষণ করেছেন—"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্র-রূপিণী!", "এ কী কৌতুক নিত্যনূতন, ওগো কৌতুকময়ী!" রবীন্দ্র-নাথের কবিহৃদয়ে প্রত্যহ যে অগণিত ভাব সেই বহুবিচিত্রের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে, তাঁর শিল্পপ্রতিভাও তেমনি প্রতিদিনই তাকে অজস্র রূপে অভিব্যক্তি দান করেছে। তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার আলোতে ভাব ও রূপ যে কত ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, কবির নিজের কথাতেই তার প্রমাণ পাই।

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,

রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

—উৎসর্গ, ১৭

বর্তমান প্রসঙ্গে ভাবুক রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিষয় আমাদের আলোচ্য য়, এ-স্থলে আমরা শুধু তাঁর রূপদক্ষতার বিষয়ই আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের ত্তপ্রকৃতি আপন সার্থকতালাভের উপায়স্বরূপ সৌন্দর্যের ধ্বনিরূপকেই প্রধানত াশ্রয় করেছে। তাঁর সহজাত রূপনৈপুণ্যের স্পর্শ পেয়ে সৌন্দর্যের ধ্বনিরূপ যে

বিচিত্র ও অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে, তা সত্যই বিস্ময়কর। ধ্বনিশিল্পী-রূপে তিনি বাংলা ভাষায় যে মায়ার সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। তিনি যে "সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে মৃত্তিকার কোলে" নেমে এসেছেন, তাতে কে মুগ্ধ হয়নি? রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও সংগীত, ধ্বনির এই উভয় প্রকাশকেই অবলীলাক্রমে যুগপৎ রূপসৃষ্টির কার্যে নিয়োগ করেছেন। ছন্দ ও সংগীত ধ্বনিশিল্পের দুটি প্রধান অঙ্গ। ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পপ্রতিভা যে কত অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, এস্থলে তা-ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রবীন্দ্র-নাথের ছন্দপ্রতিভার সমস্ত দিক্ নিয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। আমরা শুধু তাঁর অজস্র ও বিচিত্র ছন্দসৃষ্টির মূলগত নীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করব।

২

শুধু রূপদৃষ্টি নিয়ে কবি কাব্যরচনা করতে পারেন না; রচনাকার্যে নিরত হয়ে তাঁকে প্রতিপদেই রূপতত্ত্বদৃষ্টির পরিচয়ও দিতে হয়। রূপতত্ত্বদ্রষ্টা-রূপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কত অসাধারণ, তাঁর ছন্দ-বৈভবের আলোচনায় সে-কথাটিই সকলের আগে মনকে আকৃষ্ট করে। কিশোর বয়স থেকেই তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিরূপ সম্বন্ধে অসাধারণ তত্ত্বদৃষ্টি নিয়ে রচনাকার্যে অগ্রসর হয়ে-ছিলেন, সেজন্যেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের ছন্দ-ভাণ্ডারে তাঁর দান এত অপরিমেয়। বাংলা কাব্যজগতে তিনি যে কত নূতন নূতন ছন্দোবন্ধ উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই বৈচিত্র্যবহুলতাই তাঁর ছন্দ-প্রতিভার আসল কথা নয়; আসল কথা এই যে, তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতির সর্বপ্রথম ও যথার্থ আবিষ্কারক। তিনিই সর্বাগ্রে বাংলা ভাষার মর্মগত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুন্ন রেখে বাংলা ছন্দের মূলনীতিগুলি আবিষ্কার করেছেন; তাঁর এই আবিষ্কার পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাগত আবিষ্কারের চেয়ে কম গৌরবের বিষয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ-জগতের সর্বব্যাপী মূল মাধ্যাকর্ষণনীতিটি আবিষ্কার করেই নিরস্ত হননি; পরন্তু ওই নীতিটিকে কাব্যসাহিত্যের বহু ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র উপায়ে প্রয়োগ করে বাংলা ছন্দে যে হিল্লোল, যে ঝংকার, যে নৃত্যলীলা ও সুরমাধুর্য সঞ্চারিত করেছেন, তা যথার্থই অপরিমেয়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোগত প্রয়োগকৌশলের প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতাতেই ধ্বনিগত নৃত্য ও সংগীতের যুগপৎ অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে। কোন্ জাদুমন্ত্রের প্রভাবে বাংলা ছন্দকে এরূপ বিচিত্র ভঙ্গিতে তরঙ্গিত ও ঝংকৃত করে তোলা সম্ভবপর হল, তার আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য।

মানবের জীর্ণ বাক্যে ছন্দ মোর দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।

—কাহিনী, ভাষা ও ছন্দ

এই উক্তি আদিকবি বাল্মীকির কাব্য সম্বন্ধে যতখানি সত্য, রবীন্দ্রনাথের নিজের কাব্য সম্বন্ধেও তার চেয়ে কম সত্য নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার জীর্ণ বাক্যে তাঁর ছন্দ যে নব সুর দিয়েছে তার যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই দেখা দরকার, তিনি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত যে ছন্দ-শক্তিকে আবিষ্কার করেছেন তার মৌলিক নীতিসূত্রগুলি কি। ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহির্গঠন, কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি অর্থাৎ বাঙালির বাক্‌রীতির অন্তর্নিহিত যে মূলতত্ত্বগুলি, তার উপরেই বাংলা ছন্দের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য, তার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তিনি যখন ওই তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করে কাব্যের ধ্বনিবিন্যাসপদ্ধতিকে তার উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন থেকেই বাংলা ছন্দ নবতর সার্থকতা ও ঐশ্বর্যলাভের পথের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী বাঙালি কবিরা বহু শত বৎসর যাবৎ নানা প্রয়াস ও সাধনার ভিতর দিয়ে অতি মন্থর গতিতে বাংলা ছন্দের স্বরূপসন্ধানের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন; কিন্তু সে-রূপের আবরণ কেউ সম্যক্‌ভাবে উন্মোচন

করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টির রশ্মিতে যেদিন সে-রূপ উজ্জ্বল হয়ে উদ্‌ভাসিত হল সেদিন দেখা গেল, বাংলা ছন্দের শক্তিও ক্ষীণ নয় এবং তার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর নয়; সেদিন থেকে বাংলা ছন্দ তাঁর শঙ্খধ্বনির অনুসরণ করে ত্রিপথগা ভাগীরথীর মতো তিনটি স্বতন্ত্র ও প্রবল ধারায় বয়ে চলেছে। বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছন্দসমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করলে সহজেই উপলব্ধি হবে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু কবিগুরুই নন, তিনি আমাদের ছন্দোগুরুও বটেন।

৩

রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যসাহিত্যের আসরে প্রথম প্রবেশ করেন তখনকার দিনে বাংলায যে সমস্ত ছন্দোবন্ধের প্রচলন দেখা যায় সে-সমস্তই ছিল, প্রচলিত পরি-ভাষায় যে-ছন্দোরীতিকে বলা হয় 'অক্ষরবৃত্ত' এবং নূতন পরিভাষায় যাকে আমি 'যৌগিক' নামে অভিহিত করেছি, সেই অক্ষরবৃত্ত বা যৌগিক রীতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ওই যৌগিক বা অক্ষরবৃত্তবর্গের ছন্দোবন্ধগুলিও তখন পর্যন্ত সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়নি। ছন্দ নিয়ে তখন বহু পরীক্ষা চলেছে, তথাপি উক্ত যৌগিক রীতির মূল নীতিটিও তখন পযন্ত অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতেই এ রীতির ছন্দোবন্ধগুলি সুগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। সে-কথা যথাস্থানে আলোচনা করব।

কিন্তু এ-স্থলে বলা প্রয়োজন যে, তৎকালপ্রচলিত যৌগিক রীতির কৃত্রিমতা ও অপূর্ণতা প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রখর ছন্দোবোধকে পীড়া দিচ্ছিল। তাই তাঁর প্রথম বয়সের রচনাগুলিতে একটা অতৃপ্তি ও প্রচলিত ছন্দকে ভেঙে-চুরে নূতন ছন্দোরীতি উদ্‌ভাবনের একটা অশ্রান্ত প্রয়াস দেখতে পাই। ১৮৭৪-৭৯ সালে রচিত "শৈশবসংগীত" এবং অনুমানিক ১৮৭৫ সালে রচিত "বনফুল"-এর সময় থেকে "ছবি ও গান"এর সময় (১৮৮৩-৮৪) পর্যন্ত এই অতৃপ্তি ও প্রয়াসের যুগ। এই প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনাসমূহেও অল্পাধিক পরিলক্ষিত হয়; পূরোপূরি গতানুগতিক তিনি কখনও ছিলেন না। কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীত'এব

রচনাকালেই (১৮৮১-৮২) তাঁর এই ব্যাকুলতা সর্বপ্রথমে ছন্দোমুক্তির পথে কতকটা অগ্রসর হয়। তিনি নিজেই বলেছেন যে, এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে প্রচলিত ছন্দোবন্ধকে তিনি একেবারেই খাতির করা ছেড়ে দিয়েছিলেন; ফলে তাঁর ছন্দ এঁকেবেঁকে নানা মূর্তি ধারণ করতে লাগল।[১] কিন্তু ছন্দের বন্ধনকে ছেদন করলেই ছন্দোমুক্তি ঘটে না; ভাষার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নীতির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ছন্দের যথার্থ মুক্তিলাভ সম্ভবপর নয়। কেননা, কৃত্রিমতার বন্ধনমোচনকেই বলে মুক্তি, ভাষাগত স্বাভাবিক নিয়মকে স্বীকার না করলে ছন্দ-রচনাই অসম্ভব। 'সন্ধ্যাসংগীত'এ প্রচলিত ছন্দোবন্ধকে অস্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু নব-ছন্দের সন্ধান তখনও মেলেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ও-কাব্যের ছন্দকে 'ভাঙা-ভাঙা', এমন কি 'উচ্ছৃঙ্খল' বলেও অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, ওর ছন্দ মূর্তি ধরে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি।[১] শুধু 'সন্ধ্যাসংগীত' নয়, 'প্রভাতসংগীত' (১৮৮৩) এবং 'ছবি ও গান' সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। 'কড়ি ও কোমল'এ (১৮৮৬) ছন্দ অনেকখানি শান্ত ও সংযত হয়ে এসেছে; কিন্তু তখনও বাংলা ছন্দের নব নব রূপ উদ্‌ভাবনের প্রয়াসে কিছুমাত্র বিরাম ঘটেনি। অবশেষে 'মানসী'র যুগে (১৮৮৭-৯০) যখন ছন্দকে ধ্বনির কালব্যাপ্তিগত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার নূতন রীতি উদ্‌ভাবিত হল, তখনই ওই অবিশ্রান্ত সন্ধানের কতকটা তৃপ্তি ঘটল। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে পারি, স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়ে তোলে— তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।[১] 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'ছবি ও গান' রচনার কালটাকে (১৮৭১-৮৪) এবং আংশিক ভাবে 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময়টাকেও (১৮৮৫-৮৬) ছন্দ-ব্যাকুলতা ও নিয়মভাঙার যুগ বলে অভিহিত করতে পারি; তার পরে 'মানসী'র সময় থেকেই ওই ছন্দ-ব্যাকুলতা সদ্যউদ্‌ভাবিত নূতন নিয়মের অধীনতা স্বীকার করেই স্বাধীনতার মধ্যে সার্থকতার সন্ধান লাভ করল।

১ জীবনস্মৃতি, সন্ধ্যাসংগীত

সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রকাব্যনিকুঞ্জ বহু বিচিত্র ও অভিনব ছন্দের কলধ্বনিতে যুগে যুগে নব নব স্বরে মুখরিত হয়ে উঠেছে। যুগপর্যায়ক্রমে নব নব ছন্দোবোধের অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি বিশিষ্ট ও বিস্ময়কর লক্ষণ।

৪

রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনায় শব্দমধ্যবর্তী যুক্তাক্ষরের বিরলতা একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। যুক্তাক্ষরের এই বিরলতা আকস্মিক নয়। শব্দ-মধ্যবর্তী যুক্তবর্ণ হচ্ছে আসলে আমাদের শ্রুতিগত ব্যঞ্জনসংঘাতের লিপিগত প্রকাশ। এ-রকম সংঘাতহীন স্বরান্ত ব্যঞ্জন ও বিশুদ্ধ স্বরধ্বনির মধ্যে একটি অবাধ প্রবাহ ও সুরমাধুর্য থাকে, একথা তাঁর সংগীতনিপুণ কিশোরহৃদয়ে সহজেই অনুভূত হয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, যেখানেই ব্যঞ্জনসংঘাত দেখা দেয় সেখানেই ছন্দের সহজ ধ্বনিপ্রবাহে বাধা ঘটে। এইটেই হচ্ছে তাঁর তরুণ বয়সের রচনায় শব্দমধ্যবর্তী যুক্তবর্ণের বিরলতার প্রধান কারণ। কিন্তু ও-রকম যুক্তবর্ণকে যদি রচনা থেকে একেবারে বর্জন করা যায় তাহলে ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ একেবারেই বৈচিত্র্যহীন, নিস্তরঙ্গ ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে, এ-কথাটিও তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন। তা-ছাড়া, যুক্তবর্ণ বাদ দিয়ে শব্দচয়ন করতে হলে ভাষার দৈন্যেই কাব্যের এলাকা মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়বে; কবির পক্ষে তা কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। আর, কল্পনাকে কলপনা, পূর্ণিমাকে পূরণিমা, ঊর্মিকে উরমি, মুক্তাকে মুকুতা লেখা শুধু যে দুবলতারই পরিচায়ক তা নয়, ও-ভাবে যুক্তবর্ণাত্মক শব্দকে ভেঙে নিস্তরঙ্গ সমতল করে আনার সম্ভাবনার ক্ষেত্রও অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই দেখতে পাই, কাব্যরচনার প্রাথমিক যুগেই যুক্তবর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে কবির মনে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। 'কড়ি ও কোমল'এর সময় পর্যন্ত বহু রচনাতেই এই দ্বন্দ্বের প্রচুর আভাস রয়েছে। কিন্তু 'মানসী' রচনার সময়ে যখন তিনি ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে ব্যাঘাত না ঘটিয়েও যুক্তবর্ণ ব্যবহারের জাদুমন্ত্রটি আবিষ্কার করলেন, তখন থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তবর্ণের পর্যাপ্ত প্রয়োগের দ্বারা তিনি যে ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি

করেছেন তার তুলনা নেই। যুক্তবর্ণ ব্যবহারের এই কৌশলটি কি, তা বুঝিয়ে বলা দরকার।

তখনকার দিনের কবিরা সাধারণত শুধু লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার হিসাবেই ছন্দ-রচনা করতেন। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রকেই এই আক্ষরিক রীতির প্রবর্তক বলে গণ্য করা যায়। তৎকালীন কবিরা এ-কথা স্পষ্ট বুঝতে পারেননি যে, লিপিবদ্ধ অক্ষরের সঙ্গে ছন্দের কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। ছন্দ একটি ধ্বনিশিল্প, সুতরাং ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে ধ্বনির তত্ত্ব। ধ্বনির বাহন হচ্ছে কাল; ছন্দ বস্তুত ওই ধ্বনিবাহী কালের উপরেই নির্ভর করে, লিখিত অক্ষরের সংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে 'মানসী'র সময়ে এ কথাটি স্পষ্টভাবে অনুভব করেন; তিনি বুঝতে পারলেন যে, অক্ষরগণনার ভ্রান্ত পদ্ধতি বর্জন করে ধ্বনিগত কালপরিমাণের উপরই ছন্দকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বুঝলেন যে, সংস্কৃত ছন্দের রীতিতে ধ্বনির কালব্যাপ্তিগত পরিমাণ নির্ণয় করা চলবে না; কারণ বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি সংস্কৃতের পদ্ধতি থেকে অনেক পৃথক্। স্বরবর্ণের সুনির্দিষ্ট হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু বাংলার পক্ষে তা নয়। বাংলায় স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় নেই বললেই হয়। অথচ শুধু হ্রস্বস্বরের ব্যবহারে ছন্দ বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে হয়ে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন, বাংলায় কার্যত দীর্ঘস্বর নেই বটে, কিন্তু আশ্রিতান্তধ্বনি বা যুগ্মধ্বনি (closed syllable) আছে; আর এই যুগ্মধ্বনিকে ছন্দের প্রয়োজনে অনায়াসেই বিশ্লিষ্ট বা সম্প্রসারিত করে দীর্ঘতা দান করা যায়। এ-ভাবে দীর্ঘস্বরের অভাব সত্ত্বেও যুগ্মধ্বনির সাহায্যে বাংলা ছন্দকে তরঙ্গায়িত করে তোলা সম্ভবপর হল। আর, শব্দমধ্যবর্তী যুক্তবর্ণ হচ্ছে আসলে যুগ্মধ্বনিকে লিখিত আকারে প্রকাশ করার একটি বিশেষ প্রণালী মাত্র, যদিও এ প্রণালীটিকে কিছুতেই সুষ্ঠু বা নির্দোষ বলে গণ্য করা যায় না। পূর্বেই বলেছি, শব্দের লিপিগত অক্ষরবিভাগ ছন্দের ভিত্তি হতে পারে না; শব্দের শ্রুতিগত ধ্বনিবিভাগই ছন্দের যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমি।

রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে ধ্বনির যুগ্ম-অযুগ্ম ভেদ স্বীকার করে নিলেন এবং কাল-ব্যাপ্তি হিসাবে যুগ্মধ্বনিকে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ মর্যাদা দিলেন। যখন থেকে তিনি অযুগ্মধ্বনি বা open syllable-কে এক কলা বা মাত্রা (mora) এবং যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রা বলে গণ্য করে ছন্দ-রচনায় প্রবৃত্ত হলেন, তখন থেকেই বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণ ব্যবহারের পূর্বোক্ত কল্পিত বাধাটি অন্তর্হিত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, যুক্তবর্ণই ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহকে বিচিত্র ও তরঙ্গিত করে তোলার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হল। এ-ভাবে 'মানসী'র যুগেই তিনি বাংলা ছন্দে মাত্রিক পব অর্থাৎ moric foot বা measure-এর প্রবর্তন করেন। এই মাত্রিক পবের বহু বিচিত্র সমাবেশের ফলে বাংলায় এক নূতন ছন্দোরীতির উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে অনুরূপ রীতির ছন্দকে বলা হয় মাত্রাবৃত্ত বা জাতি[১]। উক্ত শাস্ত্রের অনুসরণ করে আমি এই বাংলা ছন্দোরীতিকেও **মাত্রাবৃত্ত** নামে অভিহিত করেছি। ইংরেজিতে এই রীতির ছন্দকে moric (বা quantitative) metre নাম দেওয়া যেতে পারে। ১৮৮৭ সালের বৈশাখ মাসে রচিত "ভুলভাঙা" নামক কবিতাটিই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কবিতা; এই "ভুলভাঙা" কবিতাটিতেই অক্ষর-সংখ্যার ভিত্তির উপর ছন্দ-রচনার ভুল ভেঙেছে। অক্ষরসংখ্যার শিকলভাঙা সর্বপ্রথম বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দটির একটু নমুনা দিচ্ছি।—

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
      প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
      বাহুতে মোর।
বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
      আগের মতো;
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা,
      জীবনহত। —মানসী, ভুলভাঙা

১ 'জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ' ছন্দোমঞ্জরী, ১।৪

ওই "বন্ধন" কথাটিই সবপ্রথমে বাংলা ছন্দে অক্ষরগণনার বন্ধনপাশ ছিন্ন করেছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে-তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন, সেটি হচ্ছে ধ্বনি পরিমাণের তত্ত্ব। এই রীতির ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধ্বনিবিস্তারের প্রাধান্য; তাই এ ছন্দ বাংলা গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহনরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাসমূহের অধিকাংশই মাত্রাবৃত্ত রীতিতে রচিত। বাংলার তথা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির হাতেই যে এই ছন্দোরীতি উদ্‌ভাবিত হল, এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। যাহোক, এ ছন্দের একটা অসুবিধা এই যে, এর ধ্বনিপ্রবাহ অনেক সময়েই নিস্তরঙ্গ ও একঘেয়ে হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কবিকে খুব সতর্কভাবে ও সুকৌশলে যুগ্মধ্বনির প্রয়োগ করে ধ্বনিকে বিচিত্র ও তরঙ্গিত করে তুলতে হয়। সে-জন্যেই দেখতে পাই, যে-রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে যুক্তবর্ণের ব্যবহারে অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করতেন সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় প্রয়োজনমতো যুক্তবর্ণের অন্তর্ভুক্ত যুগ্মধ্বনির বজ্রকরতালি বাজিয়ে ছন্দকে উদ্‌বেল করে তুলেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর,
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর।
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসবমন্দির,
হে গম্ভীর।

—বনবাণী, বর্ষামঙ্গল

হু হু হুংকার, ঝর্ঝর বর্ষণ,
সঘন শূন্যে বিদ্যুৎঘাতে
তীব্র কী হর্ষণ।
দুর্দাম প্রেম কি এ,
প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর
গর্জিত ভাষা দিয়ে।

—সানাই, অধীরা

৫

এ-স্থলে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হতে পারে, 'মানসী' রচনার সময়ে যুগ্মধ্বনিকে দুইমাত্রা বলে গণ্য করার ইচ্ছা অকস্মাৎ কবির মনে দেখা দিল কেন। এ-বিষয়ের কোনো ইতিহাস তিনি রেখে যাননি, যদিও ওই কাব্যের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি যুগ্মধ্বনিকে একমাত্রা বলে গণনা করাকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বলে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যাহোক, উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এ-কথা বলা যায় যে, যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা গণনা করার অব্যবহিত কারণ যাই হোক, ওই ইচ্ছা আকস্মিক নয়। কেননা, প্রাক্-'মানসী' যুগের রচনাবলীর আলোচনা করলে দেখা যায়, মাত্রাবৃত্তরীতির সূচনা কবির কানে বহু পূর্বেই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো সংগীতকুশল কবির কানে যে তাঁর বাল্যকালেই যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রকতার পূর্বাভাস ফুটে উঠেছিল, এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তৎকালপ্রচলিত আক্ষরিক রীতি ও সংস্কার যে তাঁর কানকে খুশি করতে পারছিল না, তার প্রমাণ প্রাক-'মানসী' যুগের রচনায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

কোন ফুলবালিকা
গাঁথি ফুলমালিকা
ফুলবালকের কথা এক মনে শুনিছে.

'বিব্রত' শরমে
হরষিত মরমে
আনত আননে বালা ফুলদল গুনিছে।
—শৈশবসংগীত, ফুলবালা

ওই দেখ হোথা রজনী-'গন্ধা'
বিকাশে বিশদ বিভা,
মধুপে ডাকিয়া দিতেছে হাঁকিয়া
ঘাড নাড়ি' নাড়ি' কিবা!
চমকিয়া কহে 'কল্পনা'বালা—
দেখিযা কানন-ছবি
ভুলিয়ে গেলাম যে কাজে আমরা
এসেছি এখানে কবি!
—শৈশবসংগীত, ফুলবালা

এ দুটি আনুমানিক ১৮৭৪ সালের রচনা। তখন আক্ষরিক রীতির যুগ। কবি নিজেই ওই কবিতাটিরই অন্য অংশে আক্ষরিক রীতি অনুসারে লিখেছেন, "হোথায় দেখেছ 'লজ্জাবতী' লতা লুটায়ে ধরণী পরে"। অথচ উদ্ধৃত অংশ দুটিতে যে তিনটি যুক্তবর্ণাত্মক শব্দ আছে, সেগুলিব বেলায় আক্ষরিক রীতির অনুসরণ করেননি; অর্থাৎ বিব্রত, গন্ধ ও কল্পনা শব্দের যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মর্যাদা দিতে তাঁকে একটুও বিব্রত হতে হয়নি। বস্তুত যখনই তিনি সচেতনভাবে তৎকালীন আক্ষরিক রীতি মেনে চলেছেন তখনই যুগ্মধ্বনি তার প্রাপ্য দুইমাত্রাব মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর, যখনই তিনি একটু অসতর্ক হয়ে নিজের স্বভাবপ্রখর কানের অর্থাৎ ধ্বনিরসবোধের ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে চলেছেন, তখনই যুগ্মধ্বনি যুগ্মমাত্রিকতার মর্যাদা লাভ করেছে। প্রচলিত রীতির সংস্কার ও অন্তরের প্রেরণার এই দ্বন্দ্ব চলেছে 'কড়ি ও কোমল'এর যুগ পর্যন্ত। যথা—

উঠ 'বঙ্গ'কবি মায়ের ভাষায়
'মুমূর্ষুরে' দাও প্রাণ—

জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।
'বিশ্বের' মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে
কাঁদিতেছে 'বঙ্গভূমি',
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।

—কড়ি ও কোমল, আহ্বানগীত

এখানে স্পষ্টতই সচেতনভাবে হেমচন্দ্রপ্রমুখ কবিদের রীতি অনুসারে যুগ্মধ্বনিকে একমাত্রা বলেই গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু—

দুটি একটি পথিক চলে
'গল্প' করে হাসে।
'লজ্জাবতী' বধূটি গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে।

—কড়ি ও কোমল, খেলা

কত শারদ যামিনী হইবে বিফল
'বসন্ত' যাবে চলিয়া!
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া।
এই 'যৌবন' কত রাখিব বাঁধিয়া
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।

—কড়ি ও কোমল, বিরহ

এখানে চারটি স্থলে কবি নিজের অলক্ষ্যেই যুগ্মধ্বনিকে দ্বিগুণ মূল্য দিয়েছেন। এর পেছনে রয়েছে নিজের অন্তরের স্বাভাবিক শ্রুতিরসবোধের প্রেরণা।

কিন্তু কবি এখনও ওই প্রেরণাকে সচেতন ভাবে স্বীকার করে নিতে পারেননি, প্রচলিত রীতির সংস্কার এখনও তাঁর উপর আধিপত্য করছে। অবশেষে 'মানসী' রচনার সময়ে যখন ওই অলক্ষ্য প্রেরণা চেতনার সীমার মধ্যে এসে প্রচলিত সংস্কারের উপর জয়ী হল, অর্থাৎ যখন তিনি নিজেকে যথার্থভাবে আবিষ্কার করলেন, তখনই অক্ষরসংখ্যার কৃত্রিম বাধা গেল ঘুচে এবং অবরুদ্ধ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎসমুখ গেল খুলে; বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রও নব ছন্দের খর-প্রবাহে প্লাবিত হয়ে গেল। ওই নিজেকে আবিষ্কার করার পথে তিনি দুটি বস্তুর সহায়তা লাভ করেছিলেন, সে-কথাও এ-স্থলে বলা প্রয়োজন। প্রথমত, অতি বাল্যকালেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের সঙ্গে, অন্তত তার ছন্দের সঙ্গে, তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। যে বইখানি তাঁর হাতে পড়েছিল তাতে ছন্দ অনুসারে পদের বিভাগ ছিল না, গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আরেক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত ছিল; বালক রবীন্দ্রনাথের কাজ ছিল জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করা। তিনি নিজেই বলেছেন, সেটা ছিল তাঁর বড়ো আনন্দের কাজ এবং যেদিন তিনি— অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং— ইত্যাদি রচনাটিকে ঠিকমতো যতি রেখে পড়তে পেরেছিলেন, সেদিন তিনি খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন।[1] দ্বিতীয়ত, তিনি অল্প বয়সেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীসংগ্রহ বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়তেন, ব্রজবুলি ভাষার ছন্দ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রজবুলি ভাষা ও ছন্দ তাঁর মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তিনি ষোলো বৎসর বয়সেই (১৮৭৭) ওই ভাষা ও ছন্দের অনুকরণে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"[2] রচনা করেন। বলা বাহুল্য জয়দেবের "মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী" এবং ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই রচিত। এই উভয়ের সঙ্গেই যাঁর বাল্যকালেই নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল এবং যাঁর স্বাভাবিক শ্রুতিবোধ ওই দিকেই প্রেরণা দিচ্ছিল, তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বাংলায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের

১ জীবনস্মৃতি, পিতৃদেব ২ ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত

নূতন ধারা প্রবর্তন একপ্রকার অনিবার্যই হয়ে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে তারও উপরে ছিল প্রকৃতিদত্ত গীতি-নৈপুণ্য এবং নব নব স্থর উদ্‌ভাবনের অশ্রান্ত প্রয়াস। বস্তুত ষোলো বছর বয়সে যিনি লিখতে পেরেছেন—

মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে।

—ভানুসিংহ, ৮

তিনিই যে আর বছর-দশেক পরে লিখবেন—

ভুবঙ্গসম অন্ধ নিয়তি
বন্ধন করি' তায়—
রশ্মি পাকড়ি' আপনার করে
বিঘ্নবিপদ্ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

—মানসী, গুরুগোবিন্দ

এটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। বরং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, "গুরুগোবিন্দ" (১৮৮৮, জ্যৈষ্ঠ) রচনার আরও মাসখানেক পরে কি করে এটা রচিত হল—

উষা কি তাহার শুকতারাহারা
তাই কি শিশির ঝরে?
'বসন্ত' কি নাই, 'বনলক্ষ্মী' তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে!...
আজি মোর মন কী জানি কেমন,
বসন্ত আজি মধুময়,...

জগৎ ছানিয়া কী দিব আনিয়া
জীবন 'যৌবন' করি' ক্ষয় ?...
বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে ?
ঘুমন্তপ্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরানে উঠিবে জিয়ে ?
—মানসী, নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ

এখানে তিনটি স্থলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নীতি স্খলিত হয়েছে, যদিও অপর পাঁচটি জায়গায় তা যথোচিত ভাবে রক্ষিত হয়েছে। বোধ কবি তৎকালীন পাঠকসমাজের অপ্রখর ছন্দোবোধের সুযোগে ওটুকু শৈথিল্যপ্রকাশের সাহস পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালের রচনায় এ-রকম শৈথিল্যের নিদর্শন দেখা যায় না।

৬

এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ নূতন জিনিস নয়; এ ছন্দ প্রাচীন বা মধ্য যুগেও অজ্ঞাত ছিল না। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। গীতগোবিন্দ কাব্যের সবগুলি গীত বা পদই ওই ছন্দে রচিত। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রবর্তিত বাংলা মাত্রা-বৃত্তের অনেক পার্থক্য আছে। প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে শুধু যুগ্মধ্বনিই নয়, দীর্ঘস্বরও দ্বিমাত্রক বলে স্বীকৃত হয়; কিন্তু বাংলা মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতই হয়। এই দীর্ঘস্বরের অভাবটা বাংলা ছন্দের পক্ষে যে ভালো হয়েছে তা নয়; বরং দীর্ঘস্বরের প্রভাবে প্রাচীন রীতির মাত্রাবৃত্তে যে একটা ধ্বনিগত উদাত্ত গাম্ভীর্যের বিস্তার ঘটে, বাংলা মাত্রাবৃত্ত ওই গাম্ভীর্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু উপায় নেই। বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ থেকেই যখন দীর্ঘস্বরের বিলোপ ঘটেছে, তখন বাংলা ছন্দে তাকে স্বীকার করা সম্ভব নয়। বাংলা ছন্দে সংস্কৃত রীতি অনুসারে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতাকে

মেনে নিলে তা অল্পাধিক পরিমাণে কৃত্রিম হতে বাধ্য এবং ওই কৃত্রিমতা সর্বতো-ভাবেই বর্জনীয়। অথচ দীর্ঘস্বরের উদাত্ত গাম্ভীর্যের প্রতি বাংলার কবিসমাজের লোভও কম নয়। তাই দেখতে পাই, মধ্যযুগের পদাবলীরচয়িতা কবিগণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত রীতির, বিশেষত জয়দেবের রীতির, অনুবর্তন করে বাংলা ছন্দেও দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা বজায় রাখতে প্রাণপণে প্রযাস করছেন। কিন্তু বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরুদ্ধতা করে কৃত্রিমভাবে দীর্ঘস্বরের গুরুত্বরক্ষার প্রয়াস সফল হয়নি। প্রাচীন কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের রচনাই এ-বিষয়ে অনেকটা সফল হয়েছে বলা যায়। উনবিংশ শতকেও এ প্রয়াসের বিরাম ঘটেনি। মধু-সূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের (১৮৬০) চতুর্থ অঙ্ক থেকে উক্তপ্রকার দীর্ঘস্বরময় উদাত্ত ধ্বনির মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সৈন্যসকল সমরকুশল,
নিরখি' ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল,
বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্যবান্,
বিভবনিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান
মর্ত্যভুবন মাজে॥

এ ধরনের দীর্ঘস্বরময় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-রচনার প্রাচীন পদ্ধতিকে আমরা 'প্রত্ন'-(archaic)রীতি নামে অভিহিত করব; আর রবীন্দ্রপ্রবর্তিত মাত্রাবৃত্তরচনার আধুনিক পদ্ধতিকে বলব 'নব্য'রীতি।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু নব্যরীতির প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, তা নয়। প্রত্নরীতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-রচনাতেও তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। বস্তুত এই প্রত্নরীতির মাত্রাবৃত্তকেও তিনি যেমন নির্দোষ ও বিচিত্র রূপে ফুটিয়ে তুলে-ছেন, তেমন আর কেউ করেছেন কি না সন্দেহ। এ-প্রসঙ্গ যথাস্থানে আবার উত্থাপন করা যাবে। এ-স্থলে প্রত্নমাত্রাবৃত্তের দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েই নিবৃত্ত হব।—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনকজননীজননী।
নীলসিন্ধুজল-ধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত-শ্যামলঅঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত-ভালহিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।

—কল্পনা, ভারতলক্ষ্মী

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর বন্ধন সব
মোচন কর হে।
প্রভু, মোচন কর ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্যচকিত চঞ্চল চিত
কর নিঃসংশয়।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী,
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

—গীতবিতান, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৯

বলা প্রয়োজন যে, পাঠ বা আবৃত্তিযোগ্য কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এ-রকম প্রত্নমাত্রাবৃত্তের ব্যবহার করেননি, যদিও তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালবর্তী অনেকে তা করেছেন। প্রত্নরীতিতে রচিত কবিতার ধ্বনিগত কৃত্রিমতা পাঠ বা আবৃত্তির সময়ে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতে একমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও-রকম প্রত্নরীতির পঠিতব্য ছন্দ রচনা করা যেতে পারে; গভীর ও গম্ভীর ভাবের কবিতায় প্রত্নরীতির ব্যবহার তাঁর মতে অস্বাভাবিক অতএব বর্জনীয়। কিন্তু গানের কথা রচনায় তিনি প্রত্নরীতির আশ্রয় নিতে কখনও দ্বিধা করেননি।

কেননা, গানের সুরবিস্তারের মধ্যে স্বরবর্ণের দীর্ঘায়ত রূপ আত্মপ্রসারের যথেষ্ট অবকাশ পায়, কাজেই গানের সুরের মধ্যে দীর্ঘস্বরের আয়ত ধ্বনিকে কৃত্রিম ও একঘেয়ে বলে বোধ হয় না। বরং ও-রকম দীর্ঘস্বরের বিস্তার অনেক ক্ষেত্রেই গানের সুরকে সম্প্রসারিত করার আনুকূল্যই করে থাকে। বস্তুত রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রত্নমাত্রাবৃত্তের যে ক'টি দৃষ্টান্ত আছে তার সবগুলিই সুরবাহন গীতিরচনা।

৭

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গীতিকবিতার উপযোগী ধ্বনিবিস্তারের মাধুর্য আছে, কিন্তু ওই বিস্তারপ্রবণতার মধ্যে বাংলা উচ্চারণরীতির সবটুকু তত্ত্ব ধরা পড়ে না। আমরা দেখেছি, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে অবস্থাননির্বিশেষে সর্বত্রই সম্প্রসারিত করে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়; এটাই নব্যমাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য। আর, প্রত্নমাত্রাবৃত্তে অধিকন্তু দীর্ঘস্বরের আয়ত রূপকেও ধ্বনিবিস্তারের কাজে লাগানো হয়। পূর্বেই বলেছি, এই দ্বিতীয় প্রণালীটা একেবারেই কৃত্রিম; কেননা, ওটা আমাদের স্বাভাবিক বাক্‌রীতির বিরোধী। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, প্রথম প্রণালীটাও সর্বতোভাবে অকৃত্রিম নয়, কারণ আমাদের নিত্যউচ্চারিত ভাষায় যুগ্মধ্বনি সর্বদাই এবং সর্বত্রই সম্প্রসারিত হয় না। কাজেই নব্যমাত্রাবৃত্তেও ধ্বনিবিস্তারের দ্বারা মাধুর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়। তা-ছাড়া ওই ধ্বনিবিস্তারই ভাষার একমাত্র তত্ত্ব নয়। আমাদের নিত্য ব্যবহৃত ভাষায় যেমন অবস্থাবিশেষে ধ্বনিবিস্তারের অবকাশ থাকে, তেমনি থাকে ঝোঁকস্থাপনের ব্যবস্থা। উচ্চারণের সময় ধ্বনিবিশেষের উপর আমরা যে ঝোঁক দিয়ে কথা বলি, ওই ঝোঁকের মধ্যেই ভাষার আসল শক্তিটি নিহিত থাকে। এই ঝোঁককে ইংরেজিতে বলা হয় accent; বাংলা পরিভাষায় আমরা বলব **প্রস্বর**। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ওই ঝোঁক বা প্রস্বরটুকু অনেক সময় ধ্বনিবিস্তারের আড়ালে গৌণ হয়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের প্রায় প্রথম থেকেই প্রস্বরটুকু সহ আমাদের সমগ্র উচ্চারণপদ্ধতিটাকেই কাব্যের

ছন্দে অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ রূপে সমাবিষ্ট করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রয়াসের প্রথম নিদর্শন পাই ১২৮৭ সালের আশ্বিনসংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত ম্যাক্‌বেথ নাটকের ডাকিনী অংশের বাংলা অনুবাদে। ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দে যে কিছু বিশেষত্ব থাকা উচিত, সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন।[১] এই বিশিষ্ট ছন্দের নমুনা হিসাবে উক্ত অনুবাদ থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।—

ঝড় বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিনজনে।
ঝগড়া ঝাঁটি থামবে যখন,
হার জিত সব মিটবে রণে।

বলা বাহুল্য এই ছন্দে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি, বিশেষত তার প্রাস্বরিক রীতিটুকু সম্পূর্ণ অব্যাহত আছে যদিও 'তিনজনে' এবং 'মিটবে রণে' এই শেষ দুটি পর্বের মধ্যে সংগতি রক্ষিত হয়নি। অতঃপর বাল্মীকিপ্রতিভা (১২৮৭, ফাল্গুন) এবং কালমৃগয়ার (১২৮৯, অগ্রহায়ণ) কোনো কোনো পাত্রপাত্রীর উক্তিতে বাংলার এই স্বভাবিক ছন্দের প্রয়োগ দেখতে পাই। যথা—

আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।
—বাল্মীকিপ্রতিভা, প্রথম সং, প্রথম দৃশ্য

কাল সকালে উঠব মোরা যাব নদীর কূলে
শিব গড়িয়ে করব পুজো আনব কুসুম তুলে।
—কালমৃগয়া, প্রথম দৃশ্য

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীদের উক্তির জন্য যে বিশেষ ছন্দের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, বাল্মীকিপ্রতিভার দস্যু এবং কালমৃগয়ার

১ এই প্রসঙ্গে ১৩৫০ সালের বৈশাখসংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' নামক আমার প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

বিদূষক ও শিকারীদের উক্তিতেও সেই ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয় ইতিমধ্যেই এই ছন্দের বিশিষ্টতা তথা স্বাভাবিকতা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই দেখা যায় কালমৃগয়ায় বিদূষক এবং শিকারী ছাড়া অন্য পাত্রপাত্রীর উক্তিতেও এই ছন্দ ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। কালমৃগয়ার কিছুকাল পরে প্রকাশিত 'প্রভাতসংগীত' (১২৯০, বৈশাখ) কাব্যের উৎসর্গপত্রেও এই নূতন ছন্দোনীতিপ্রয়োগের নিদর্শন পাই। যেমন—

আমায় দেখে আসিস ছুটে
 আমায় বাসিস ভালো,
কোথা হতে পড়লি প্রাণে
 তুই রে উষার আলো।···
দূর কর ছাই, ঝোঁকের মাথায়
 বলে ফেললেম কত কি যে!
কথাগুলো ঠেকচে যেন
 চোখের জলে ভিজে ভিজে।

—প্রভাতসংগীত, স্নেহউপহার

এর থেকে অনুমান হয় এই নূতন ছন্দোনীতির শক্তি ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনের ঔৎসুক্য ও আস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রভাতসংগীতের অত্যল্পকাল পরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকেও এই অনুমান সমর্থিত হয়।

১২৯০ সালের শ্রাবণসংখ্যা ভারতীতে 'সিন্ধুদূত' নামক একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বাংলা ছন্দের 'প্রাণগত ভাব' ও তার ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে যে স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে তা তখনকার দিনের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর। তাতে বলা হয়েছে "ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।" অতঃপর যুক্তিসহকারে দেখানো হয়েছে যে, রামপ্রসাদ সেনের গানগুলিতে যে ছন্দ দেখা যায় সেইটেই হচ্ছে বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ।

সর্বশেষে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, "যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে"। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম নেই। কিন্তু লেখক যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে।[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়স থেকেই রামপ্রসাদী ছন্দকে বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও তখনকার দিনে সাহস করে রামপ্রসাদী ছন্দকে কাব্যের বাহনরূপে বরণ করে নেওয়া সহজ ছিল না। তাই উক্ত চারটি ক্ষেত্রে (তিনটি নাট্যরচনা ও একটি হালকা ধরনের কবিতা) রামপ্রসাদী ছন্দ স্বীকৃত হলেও তৎকালীন কাব্যসমূহে উক্ত ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় না। 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনা উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষার এই স্বাভাবিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও তার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে অনুকূল মত ব্যক্ত করার কয়েক মাস পরেই 'ছবি ও গান' কাব্যখানি প্রকাশিত হয় (১২৯০, ফাল্গুন)। এই পুস্তকেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে রামপ্রসাদী ছন্দের উচ্চারণতত্ত্বটিকে সচেতনভাবে কাব্যরচনার কাজে প্রয়োগ করেছেন। যথা—

> ঘুমের মতো মেয়েগুলি
> চোখের কাছে দুলি' দুলি'
> বেড়ায় শুধু নূপুর রণরণি'।
> আধেক মুদি' আঁখির পাতা
> কার সাথে যে কচ্চে কথা,
> শুনচে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।
>
> —ছবি ও গান, মাতাল

দেখা যাচ্ছে এখানে রামপ্রসাদী ছন্দের রীতি অনুসারে স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের হসন্তধ্বনিগুলিকে সম্পূর্ণরূপেই কাজে লাগানো হয়েছে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যেও (১৮৮৬) এ ছন্দের প্রয়োগ আছে। যথা—

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১, শ্রাবণ—'রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে সাতটি ফুলের রেণু,
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে স্বপন দেখে মাকে,
সকাল বেলা 'জাগো জাগো' পারুলদিদি ডাকে।

—সাত ভাই চম্পা

কিন্তু এ দুই গ্রন্থে এ ছন্দ রচনার মধ্যে অনেক স্থানেই সন্দেহ ও শৈথিল্য দেখা যায়। ছড়াজাতীয় কবিতা ছাড়া উচ্চ ভাবের রচনায় এ ছন্দ চলবে কি না, এ-বিষয়ে কবির মনে কতকটা সন্দেহ রয়ে গেছে বলে বোধ হয়। সম্ভবত এ-জন্যেই তিনি মানসী, সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যে ও-ছন্দে একটি কবিতাও রচনা করেননি। দীর্ঘকাল ও-ছন্দটি অবহেলা ও তুচ্ছতার মধ্যে আত্ম-গোপন করে থাকতে বাধ্য হল। অবশেষে বোধ করি প্রায় বারো বছর (১৮৮৬-৯৭) পরে কবি ওই ছন্দটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই ছড়ার ছন্দে রচিত একটিমাত্র কবিতা 'কল্পনা' কাব্যে স্থান পেয়েছে। কবিতাটির নাম 'হতভাগ্যের গান'; রচনার তারিখ ১৮৯৭। এর থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি।—

মৃত্যু যেদিন বলবে, "জাগো,
প্রভাত হল তোমার রাতি,"—
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।...
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,—
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে
করে যাব পরিহাস।

এর বছর-দুই পরে (১৮৯৯) আরও তিনটি কবিতায় তিনি এই ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ করেন। কবিতা তিনটিই 'কথা'কাব্যের অন্তর্গত। কিন্তু এ-সময়েই এই অনাদৃত ছন্দটি কবির হাতে সুগঠিত হয়ে স্বীয় শক্তি ও রূপের পরিচয় দিতে

আরম্ভ করেছে। 'হোরিখেলা' নামক কবিতাটি থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করে দিলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।—

শুরু হল হোরির মাতামাতি,
উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরন ধরল বকুল ফুলে,
রক্তরেণু ঝরল তরুমূলে,
ভয়ে পাখি কূজন গেল ভুলে'
রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

কিন্তু 'ক্ষণিকা'র যুগ (১৯০০) থেকেই তিনি নিঃসন্দেহে ও দৃঢ়হস্তে এ ছন্দ রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। যথা—

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী,
হে প্রেয়সী!
বলচে—কবি তোমার ছবি
আঁকচে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্চে নিতি
তোমার কানে,
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকচে শেষে বাংলা দেশে
উচ্চ কথা।
তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী,
হে প্রেয়সী!

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপূরণ

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কিনা
বুঝব কেমন করে?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
ঠাট্টা করে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।
হালকা তুমি কর পাছে
হালকা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

—ক্ষণিকা, ভীরুতা

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি কেমন নিঃসংশয়চিত্তে এ ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই ছড়ার ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ "বাংলা প্রাকৃত-ছন্দ" ও "প্রাকৃত বাংলা ছন্দ" নামে অভিহিত করেছেন।[১] লোকসাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ছড়ার ছন্দকে অসংস্কৃত, অমার্জিত ও ভাঙাচোরা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উদ্ধৃত অংশ দুটির প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, ছড়ার ছন্দের আদিম প্রাকৃত রূপ তাঁর হাতে কেমন সুগঠিত, সুসংস্কৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 'ক্ষণিকা'র অধিকাংশ কবিতাই এই প্রাকৃত ছন্দে রচিত এবং ওই গ্রন্থে এ ছন্দকে যে কত বিচিত্র ভঙ্গিতে রূপায়িত করে তোলা হয়েছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে 'মানসী' কাব্যের ন্যায় এই 'ক্ষণিকা' কাব্যখানিও একটি নবযুগের সূচনা করেছে। তথাপি একটি সংশয় থেকে গেল। 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলিকে একপ্রকার লঘুতা দেবার

১ ছন্দ, পৃ ১৩৩-৩৪; ছড়ার ছবি, ভূমিকা।

উদ্দেশ্যেই তিনি প্রাকৃত ছন্দের আশ্রয় নিয়েছিলেন। উপরের দৃষ্টান্ত-দুটিই এ-কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করবে। 'গভীর সুরে গভীর কথা' শোনানো ও-কাব্যের উদ্দেশ্য নয়; 'উচ্চকথা'র পরিবর্তে আপাততুচ্ছ বিষয় নিয়ে হালকা সুরের কবিতা রচনা করাই কবির অভিপ্রায়। সুতরাং উচ্চাঙ্গের ভাব প্রকাশ করার পক্ষেও এ ছন্দ উপযোগী কি না, এ প্রশ্ন অমীমাংসিতই রয়ে গেল। এ সংশয়ের একটি বিশেষ কারণও আছে। 'ক্ষণিকা'র প্রায় সমকালেই রচিত হয় 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে গভীর সুরে গভীর কথাই শোনানো হয়েছে; কিন্তু এর একটি কবিতাও প্রাকৃত ছন্দে রচিত নয়। 'স্মরণ'এর (১৯০২-০৩) বেদনাভরা কবিতাগুলির মধ্যেও কোথাও ও-ছন্দের প্রয়োগ নেই। অথচ প্রায় সমকালেই রচিত 'শিশু' (১৯০৩) গ্রন্থে আবার ছেলেভুলানো ছড়ার ছন্দ দেখা দিয়েছে। 'কড়ি ও কোমল'এর শিশুপাঠ্য কবিতাগুলির তুলনায় এ গ্রন্থের প্রাকৃত ছন্দ কতখানি সুগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।—

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা-দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে॥

—শিশু, বীরপুরুষ

এই 'শিশু' গ্রন্থের প্রায় সমকালেই রচিত হয় 'উৎসর্গ' (১৯০৩-০৪) কাব্যের কবিতাগুলি। এই কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে প্রাকৃত ছন্দকে খুব উচ্চাঙ্গের কবিতার বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন।—

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য-অস্ত
    এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
    সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
    দেহ যেন মিলায় শূন্য 'পরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
    কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি'॥

—উৎসর্গ, ৩৯

'উৎসর্গ' কাব্যেই প্রাকৃত ছন্দের শক্তিশালিতা ও গভীর ভাবের বাহন হবার যোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল। কিন্তু ও-কাব্যে এ ছন্দ প্রয়োগের পরিধি খুব সংকীর্ণ, কয়েকটিমাত্র কবিতায় সীমাবদ্ধ। তারপর 'খেয়া'র সময় (১৯০৫-০৬) থেকেই এ ছন্দ রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে; ওই কাব্যেই দেখি ও-ছন্দ প্রয়োগের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত, তার প্রকাশভঙ্গি হয়েছে অভিনব এবং তার ক্ষমতা সম্বন্ধে কবির চিত্ত হয়েছে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়।—

তীব্র তড়িৎ-হাসি হেসে বজ্রভেরীর স্বরে
    তোমার ঘরে ঢুকি'
জগৎ যদি এক নিমেষে শক্তিমূর্তি ধ'রে
    দাঁড়ায় মুখোমুখি—

কোথায় থাকে আধেক ঢাকা অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে স্বপনমাখা আপনগড়া মায়া,—
উড়িয়া যায় সবি।

—খেয়া, অনাহত

এ সময় থেকে তিনি এ-ছন্দকে কত বিচিত্র ভঙ্গিতে কত অজস্র রচনায় নিযুক্ত করেছেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না। এ-ভাবে রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত সাধনা ও অসংখ্য রচনার ফলেই এ-ছন্দটি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

৮

এখন দেখা যাক, এই ছন্দোরীতির ভিতরকার নীতিটি কি। বলা বাহুল্য লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার মধ্যে এর প্রাণতত্ত্বের সন্ধান মিলবে না, কেননা অক্ষর-সংখ্যা কোনো ছন্দেরই প্রাণবস্তু হতে পারে না। ধ্বনির কালব্যাপ্তিগত পরিমাণের মধ্যেও এ ছন্দের সম্পূর্ণ রূপটি ধরা যায় না। এ-ছন্দের অন্তরের তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে প্রাকৃত বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতি ও প্রস্বরস্থাপনের রীতির মধ্যে। এ রীতির ছন্দে বাংলা উচ্চারণের প্রাস্বরিক রূপটি যেমন স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত হয়, তেমন আর কোনো রীতিতেই হয় না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ ছন্দের প্রতিপর্বের অন্তরে রয়েছে আমাদের উচ্চারণরীতির অখণ্ড রূপটি। কেবলমাত্র ধ্বনিগত কালব্যাপ্তির তত্ত্বের উপর এ-ছন্দ প্রতিষ্ঠিত নয়, অখণ্ড ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যাগত সৌষম্য রক্ষা করাও এ-ছন্দের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাধারণত প্রতিপর্বের ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার সমতা বজায় থাকলেই এ ছন্দের গঠন মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে। যেমন—

আমি যদি। জন্ম নিতেম। কালিদাসের। কালে,
দৈবে হতেম। দশম রত্ন। নবরত্নের। মালে।

—ক্ষণিকা, সেকাল

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই দুটি পংক্তির পর্বগুলিতে প্রত্যক্ষত ধ্বনির

মাত্রাপরিমাণগত সমতা নেই ; কিন্তু ধ্বনিসংখ্যাগত সমতা রয়েছে। কেননা এখানে প্রতিপর্বেই চারটি করে অখণ্ড ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌ আছে, কেবল শেষ দুটি অপূর্ণ পর্বে আছে দুটি করে। এই হচ্ছে এ ছন্দের মোটামুটি পরিচয়। এর চেয়ে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া এ-স্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের উচ্চারিত প্রত্যেকটি ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌-এর অন্তরে থাকে একটিমাত্র অযুগ্ম বা যুগ্ম স্বর। বস্তুত যে-কোনো শব্দ বা বাক্যের ধ্বনিসংখ্যা এবং তার স্বরসংখ্যা স্বভাবতই অভিন্ন। তাই উক্ত ছন্দের একেকটি পর্বের নাম দেওয়া যায় 'স্বরপর্ব' অর্থাৎ syllabic foot বা measure। স্বরপর্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলেই এ-ছন্দের নাম দিয়েছি **স্বরবৃত্ত** ; ইংরেজিতে একে বলা যায় Syllabic Metre। আর, যেহেতু এই ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি বাংলা উচ্চারণের প্রস্বরবিধির দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে সেজন্যে একে 'প্রাস্বরিক ছন্দ' নামেও অভিহিত করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলেই বলা যায় যে, চতুঃস্বরপর্বিকতাই এই প্রাকৃত ছন্দের প্রধান রীতি বা বৈশিষ্ট্য। উপরের দৃষ্টান্তটির দ্বারাও এ-কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

৯

মাত্রাবৃত্তের ন্যায় স্বরবৃত্ত রীতিও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই দান। রবীন্দ্র-নাথের পূর্বে এ ছন্দোরীতিটি বাংলায় ছিল না, এ-কথা সত্য নয়। বস্তুত এ-রীতির ছন্দ আমাদের পল্লীসংগীতে, ছেলেভুলানো ছড়ায়, কবির গানে, বাউলের গানে, মেয়েলি ব্রতকথায়, এক কথায় আমাদের লোকসাহিত্যে বহুকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। এ ছন্দোরীতিটিই হচ্ছে বাংলা লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন। তাই এটিকে **লৌকিক ছন্দ** (Folk Metre) নাম দিলে অন্যায় হয় না। বরং এই নামেই তার কুলশীলের পরিচয় পাওয়ার সুবিধা হয়। রামপ্রসাদের গানে এ-ছন্দের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় ঘটেছে। যথা—

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।

হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা।…
শ্রীরামপ্রসাদে রটে মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে অন্ধ-আঁখি দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা॥

কবি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও এ-ছন্দের অতি সুন্দর নিদর্শন আছে। যথা—

আধপেটা ভাত ক-দিন খাব,
দুদিনে তো মরেই যাব,
পেটের জ্বালায় জ্বলে বুঝি
বেচতে হল কোটাভিটে।
ভিটে গেল যথাতথা,
'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা'—
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ
কাঁদতে হবে বসে খাটে॥

—পৌষপার্বণগীতি

ওকথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে?
এ বড হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে।

—বোধেন্দুবিকাশ

মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রও প্রয়োজনমতো এ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন—

বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্মধোয়া।
পুণ্যখাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া।

শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম ফলল ধর্ম,
"বুড সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া" ॥

—মধুসূদন

পরের অধীন দাসের জাতি, 'নেশন' আবার তারা!
তাদেব আবার 'এজিটেশন',—নরুন উঁচু করা!
হায় কি হল—দলাদলি বাধল ঘরে ঘরে।
পার্টিখেলা ঢেউ তুলেছে ভারতরাজ্য 'পরে।
সবাই 'লীডার', কর্তা স্বয়ং, আপনি বাহাদুর।
কতই দিকে তুলছে কত কতই-তরো সুর।

—হেমচন্দ্র · কবিতাবলী, হায় কি হল

আধুনিক মার্জিত ছন্দের বিচারে প্রথম দৃষ্টান্তটির একটি পবে ('বুড় সালিকের') একটু ত্রুটি ঘটেছে। যা-হোক, লক্ষ্য করার বিষয়, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি লৌকিক কায়দায় সাধারণের চিত্ত আকর্ষণেব উদ্দেশ্যে রচিত বলে এ-সব স্থলে স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'ও এক স্থানে স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে; এ-স্থলেও বিষয়বস্তু লৌকিক বলেই ওই প্রাকৃত ছন্দের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তটি হচ্ছে এই।—

উমার কেশ চামর-ছটা,
তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী,
দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া,
বুড়ার দাড়ি শনের নুড়া,
ছার কপালে ছাই কপালে
দেখে পায় ডর লো।

উমার গলে মণির হার,
বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন ক'রে, ওমা, উমা
করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চড়া,
ভাঙ্গড় পাগল ওই লো বুড়া,—
ভারত কহে—পাগল নহে,
ওই ভুবনেশ্বর লো॥

—অন্নদামঙ্গল, কোন্দল ও শিবনিন্দা

আধুনিক আদর্শের বিচারে এখানেও কয়েকটি পদে কিছু ছন্দোগত ত্রুটি রয়েছে। ভারতচন্দ্রের পূর্বেও এই লৌকিক ছন্দ কবিসমাজে অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু নেহাৎ লৌকিক বলেই এটি সব সময়েই অল্পবিস্তর অবজ্ঞাত ছিল। তথাপি এ-ছন্দের তৎকালীন রূপের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। সেকালে এ-ছন্দটি **ধামালি** ছন্দ নামে পরিচিত ছিল। 'ধামালি' শব্দের অর্থ হচ্ছে ধাবমান, দ্রুতগতিশীল; গৌণার্থে অশান্ত বা দুরন্ত। এই লৌকিক ছন্দটির গতিপ্রকৃতির প্রতি একটু লক্ষ্য করলে অনায়াসেই টের পাওয়া যাবে যে, এটি হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত লয়ের ছন্দ; এর চালের মধ্যে একটা অশান্ত বেগ সহজেই অনুভব করা যায়। সুতরাং এই 'ধামালি' নামটি নিরর্থক নয়, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। যাহোক, এবার মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে লৌকিক ধামালি ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

চিকণকালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

—গোবিন্দদাস, পদাবলী

শিশুকালের ভালোবাসা
তোমরা বল কি ।
কিসের লাগ্যা ডর করিব
বাপের ঘরের ঝি ॥
"কেমন কর‍্যা ঘরকে যাব
ডর লাগ্যাছে বড ।"
লোচন বলে, আগো দিদি,
বুক কর গো দড় ॥
—লোচনদাস, পদাবলী

রাবণ বলে যা বলিলে মোর মনে তাই মিলে ।
জন্মে যে না পাই দুঃখ, ঘরপোড়া তা দিলে ॥
পর ত মোর বাপ সব, কোন্ কাল্‌কে আর ।
রামলক্ষণ থাকুক, আগে ঘরপোড়াকে মার ॥
এই যুক্তি রাবণরাজা করতেছিল বসে ।
হেনকালে অঙ্গদবীর উত্তরিল এসে ॥
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অঙ্গদরায়বার

অতএব বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথ এই লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দের স্রষ্টা নন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথমে লোকসাহিত্যের আশ্রয়স্থানীয় এই খাঁটি বাংলা ছন্দটিকে বহুকালের অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে তাকে নিঃসংকোচে সর্বপ্রকার রসসাহিত্যের বাহন হবার উপযুক্ত মর্যাদা ও আভিজাত্য দান করেছেন এবং এটিকে যথোচিতরূপে মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে তথা বহু শাখা-প্রশাখায় পরিবর্ধিত ও অলংকৃত করে বাংলার ছন্দ-ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছেন। খাঁটি বাংলার এই ঘরোয়া ছন্দটির শক্তি ও সৌন্দর্য আবিষ্কার ও তার বৈচিত্র্যসাধনের দ্বারা তিনি আমাদের কাব্যসাহিত্যের যে সম্পদ্ বৃদ্ধি করেছেন, তার পরিমাপ নেই।

১০

যৌগিক বা তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তরের গঠনকৌশলও তাঁরই হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি বাংলা ভাষার আদিম ছন্দ না হলেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত রচনার সময়ে প্রধানত এই যৌগিক ছন্দকেই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এ ছন্দটিকে তার বর্তমান সৌষ্ঠব ও সুসঙ্গতি দান করতে বাংলার প্রাচীন কবিদের বহু শতাব্দী সময় লেগেছে। বহুকাল যাবং বহু কবির অক্লান্ত পরিশ্রম, পরীক্ষা ও প্রয়াসের ফলে এ ছন্দটি তার বর্তমান রূপে উপনীত হয়েছে। এ ছন্দটি মূলে মাত্রাসংখ্যাত (moric) না ধ্বনিসংখ্যাত (syllabic), এর পবগঠন কিরূপ হবে, প্রতিপংক্তিতে কটি 'অক্ষর' থাকবে, যতিস্থাপনের বিধি কিরূপ, এর প্রকারভেদ কি উপায়ে উৎপন্ন করা যায়, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই প্রাচীন কবিদের মনে সর্বদাই সংশয় থেকে গিয়েছে। তাই প্রাচীন কাব্যগুলিতে দেখতে পাই, এ ছন্দ কোথাও মাত্রিক প্রকৃতির, কোথাও স্বরসংখ্যক, এর পবগঠন ও যতিস্থাপন অনিয়মিত, প্রতিপংক্তির 'অক্ষর'সংখ্যাও অনির্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে একদিকে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব ও অক্ষরগোনার প্রয়াস, অন্যদিকে মাত্রা বা স্বরসংখ্যা নির্দিষ্ট করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার উপরে সমস্ত ছন্দই সুর করে গানের ভঙ্গিতে আবৃত্তি করার প্রথা, এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাবের ফলে এ ছন্দটি একটি সুনির্দিষ্ট আকারলাভের সুযোগ পায়নি। শক্তিমান্ কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও এ ছন্দকে একটা অনিয়মিত অবস্থার মধ্যেই দেখতে পাই। ভারতচন্দ্রের ছন্দোবোধ অসাধারণ ছিল সন্দেহ নেই এবং তাঁর হাতেই এ ছন্দ সর্বপ্রথমে কতকটা নির্দিষ্ট আকার লাভ করে। তিনিই এ ছন্দকে অক্ষরসংখ্যার সমতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করার আদর্শ স্থাপন করেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রও এ ছন্দের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই দেখতে পাই, 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে পয়ারের পংক্তিতে যদিও চোদ্দ অক্ষরের মাপ ঠিক আছে এবং মিলের রীতিও সুনির্দিষ্ট হয়ে এসেছে, তথাপি বহুস্থানেই যতিস্থাপন বিষয়ে শৈথিল্য দেখা যায়,

অথচ যতিস্থাপনবিধি এবং পর্বগঠনপ্রণালীই ছন্দের অন্যতম মূলকথা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে পয়ারের যতিস্থাপনবিধির অনিশ্চয়তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখে বাজায়ে নারদমুনি হাসে॥

—অন্নদামঙ্গল, কোন্দল ও শিবনিন্দা

এ দৃষ্টান্তটির উভয় পংক্তিতেই সাত অক্ষরের পরে যতি পড়েছে। কিন্তু আধুনিক কালের একটি সর্বস্বীকৃত নিয়ম এই যে, এ ছন্দ পংক্তির আদি, মধ্য, অন্ত কোথাও অসমসংখ্যাকে স্বীকার করে না। কাজেই সাত অক্ষরের পরে যতি স্থাপন এ ছন্দের স্বভাববিরুদ্ধ।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মধুসূদন দত্ত অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে বাংলা কাব্যের জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে যৌগিক ছন্দে নবশক্তির সঞ্চার হল, তিনি যেদিন যৌগিক পয়ারের সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে দিলেন, সেদিন থেকেই ও-ছন্দে যথার্থ মহাকাব্য রচনা করা সম্ভবপর হল। কিন্তু তাঁর অসামান্য শক্তির কাছেও এ ছন্দের প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়েনি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে যৌগিক ছন্দের সদ্য-মুক্ত প্রবল শক্তির প্রচুর পরিচয় যেমন আছে, তেমনি ও-ছন্দ ব্যবহারের ত্রুটিবিচ্যুতির নিদর্শনও যথেষ্ট রয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সম্মুখসমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে,······

'মেঘনাদবধ' কাব্যের এই প্রথম তিনটি পংক্তিতেই মধুসূদনপ্রবর্তিত যৌগিক ছন্দের শক্তি এবং যতিস্থাপনের ত্রুটিরও প্রমাণ রয়েছে। এই অংশটুকুকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এখানে বীরবাহুর "অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল"।[১] "ভাঙা ছন্দ" বলা

১ ছন্দ, পৃ ২৭-২৮

হেতু ত্রিমাত্রক 'অকালে' শব্দের পরে যতিস্থাপন। মধুসূদন পংক্তির যে-কোনো স্থানে যতিস্থাপন করতে দ্বিধা করতেন না: অথচ অসমসংখ্যক মাত্রার পরে বিবতি ঘটানো যৌগিক ছন্দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বহুকাল পূর্বে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের 'ভূমিকা' রচনা উপলক্ষ্যে কবি হেমচন্দ্রই বোধ করি সর্বপ্রথমে এ বিষয়ে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে ও-রকম অযুগ্মসংখ্যক মাত্রার পর যতি সংস্থাপন করলে ছন্দ 'শ্রুতিদুষ্ট' অর্থাৎ "পদাবলীর স্রোতোভঙ্গহেতু শ্রবণকঠোর" হয়। যাহোক, মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' নামক কবিতাটি থেকে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নিশার স্বপনসুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে!......
মাৎসর্য-বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ।
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

এই অংশটিতে দু-জায়গায় যৌগিক ছন্দের সংগতি নষ্ট হয়েছে। 'বাড়ায় মাত্র আঁধার' এবং 'মাৎসর্য-বিষদশন', এই দুটি পদেও ছন্দের আরেকটি বিশেষ রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। তিন-দুই-তিন কিংবা দুই-তিন-তিন এই পর্যায়ে মাত্রাবিন্যাস এ ছন্দের রীতিবিরোধী, কেননা তাতে শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটে। চার-চার কিংবা তিন-তিন-দুই—এই হচ্ছে যৌগিক প্রকৃতিসম্মত মাত্রাসমাবেশের বিধি। 'বাড়ায় মাত্র আঁধার' কিংবা 'মাত্র বাড়ায় আঁধার', এর কোনোটাই ভালো শোনায় না, কিন্তু 'বাড়ায় আঁধার মাত্র' কিংবা 'আঁধার বাড়ায় মাত্র' বললে ওই দোষ ঘটে না। তেমনি 'মাৎসর্য-বিষদশন' না বলে 'মাৎসর্যের বিষদন্ত' বললেই ও-ছন্দেব ধ্বনিসংগতি অক্ষুন্ন থাকত।

রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে যৌগিক ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। তাঁর স্বাভাবিক ছন্দোবোধশক্তিই তাঁকে এ ছন্দের

যথার্থ পথে চালিত করেছে। তাই তাঁর রচিত যৌগিক ছন্দে পূর্বোক্ত দোষগুলো সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, তাঁরই রচনা থেকে সর্বপ্রথমে এ ছন্দের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর হল। তাঁর লেখা থেকেই বোঝা গেল যে, 'অক্ষর'-সংখ্যার সমতা ও-ছন্দের ভিত্তি নয় এবং ওটি আসলে একটি মিশ্রপ্রকৃতির ছন্দ। অন্তত ভারতচন্দ্রের আমল থেকে লিখিত হরফ বা অক্ষরসংখ্যার হিসাবে এ ছন্দ রচনার রীতি দেখা দিয়েছে এবং বর্তমানেও প্রধানত ওই অক্ষরসংখ্যার হিসাবেই এ ছন্দ রচিত হয়ে থাকে। তাই প্রচলিত রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এক-সময়ে এ ছন্দের নাম দিয়েছিলাম অক্ষরবৃত্ত।[২] কিন্তু আসলে অক্ষরসংখ্যা এ ছন্দের মূলগত তত্ত্ব নয়, বস্তুত ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হতে পারে না। বহুদিন ধরে তথাকথিত অক্ষরসংখ্যা সামঞ্জস্য রেখে রচনা করার অভ্যাস হওয়ার ফলে এ ছন্দের স্বরূপ আবিষ্কৃত হতে এত বিলম্ব ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "অক্ষরের দাসত্বে বন্দী বলে প্রবোধচন্দ্র বাঙালি কবিদেরকে যে দোষ দিয়েছেন, সেটা সেই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতর বিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত, এখন চলে না"।[৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন, "আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই"।[৪] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই স্বীকৃত হয়েছে যে, তখনকার শৈথিল্যের দিনে বাঙালি কবিরা ওই অদ্ভুত পদার্থটাই বাংলা সাহিত্যে কিছু পরিমাণে চালিয়েছিলেন। ও-রকম শৈথিল্যের দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেব। তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথেরই আরেকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।—" 'তোমারি', 'যখনি' শব্দগুলির ইকারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন করে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেছেন কি না জানি নে, যদি করে থাকেন বাঙালি পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না।"[৫] এবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

২ প্রবাসী ১৩২৯, পৌষ ৩ ছন্দ, পৃ ১৩৯-৪০ ৪ ছন্দ, পৃ ১৩১ ৫ ছন্দ, পৃ ১২৭

'এখনও' এ বিজন বনে,
ভাবি আমি, শুনি যেন সে মধুর বাণী !
—মেঘনাদবধ, চতুর্থ সর্গ

এখন(ও) আমরা বিজেতা নয়।
—বৃত্রসংহার, দ্বিতীয় সর্গ

হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত।
—বৃত্রসংহার, ত্রয়োদশ সর্গ

হাসিছে না আজ(ও) কি সে তেমতি গৌরবে,...
তোমার(ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা?
—বৃত্রসংহার, চতুর্দশ সর্গ

'সকলই' নিজ নিজ স্বতন্ত্র প্রকৃতিপর।
—কুরুক্ষেত্র, চতুর্থ সর্গ

'একই' বন্ধনে বাঁধা সংসারের সহ।
—কুরুক্ষেত্র, পঞ্চম সর্গ

তুচ্ছ ঋষি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবগণ(ও) পারিবে না
জীয়ন্তে কখন ছায়া ছুঁইতে আমার।
—কুরুক্ষেত্র, অষ্টম সর্গ

আমার বক্তব্য এই যে, মধুসূদনপ্রমুখ কবিরা যে 'আলস্য'-বশতই 'এখনও', 'সকলই' প্রভৃতি শব্দকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়েছেন তা নয়, লিখিত অক্ষর-সংখ্যার সমতারক্ষার জন্যই তাঁরা ও-ভাবে ছন্দের মাপ রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। আর ওই লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার সমতা রাখার উদ্দেশ্যেই তাঁরা ও-কার কিংবা ই-কারকে প্রয়োজনমতো বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ শ্রূয়মাণ ধ্বনিপরিমাণের প্রতি তাঁদের লক্ষ্য ছিল না, ছিল দৃশ্যমান অক্ষর-সংখ্যার প্রতি। রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনায় এই দুর্বলতার পরিচয় থাকলেও

তার পরিণত বয়সের রচনায় ও-রকম অক্ষরনিষ্ঠার প্রমাণ একেবারেই নেই। কেবল একটিমাত্র ও-রকম দৃষ্টান্ত আমার নজরে পড়েছে। যথা—

যেন রে 'একই' ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো।

—মানসী, সিন্ধুতরঙ্গ

এখানে 'একই' শব্দের তিন 'অক্ষরে' তিন মাত্রা ধরা হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র এই শব্দটিকেই দৃষ্ট অক্ষরের সংখ্যায় পরিমাপ না করে আমাদের উচ্চারিত তথা শ্রুত ধ্বনির হিসাবে দুই মাত্রা বলে গণনা করতে দ্বিধা করেননি। যথা—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
'একই' লিপি পড়ো ফিরে ফিরে ?

—পূরবী, লিপি

একই' শব্দটি দেখতে তিন হলেও শুনতে দুই। তিনি শ্রুতির অনুসরণ করেই একে দুই মাত্রার মর্যাদা দিয়েছেন। কেননা, তিনি জানতেন ছন্দ-শাস্ত্র দর্শন-শাস্ত্র নয়, ওটি হচ্ছে আসলে শ্রৌত-শাস্ত্র। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই এই যৌগিক ছন্দটিকে দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যার সংকীর্ণ খাঁচা থেকে শ্রূয়মাণ ধ্বনির আকাশে মুক্তি দিয়েছেন।

১১

প্রাক্‌রবীন্দ্র কবিদের প্রতি অবিচার করব না। তাঁরা পূর্বাগত সংস্কারের বশেই যৌগিক ছন্দকে অক্ষরপ্রতিষ্ঠ বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁদের কান অর্থাৎ তাঁদের স্বাভাবিক ধ্বনিরসবোধ অনেক সময়েই সম্ভবত তাঁদের অজ্ঞাতসারেই ওই সংস্কারকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে। আর, ওই লঙ্ঘনের ফলেই ওই ছন্দের স্বরূপ মাঝে মাঝে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, যেমন ঘন অন্ধকারের মধ্যেও হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকে পথিকের সম্মুখবর্তী পথের রেখা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব উর্ধ্ব কর্ণে শুনি'
নূপুরের ঝন্‌ঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী।...
অশ্বপার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি,
নাচিল শীর্ষকচূড়া।

—মেঘনাদবধ, তৃতীয় সর্গ

এখানে 'ঝন্‌ঝনি' শব্দের দ্বিবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করার যোগ্য। তৃতীয় পংক্তিতে অক্ষরের মাপ লঙ্ঘিত হয়েছে, কিন্তু ধ্বনির মাপ ঠিক আছে; কেননা, অক্ষর-সংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও কানের প্রসন্নতা অব্যাহত আছে। তাই কবিও প্রসন্ন-চিত্তেই এখানে আক্ষরিক বিধিকে অমান্য করতে পেরেছেন। চোদ্দ অক্ষরের বিধান পালিত হল না, অথচ ছন্দ ঠিক থাকল, এটা কি করে সম্ভব হল তা-ই বিবেচ্য। লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যাবে, আমরা আবৃত্তির মুখে 'ঝন্‌' যুগ্মধ্বনিটাকে স্বভাবতই দু-জায়গায় দু-রকম করে উচ্চারণ করি। প্রথম জায়গায় ওটা ছন্দের টানে স্বতই আমাদের মুখে একটু শিথিল ও বিস্তৃতভাবে উচ্চারিত হয়, সেজন্যেই ওটা দুই মাত্রার স্থান অধিকার করেছে; আর, দ্বিতীয় 'ঝন্‌'-টা উচ্চারিত হয় একটু সংক্ষিপ্ত ও সংকুচিত আকারে, তাই ওটা একমাত্রার বেশি মূল্য পায়নি। প্রথমটাকে বলব যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারিত বা বিশ্লিষ্ট রূপ, আর দ্বিতীয়টাকে বলব তার সংকুচিত বা সংশ্লিষ্ট রূপ। আরেকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

ইচ্ছা সকলের সঙ্গে
'ঝগড়া' করি পূরিয়া বাসনা।...
দিবসান্তে কৃষ্ণার্জুন আসিলে শিবিরে ফিরি'
'ঝগড়া' ত বাদ তব নাই।

—কুরুক্ষেত্র, তৃতীয় সর্গ

প্রথম 'ঝগ্‌' ধ্বনিটা সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক, কিন্তু দ্বিতীয়টা বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক।

লক্ষ্য করলে আলোচ্য ছন্দের সর্বত্রই যুগ্মধ্বনির এই দ্বৈত-রূপের লীলা দেখা যাবে। যথা—

আজ্ শত-বর্‌ষ পরে
এ-সুন্‌দর্ অরণ্‌যোর্ পল্‌লবের্ স্তরে
কাঁপিবে না আমার্ পরাণ্ ?

—সোনার তরী, বসুন্ধরা

এখানে যুগ্মধ্বনি আছে দশটি। তার মধ্যে চারটি (বর্, সুন্, রণ্, পল্) সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক, আর ছয়টি (আজ্, দর্, ণ্যোর্, বের্, মার্, রাণ্) বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক। এরূপ সর্বত্রই। যুগ্মধ্বনির এই দ্বিবিধ উচ্চারণরূপের যোগে গঠিত বলে এ-ছন্দের নাম দিয়েছি **যৌগিক**। ইংরেজিতে একে বলা যায় Composite Metre।

১২

একটি বড়ো প্রশ্ন এই যে, যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথায় সংশ্লিষ্ট ও কোথায় বিশ্লিষ্ট হবে—এ-বিষয়ে কিছু নিয়ম আছে কি ? উপরের দৃষ্টান্তটিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, প্রত্যেক শব্দের প্রান্তস্থিত যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সম্প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক এবং শব্দের আদি বা মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংকুচিত ও একমাত্রক। আর, এটাই হচ্ছে যৌগিক ছন্দের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান নিয়ম। বলা প্রয়োজন যে, একস্বর (monosyllabic) শব্দের যুগ্মধ্বনিকে প্রান্তিক বলেই গ্রহণ করা হয়, সুতরাং এ-রকম শব্দের ধ্বনিটিও বিশ্লিষ্ট ও কাজেই দ্বিমাত্রক বলেই স্বীকৃত হয়। এ-জন্যেই উপরের 'আজ' ধ্বনিটি দুই মাত্রা মূল্য পেয়েছে।

যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনির মাত্রানির্ণয়ের আরও কয়েকটি নিয়ম আছে। এ-স্থলে ও বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তথাপি অন্তত চারটি নিয়মের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। এই নিয়মগুলি পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মটিরই বিস্তৃত সংস্করণ মাত্র এবং এই বিস্তার উপলক্ষ্যে ওই নিয়মটির যে-সব ব্যতিক্রম দেখা যায়, তা-ই বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়। যাহোক, যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনির মাত্রানিয়ামক প্রধান চারটি রীতি হচ্ছে এই

(১) শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক হয়ে থাকে— এ নিয়মের ব্যতিক্রম এত কম যে নেই বললেই হয়। প্রাচীন সাহিত্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম যথেষ্ট দেখা যায়। যথা—

বঙ্গদেশে 'প্রমাদ' হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি' ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥···
'রঘুবংশের' কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে ;
কৃত্তিবাস রচে গীত 'সরস্বতীর' বরে ॥

—কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়

এখানে তিনটি স্থলে শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির (মাদ্, শের্, তীর্) সংকোচন ঘটেছে। আধুনিক কালে এ-রকম সংকোচনের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তবু যে কয়েকটা নজরে পড়েছে উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি।—

না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে,
'তুই'ও কি দুঃখিনী ?
কেন লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?

—ব্রজাঙ্গনাকাব্য, ময়ূরী

সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষসকুলহর্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি ? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।

—মেঘনাদবধ, পঞ্চম সর্গ

সেই নীতিচক্রে
সকলের কর্মক্ষেত্র আছে নিয়োজিত—
স্বয়ং নির্লিপ্ত তিনি।······
স্ব-প্রকৃতি অনুসারে 'স্বয়ং' যবে নারায়ণ
নির্লিপ্ত কর্মেতে রত।

—কুরুক্ষেত্র, প্রথম ও চতুর্থ সর্গ

'ঐ' যে সারা দিন শুনি রণক্ষেত্রে
ভু-দলেতে হাঁকাহাঁকি।

—কুরুক্ষেত্র, ষষ্ঠ সর্গ

ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্ছারূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান?

—চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পুরুরবা

মনে হল
'ঐ' যেন তোমারি স্বর শুনি
'ঐ' যেন দক্ষিণবায়ু দূরে ফেলি মদির ফাল্‌গুনী
দিগন্তে আসিল পূবদ্বারে।

—মহুয়া, দূত

নদীপ্রান্তে তরুগুলি ঐ দেখ্‌ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।

—মহুয়া, মিলন

মুক্তিসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
'মাভৈঃ' বাজে নৈরাশ্যনিশীথে।

—পরিশেষ, দুয়ার

দিনেরে মাভৈঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।

—পূরবী, সমাপন

সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ,—
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

—নবজাতক, রোম্যান্টিক

তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে 'দাও' উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক্।...
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।

—বনবাণী, নটরাজ, বৈশাখ-আবাহন

এখানে পাঁচটি শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির (তুই, স্বয়ং, ঐ, মাভৈঃ, দাও) সংকোচন ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই ধ্বনিগুলির সম্প্রসারণের দৃষ্টান্তও দেওয়া গেল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ও-রকম শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণটাই সাধারণ নিয়ম; সংকোচনের দৃষ্টান্তগুলি অত্যন্ত বিরল ব্যতিক্রমের নিদর্শন মাত্র। ও-রকম ব্যতিক্রমের আরেকটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল; সেটিকেও এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

না না, এ-ভাষাটা কিছু বেশি গ্রাম্য হয়ে গেল 'ঐ' হে।
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে-মাঝে ভারি 'লাগসৈ' হে।...
কেন ধেয়ে আস ঐ শুভ্রফণা-ফেনরাশি তুলে ?

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র, সমুদ্রের প্রতি

এখানে প্রথম 'ঐ' এবং 'সৈ' ধ্বনিদুটির সংকোচন লক্ষিতব্য।

(২) সংস্কৃত শব্দের আদি- বা মধ্য-স্থিত যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক হয়ে থাকে—এ-নিয়মের ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু তা-ও খুব বিরল। যথা—

কি 'যাচ্ঞা' করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা; যাও ত্বরা করি।

—মেঘনাদবধ, তৃতীয় সর্গ

কি জীব, কি 'উদ্ভিদ্,' চেতন, অজড়, জড়,
সকলই নিজ নিজ স্বতন্ত্র প্রকৃতিপর।

—কুরুক্ষেত্র, চতুর্থ সর্গ

গেল সেই মেঘছায়া নিমেষে সরিয়া,
হাসির জ্যোৎস্না মুখে উঠিল ভাসিয়া।
--কুরুক্ষেত্র, চতুর্দশ সর্গ

বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন 'শীর্ষ'-সমেত।
—সোনার তরী, হিং টিং ছট

যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে।...
শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র'পরে।
—সোনার তরী, বসুন্ধরা

'যুগান্তরের' ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।...
প্রেয়সীর নিশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে।
—পূরবী, অতীত কাল

তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে 'আহ্বান'
নিরুদ্দেশ পথিকের গান।
—সানাই, দূরের গান

গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
'রৌদ্রে' গেরুয়া রং লাগে।
—সানাই, সানাই

ম্লানরৌদ্র অপরাহ্ণবেলা
পাণ্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকাণ্ড একেলা…
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেতনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদ-পরশন মাগি
—সানাই, মানসী

সচ্ছল, উদ্ভিদ্, জ্যোৎস্না, শীর্ষ, যুগান্তর, আহ্বান, রৌদ্র—এই সাতটি শব্দের আদি- বা মধ্য স্থিত যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণ বা ধ্বনিবিস্তারের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে এ-রকম আরও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে দেওয়া যায়। কিন্তু তা অনাবশ্যক। কেননা, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি থেকেই আমার বক্তব্য প্রতিপন্ন হয়েছে আশা করি। অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের অ-প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি সাধারণত সংকুচিতই হয়ে থাকে এবং এ-রীতির ব্যতিক্রম খুবই বিরল। এবার এ-বিষয়ের তৃতীয় নিয়মটির অবতারণা করা যাক।—

(৩) সমাসের ক্ষেত্রে পূর্বোবর্তী শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি বিকল্পে সংশ্লিষ্ট হয়। আগে সংশ্লেষণের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
'মৃৎপাত্রের' মতো যাও ফেলে।
—বলাকা, শা-জাহান

উভয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে…
—পূরবী, পঁচিশে বৈশাখ

এখানে মৃৎ এবং দিক্ এই একস্বর (monosyllabic) শব্দদুটি সমাসবদ্ধ হয়েছে বলেই সংকুচিত হতে পেরেছে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন রূপে ব্যবহৃত হলে ওই যুগ্মধ্বনি দুটি অবশ্যই দুই মাত্রার মর্যাদা পেত। অবশ্য এই তৃতীয় নিয়ম অনুসারে

সমাসবদ্ধ অবস্থাতেও ও-দুটিকে বিশ্লিষ্ট করে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। তাহলে 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে তিন মাত্রা না ধরে চার মাত্রা ধরতে হবে। সুতরাং

উদয়ের দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে

লিখলেও যৌগিক ছন্দের নীতি অব্যাহতই থাকত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটির 'দিক্' ধ্বনিটিকে সম্প্রসারিত করে দুই মাত্রার মূল্য দিয়েছেন। যথা—

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।

—মহুয়া, নববধূ

দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্রকলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

—মহুয়া, প্রত্যাগত

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, সমাসবদ্ধ পদের পূর্বস্থিত একস্বর শব্দের যুগ্মধ্বনিটিকে রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ স্থলেই সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক বলেই গণ্য করেন; ও-রকম ধ্বনির বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বিরল। পক্ষান্তরে উক্ত অবস্থায় দ্বিস্বর শব্দের অন্তিম যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রক প্রয়োগই বেশি দেখা যায়, একমাত্রক প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বিরল। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

শৃগালের ব্রতে
ব্রতী সিংহ, খদ্যোৎব্রতে ব্রতী দিনমণি!

—কুরুক্ষেত্র, প্রথম সর্গ

তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ-ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি··

—পূরবী (সঞ্চিতা), শিবাজীউৎসব

বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দ-রথী, নিত্যবন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্যতারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্তচমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!
—সত্যেন্দ্রনাথ · বেলাশেষের গান, নমস্কার

এখানে খদ্যোৎব্রত, তড়িৎপ্রভা, জগৎপ্রিয়, এই তিনটি সমাসবদ্ধ পদের আদিস্থিত দ্বিস্বর শব্দগুলির প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনিগুলি (দ্যোৎ, ড়িৎ, গৎ) সংকুচিত ও একমাত্রক হয়েছে। ও-রকম প্রয়োগ বিরল; ওই অবস্থায় যুগ্মধ্বনি সাধারণত সম্প্রসারিতই হয়ে থাকে। যথা—

পীড়িত ভুবন লাগি' মহাযোগী করুণাকাতর,
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ
তোমার নিখিল লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।
—কল্পনা, রাত্রি

শরৎমধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে···
—কল্পনা, বঙ্গলক্ষ্মী

নির্জনপ্রান্তরতলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
—পূরবী, তপোভঙ্গ

এই তৃতীয় নিয়মটির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি চিন্তনীয় বিষয় আছে। সমাসবদ্ধ পদের পূর্বাংশস্থিত অ-সংস্কৃত শব্দের অন্তিম মৌলিক যুগ্মধ্বনি কিংবা সংস্কৃত শব্দের প্রান্তবর্তী গৌণ যুগ্মধ্বনিকে সংকুচিত করা হয় না। অর্থাৎ স্কুলপাঠ্য, দোযাত-কলম, জজসাহেব, ডাকটিকিট, জাহাজডুবি, তিলমাত্র, ভারতবর্ষ প্রভৃতি শব্দে

উক্ত তৃতীয় নিয়মটি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও যে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত নেই, তা নয়। যথা—

> গেরস্থারি শম্ভুমালী কিন্তু নিজমনে
> কোনো দিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃক্‌পাত
> 'জামবাটি' উজাড় কৈল গাবু গাবু রবে।
>
> —সত্যেন্দ্রনাথ : হসন্তিকা, অম্বল-সম্বরা-কাব্য
>
> একটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি।
> এর পরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে 'দাঁতকপাটি'॥
>
> —রবীন্দ্রনাথ ছন্দ, পৃ ১৩০

'জাম' এবং 'দাত্'-ধ্বনির সংকোচন লক্ষিতব্য। যাহোক, এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়ের চতুর্থ নিয়মটির কথা বলি।

(৪) অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যে-সব যুগ্মধ্বনি (যে কারণেই হোক) সাধারণত যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লিখিত হয় না বা হতে পারে না, সেগুলি প্রায়শ বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক বলেই গণ্য হয়ে থাকে ; কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক করতেও কোনো বাধা নেই। পূর্বোল্লিখিত ঝন্‌ঝনি, ঝগ্‌ড়া, এক্‌টি, তিন্‌টে প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের দ্বারাই এ নিয়মের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়েছে ; আরও দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক .

> কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
> যে ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।
>
> —বনবাণী, কুরচি
>
> জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
> হেথা আল্‌পনা আঁকে,
> এ নিকুঞ্জ জানো আপনার।
>
> —বনবাণী, চামেলিবিতান

এখানে 'জ্যোৎস্না' শব্দের অন্তর্গত আশ্রিতান্ত ধ্বনিটি বিশ্লিষ্ট হয়েছে পূর্বোক্ত

দ্বিতীয় নিয়মের বৈকল্পিক বিধি অনুসারে। আর, কুরচি ও আলপনা শব্দের যুগ্মধ্বনিটি বিশ্লিষ্ট হয়েছে এই চতুর্থ নিয়ম অনুসারে। এই তিনটি ধ্বনিকেই একটু টেনে বিলম্বিতভাবে উচ্চারণ করা হচ্ছে বলে এরা দুই মাত্রার জায়গা পেয়েছে। কিন্তু একটু ঠেসে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করলেও যৌগিক ছন্দের নীতি অব্যাহত থাকত। যদি লেখা হত—

হে কুরচি, তোমার লাগি···

কিংবা

জ্যোৎস্না যে ডালের ফাঁকে
হেথায় আলপনা আঁকে···

তা হলেও খারাপ শোনাত না এবং ধ্বনিটিও একটু দৃঢ় হত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র এ-সব ধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক রূপে ব্যবহার করেছেন। যথা—

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে···

—বলাকা, শা-জাহান

···পুকুরের পাড়ে
সবুজের আলপনায় রং দিয়ে লেপে।

—জন্মদিনে, ১৯

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

—জন্মদিনে, ১০

এখানে জ্যোৎস্না, আলপনা ও মজদুরি শব্দের যুগ্মধ্বনিটি সংশ্লিষ্ট ও দৃঢ় হয়ে একমাত্রার মূল্য পেয়েছে।

অতঃপর এই চতুর্থ নিয়মের এলাকার মধ্যে পড়ে, এমন একটি প্রশ্নের আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রশ্নটি হচ্ছে যৌগিক ছন্দে হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের

যুগ্মধ্বনিগুলিকে সংশ্লিষ্ট করা চলে কি না। বহুদিন যাবৎ এ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। কয়েক বছর আগে আমি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ্যে এ প্রশ্ন উত্থাপন করি এবং জানতে চাই ও-সব স্থলেও যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষণ করা চলে কি না।[১] রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৃষ্টান্ত রচনা করে জবাব দেন যে, তাও করা চলে এবং তাতে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না। যথা—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
'সিট্‌কে' মুখ খাবি, জ্বর 'আট্‌কে' যাবে কাল।

একটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ 'জুট্‌ল' না তো, স্টুট্‌কি দেখো চেখে।

মত্তরোষে বীরভদ্র 'ছুট্‌ল' ঊর্ধ্বাকাশে,
ঘূর্ণিবেগে 'উড্‌ল' ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

বৈকালে বৈশাখী এল আকাশলুণ্ঠনে,
শুক্লরাতি 'ঢাক্‌ল' মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে।

—ছন্দ, পৃ ১৩০, ১৫৩

এখানে সিট্‌কে, আট্‌কে, জুট্‌ল প্রভৃতি ছয়টি হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদে যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষণ ঘটেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এখানে "ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি"।[২] এই আলোচনার পূর্বে তিনি যৌগিক ছন্দে কখনও হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেননি। অতঃপর সাক্ষাতেও তাঁর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলোচনা হয়। তার কিছুদিন পরেই তিনি যৌগিক ছন্দে উক্তপ্রকার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। ওই কবিতাগুলি 'পরিশেষ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ও-সব কবিতায় তিনি চলতি ক্রিয়াপদের মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট না করে অক্ষরসংখ্যার হিসাবে বিশ্লিষ্টই করেছেন। যথা—

১ বিচিত্রা, ১৩৩৮, কার্তিক। ২ ছন্দ, পৃ ১৩১।

সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
'উঠত' না শঙ্খধ্বনি,
'মিলত' না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
'রইত' নীরব।

—পরিশেষ, প্রাণ

উঠত, মিলত, রইত—তিন স্থলেই যুগ্মধ্বনি বিশ্লিষ্ট। 'ছন্দ' গ্রন্থের কয়েকটিমাত্র উদাহরণ ব্যতীত ক্রিয়ামধ্যস্থ যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা যায় না।

আধুনিক কালে কেউ কেউ হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের অন্তর্ভুক্ত যুগ্মধ্বনিকে সংকুচিতরূপে ব্যবহার করে থাকেন। যথা—

বসন্ত সত্যিই 'আসবে'? কী দরকার এসে?

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়. পদাতিক, আলাপ

আমাদের হাতে 'আসবে' রাজ্যভার? চমৎকার কিবা!

—পদাতিক, অতঃপর

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রচনা থেকেও ক্রিয়ামধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনির সংকুচিত রূপের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বাজবে ঘন রণভেরী, হবে ঘোর রণ,
বন্দুক ধরিয়া গোলা করব বরিষণ,
মোরা করব বরিষণ।

—যোগীন্দ্রনাথ: হাসিরাশি, শখের সেনা

১৩

যৌগিক ছন্দের আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালীটা বিতর্কের বিষয় বলে ও-বিষয় নিয়ে একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা গেল। আশা করি এ-কথা স্পষ্ট করতে পেরেছি যে, অক্ষরসংখ্যার সমতাই ও-ছন্দের মূলনীতি নয়; যুগ্মধ্বনির

সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণরূপের যথাযোগ্য সমবায়েই ও-ছন্দ গঠিত। একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিকে ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অনেক স্থলেই অক্ষরসংখ্যার মাপ ঠিক নেই, অথচ ছন্দ সর্বত্রই ঠিক আছে, কোথাও কানে খটকা লাগে না। তাব দ্বারাই প্রমাণিত হয় অক্ষরসংখ্যার সমতার উপর ও-ছন্দ প্রতিষ্ঠিত নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত, এখন চলে না।" আধুনিক সতর্কতার দিনে ধ্বনির মাপ সমান রেখে অক্ষরের মাপে ইতরবিশেষ করা অনায়াসেই চলে। আর, এইটেই হচ্ছে ছন্দস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান কীর্তি। তিনিই শতাধিক বৎসরের আক্ষরিক সংস্কারকে ছিন্ন করে যৌগিক ছন্দকে বিশুদ্ধ ধ্বনিভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, "আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই" চলতে পাবে না।

এ-বিষয়ে আরও একটি বক্তব্য আছে। তখনকার অক্ষরনিষ্ঠার দিনে ধ্বনির মাপের সঙ্গে অক্ষরের মাপ মেলাবার জন্যে কবিরা অনেক সময় শব্দের প্রচলিত বানানকে ভেঙে বিশ্লিষ্ট করতেন। যেমন, 'কল্পনা'-কে কলপনা, 'যৌবন'-কে যউবন, 'বৈশাখ'-কে বইশাখ লেখা হত। কিন্তু আজকালকার ধ্বনিনিষ্ঠার দিনে ওভাবে বানান ভেঙে অক্ষরসংখ্যার সমতা রাখার আবশ্যকতা নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'ঐ' ধ্বনিটা যৌগিক ছন্দে স্বভাবতই দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়ে থাকে। অথচ ওতে অক্ষর মাত্র একটি। তাই তৎকালের কবিরা অধিকাংশ স্থলেই ও-শব্দটিকে ভেঙে 'ওই'রূপে লিখতেন। কেননা, তাতে অক্ষরসংখ্যাব সমতা রক্ষা হয়। যথা—

> ওই যে দেখিছ রথী, স্বর্ণচূড় রথে
> ভীমমূর্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃদলপতি···
>
> —মেঘনাদবধ, প্রথম সর্গ

এখানে যদি 'ওই' না লিখে 'ঐ' লেখা হত তাহলে অক্ষরসংখ্যা কমে যেত

ট, কিন্তু যৌগিক ছন্দের নীতি অক্ষুণ্ণই থাকত। তাই আজকাল আর 'ওই' লেখা অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হয় না। যথা—

ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

—বলাকা, বলাকা

উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।

—পূরবী, পঁচিশে বৈশাখ

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।

— পরিশেষ, বুদ্ধদেবের প্রতি

এবার আরেক রকম একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

প্রান্তর্ সীমায় ছায়াবটে
মৌনব্রত বউ্কথাকও্।

—বনবাণী, নটরাজ, হেমন্ত

এখানে প্রত্যেক শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি (যুগ্মদণ্ডচিহ্নযোগে নির্দিষ্ট) দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অন্য যুগ্মধ্বনিগুলি একমাত্রক বলেই গণ্য হয়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে 'বউ' কথাটিতে দুই মাত্রা ধরা হয়েছে; 'বউ' না লিখে যদি 'বৌ' লেখা হত তাহলেও অর্থাৎ প্রচলিত হিসাবে অক্ষরসংখ্যা কমে গেলেও ছন্দ ঠিকই থাকত এবং 'বৌ' কথাটিও দ্বি-মাত্রক বলেই গণ্য হত। অউ্-কার অর্থাৎ ঔ-কারের মতো যদি অও্-কারের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংকেতলিপি থাকত, তাহলেও 'কও' কথাটির দ্বিমাত্রকতা অব্যাহতই থাকত। 'বউকথাকও' কথাটিকে ছয় অক্ষরের সাহায্যেই লেখা হোক আর চার অক্ষরের সাহায্যেই লেখা হোক, ও-কথাটি যৌগিক ছন্দে সর্বদাই ছয় মাত্রা বলেই গৃহীত হবে; কারণ অউ্ এবং অও্ শব্দের অন্তে আছে।

পক্ষান্তরে 'মৌন' কথাটিকে যদি 'মউ্ন'রূপে লেখা হয়, তাহলেও ও-শব্দটি দ্বিমাত্রিক বলেই গণ্য হবে, কারণ এখানে অউ্-কার শব্দের প্রান্তে অবস্থিত নয়। বোঝা গেল তথাকথিত 'অক্ষর'বৃত্ত আসলে অক্ষর বা লিপির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে যুগ্মধ্বনির প্রয়োগবৈচিত্র্যের উপর। এইটেই হচ্ছে যৌগিক ছন্দের মূলনীতি এবং এ-নীতিটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেমন অব্যাহত আছে, তাঁর পূর্ববর্তী কোনো কবির রচনাতেই তেমন অব্যাহত নেই। বস্তুত তাঁরই প্রয়োগ-প্রণালী থেকে এ-ছন্দের স্বরূপনির্ণয়ে সবচেয়ে বেশি সহায়তা পাওয়া গিয়েছে।

১৪

নব্যমাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত, ছন্দের এই দুটি ধারাই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান এবং যৌগিক ছন্দও তাঁরই হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে। বাংলা ভাষার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণরীতি ও ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টি নিয়ে রচনাকার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই তিনি বাংলা ছন্দে মাত্রাবৃত্ত (moric), স্বরবৃত্ত (syllabic) ও যৌগিক (composite), এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছেন। ধ্বনির একক বা unit নির্ণয় এবং তার প্রয়োগের বিভিন্ন প্রণালী থেকেই বাংলা ছন্দের এই তিনটি ধারার উৎপত্তি হয়েছে। কয়েকটি এককের বিভিন্নরকম সমাবেশের ফলে যে ছন্দপর্ব উৎপন্ন হয়, তার ভিতরকার গঠন-কৌশলের উপরেই ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি নির্ভর করে। আর, ওই ছন্দপর্বের বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দের বাহ্য আকৃতি। ছন্দপর্বের নির্মাণ ও তার বিচিত্র সমাবেশ, এই উভয় ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও কৌশল অপরিসীম।

আমাদের উচ্চারণ কখনও অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে না। কথোপকথন বা পাঠের সময়ে আমাদের উচ্চারণের ধারায় প্রায়শই ছেদ ঘটে। এই ছেদ বা যতির দ্বারা খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহের যে অংশ, তারই নাম **পর্ব** (foot বা measure)। ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে যতিস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন প্রকারের পর্বের উৎপত্তি হয়। রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র উপায়ে যতিস্থাপন ও পর্বগঠন করেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি যে শুধু নবনব উপায়ে বিচিত্র পর্বগঠনপদ্ধতির উদ্ভাবন

করেছেন তা নয়; তিনি বহুপ্রচলিত ছন্দপর্বকে পুনর্গঠিত ও সুসংগত করেছেন এবং স্থলবিশেষে পরিত্যাগও করেছেন। এই গ্রন্থের স্বল্পপরিসরের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। আমরা কয়েকটি মাত্র প্রধান প্রধান বিষয় অবলম্বন করে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

১৫

প্রথমেই **মাত্রাবৃত্তের** কথা। প্রতিপর্বে চার, পাঁচ, ছয় কিংবা সাত মাত্রার সমাবেশ হতে পারে, এই হিসাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আগে বলেছি নব্যমাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম আবির্ভাব হয় 'মানসী' কাব্যে। শুধু তাই নয়, মাত্রাবৃত্তের উক্ত চারপ্রকার প্রকাশরূপই 'মানসী'তে দেখা দিয়েছে। কোনো একখানি কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। বস্তুত বাংলা কাব্যের ছন্দোবিকাশের ইতিহাসে 'মানসী'র স্থান অবিস্মরণীয়। যাহোক, এবার এই চারপ্রকার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কথা একে একে আলোচনা করা যাক।

আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় **চতুর্মাত্রক পর্ব** (tetramoric foot)। এ-রকম পর্বের বৃহৎ সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কবির মনে খুব ভরসা ছিল এবং 'মানসী' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় সে-কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত গ্রন্থের দুটিমাত্র কবিতায় ওই চার মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তলছবি ?···
তোমারে ঘেরিয়া ফেলি' কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্তপবন ?···
শ্রান্তি লুকাতে চাও ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে।.
মূর্খ দম্ভভরা দেহ,
তোমারে করিয়া যায় স্নেহ।···

দেখো, হোথা নদীপর্বত,
অবারিত অসীমের পথ।…
দেখো হোথা নূতন জগৎ,
ওই কারা আত্মহারাবৎ ;
যশঅপযশবাণী কোনো কিছু নাহি মানি'
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।…
ওই কারা বসে আছে দূরে
কল্পনা উদয়াচলপুরে।

—মানসী, কবির প্রতি নিবেদন

এটি হচ্ছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম চতুর্মাত্রপাবিক ছন্দ (২৫ জ্যৈষ্ঠ; ১৮৮৮)। তাই এটির বিশেষ গৌরব আছে, আর সে-জন্যেই একটু বেশি করে উদ্ধৃত করা গেল। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর নানা স্থানে দুর্বলতার লক্ষণও যথেষ্ট রয়েছে। এই কবিতাটির অনেক স্থলেই কেমন যেন একটু আড়ষ্ট ভাব আছে, তার গতির মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য নেই; অথচ চার মাত্রার ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওর নৃত্যপরায়ণ দ্রুতগতি। তা-ছাড়া, এটির প্রথম যুগ্মধ্বনি স্থাপনেই ত্রুটি ঘটেছে। যদি লেখা হত, "যেন কাঠ-পুত্তল-ছবি" কিংবা "যেন কাঠ-পুতুলের ছবি" তাহলে ছন্দ ঠিক থাকত। শুধু তাই নয়, এ-কবিতাটির ছন্দে কবি শেষরক্ষা করতে পারেননি। আরম্ভ করেছেন মাত্রিক পদ্ধতিতে, কিন্তু শেষ করেছেন যৌগিক পদ্ধতিতে। উদ্ধৃত অংশটুকুর শেষের দিকে আত্মহারা, ভবিষ্যৎ ও কল্পনা, এই তিনটি শব্দের যুগ্মধ্বনিসন্নিবেশ হয়েছে যৌগিক রীতিতে; অর্থাৎ শব্দের অ-প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি মাত্রিক কায়দায় সম্প্রসারিত না হয়ে যৌগিক কায়দায় সংকুচিতই হয়েছে। কাজেই বলতে হবে, বাংলার প্রথম চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দটি সফল হতে পাবেনি। তার কারণ কি? আমার মনে হয়, কবি আট-আট-দশ ব্যষ্টির (॥॥।-এর) যৌগিক ত্রিপদীকেই মাত্রাবৃত্তে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করে। ফলে চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের

যে একটি বিশিষ্ট গতিভঙ্গি আছে, সেটা যথোচিত রূপে ধরা পড়েনি। তা-ছাড়া, দশমাত্রার পরিধির মধ্যে এ-ছন্দের গতিলীলাপ্রকাশের যথেষ্ট পরিসর থাকে না। যে-কারণেই হোক, কবির নিজের কানও এ-ছন্দে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বলেই মনে হয়। কেননা, অতঃপর বহু বৎসরের মধ্যে তিনি এ-ছন্দে আর কোনো কবিতা রচনা করেননি। পরিণত বয়সে অবশ্য তিনি দশ ব্যষ্টির পরিধির মধ্যেই এই মাত্রিক রীতিকে নির্দোষভাবে প্রয়োগ করেছেন। যথা—

যা-হোক, এ-কথা চাই শোনা,
তাড়াতাড়ি ছন্দে লিখো না,
        না-হয় না হলে কবিবর,
অনুকরণের শরাহত
আছি আমি ভীষ্মের মতো,
        তাহে তুমি বাড়িয়ো না স্বর।
যে-ভাষায় কথা কয়ে থাকো
আদর্শ তারে বলে না কো,
        আমার পক্ষে সে তো ঢের,
Flatter কবিতে যদি পারো,
গ্রাম্যতা দোষ যত তারো
        একটু পাব না আমি টের।

—প্রহাসিনী, পলাতকা

এ-রকম দৃষ্টান্ত বেশি নেই। তার থেকেও মনে হয়, দশমাত্রার অল্প পরিসরের মধ্যে মাত্রিক রীতি ভালো ফোটে না।

যাহোক, উক্ত "কবির প্রতি নিবেদন" কবিতার দুর্বল ছন্দ রচনার পরের দিনই তিনি রচনা করেন "গুরুগোবিন্দ" কবিতা; এই কবিতাটিতে ষণ্মাত্রক পর্বের ছন্দ এমন শক্তি ও তেজ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, তখনকার দিনের পক্ষে বিস্ময়কর বলে স্বীকার করতে হয়। তার পরের দিনই (২৭ জ্যৈষ্ঠ; ১৮৮৮)

আবার তিনি চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন "নিষ্ফল উপহার" কবিতায়। এবারকার পরীক্ষা ত্রিপদী নিয়ে নয়, পয়ার নিয়ে। যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছলছল করতালি দেয় অনিবার।

এখানে তিনি যৌগিক পয়ারকেই মাত্রাবৃত্তের রূপ দিতে চেয়েছেন, চার মাত্রার পর্ব নিয়ে তার স্বকীয় ভঙ্গিতে ছন্দরচনার চেষ্টা করেননি। তাই এখানেও চতুর্মাত্রপর্বিকতার বিশিষ্ট রূপটি ফুটে ওঠেনি। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে ওই রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যথা—

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিতকায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়!

এখানে চার মাত্রার গতিভঙ্গি কেমন সুন্দর! কিন্তু অন্য অনেক স্থলেই ছন্দো-গতির এই সাবলীলতা নেই। তাই কবিও এই পরীক্ষায় প্রসন্ন হতে পারেননি। বোধ করি সে-জন্যেই দীর্ঘকাল আর এ-ছন্দ ব্যবহার করেননি। শুধু তাই নয়, পরবর্তী কালে (১৯১৫) এই কবিতার মাত্রিক ছন্দটিকে যৌগিক ছন্দে রূপান্তরিত করে পুনঃপ্রকাশ করেন।[১] 'কথা ও কাহিনী'র 'কাহিনী' অংশে এই রূপান্তরিত পাঠটিই মুদ্রিত হয়ে থাকে। এই যৌগিকরূপের নিদর্শনস্বরূপ তার প্রথম ছয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করে দিলাম।—

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল,
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল;
সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্ছি' জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে গর্জি' অনিবার।

১ ইণ্ডিয়ান প্রেসকর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত 'মানসী'তে "নিষ্ফল উপহার" কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।

কিন্তু পরিণত বয়সে কবির হাতে ওই চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দ-রচনার কৌশলটি সম্পূর্ণরূপেই ধরা দিয়েছিল এবং যে মাত্রাবৃত্তপয়ার রচনা একসময়ে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই মাত্রিক পয়ারই তাঁর রচনায় অতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যথা—

কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে;
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।
আমি মনে মনে ভাবি, চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক নাকো সোজা বোম্বাই।
দিল্লিলাহোরে যাক, যাক না আগরা
মাথায় পাগড়ি দেব, পায়েতে নাগরা।

বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন করে ডাক ছাড়ি'।
কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি,
অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী।

—সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ৩৬, ৫১

চম্পক তরু মোরে প্রিয় সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে!
মধুকরবন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নতশাখে মুখ চাহে কত কার।...
পুষ্পচয়িনী বধূ কঙ্কণক্বণিতা,
অকথিতা বাণী তার কার স্বরে ধ্বনিতা।

—বীথিকা, কবি

ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো জাগালে
ভাবিতাম আছি যেন স্বর্গের নাগালে।...

নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাত-দুপুরে,
অপ্সরী যেত যেন তাল রেখে নূপুরে।
—গল্পসল্প, ধ্বংস

শুধু পয়ার নয়, অন্য নানা আকৃতির ছন্দোবন্ধেও তিনি চাতুর্মাত্রিক রীতির প্রয়োগ করেছেন। সব ছন্দোবন্ধের আলোচনা এ-স্থলে সম্ভব নয়। শুধু দুটি আকৃতির বিষয় উত্থাপন করব। আমরা দেখেছি পুরাদস্তুর মাত্রাবৃত্ত দেখা দেয় 'মানসী'তে, কিন্তু তার সূচনা হয়েছিল বহু আগেই একেবারে 'শৈশবসংগীত'-এর যুগে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বিব্রত শরমে,
হরষিত মরমে,
আনতআননে বালা ফুলদল গুনিছে।
—শৈশবসংগীত, ফুলবালা

এখানে শুধু যে চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দেরই পূর্বাভাস পাচ্ছি, তা নয়; পর্বসমাবেশ-রীতির মধ্যেও এ ছন্দের অতি চমৎকার পরিণতির পূর্বাভাস রয়েছে। এই ছন্দোবন্ধটি পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে অতি সুন্দব পরিণতি লাভ করেছে। তাছাড়া, তাঁর এত অল্প বয়সের রচনাতেও যে জয়দেবের "সমুদিতমদনে রমণী-বদনে" কিংবা "রতিসুখসারে গতমভিসারে" প্রভৃতি ছন্দের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সেটা কম বিস্ময়েব কথা নয়। কিন্তু আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের ছন্দ অতি অল্প বয়সেই আয়ত্ত করেছিলেন। যাহোক, উক্ত ছন্দোবন্ধের পরিণত রূপের দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

যদি জোটে দরদী
ছোটো-দি কি বড়ো-দি
অথবা মধুরা কেউ নাতনীব rank-এ
উঠিবে আনন্দিয়া,
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে সাধুবাদে thank-এ।
—প্রহাসিনী, ভাইদ্বিতীয়া

ওগো বধূ সুন্দরী
নব মধুমঞ্জরী
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন ;
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুনরাত্রে
স্বর্ণেব বর্ণের ছন্দের বন্ধন।

—গীতবিতান, দ্বিতীয় সং, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৩৪

এবার রবীন্দ্রনাথের আরেকটি প্রিয় ছন্দোবন্ধের বিষয় আলোচনা করব। প্রথমেই একটি দৃষ্টান্ত দিলে সুবিধা হবে।—

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

—কড়ি ও কোমল, ভুল

এটিকে তেরো মাত্রার পয়ার বা 'উনমাত্রিক পয়ার' বলে অভিহিত করতে পারি। এ-রকম দুটি পংক্তির সঙ্গে একটি চৌপদী জুড়ে দিয়ে শ্লোকস্তবক (stanza) রচনা তাঁর একটি প্রিয় রীতি ছিল। কেননা, পয়ারে চৌপদীতে মিলে বেশ একটু বৈচিত্র্য হয়; একঘেয়ে হবার আশঙ্কাও থাকে না। উক্ত 'ভুল' কবিতাটির একটি চৌপদী হচ্ছে এ-রকম।—

মধুরাত্তি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বার বার,
সে-জন ফেরে না আর
যে গেছে চলে।

এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, এই কবিতাটির সর্বত্রই যুক্তাক্ষর সযত্নে বর্জিত হয়েছে; কেবল ওই 'পূর্ণিমার' কথাটিতে একটি যুক্তাক্ষর রয়ে গেছে। এই যুক্তাক্ষর-বর্জনের হেতু কি, তা ভেবে দেখা দরকার। পূর্বে এক জায়গায় বলেছি যে, যৌগিক ছন্দ কোথাও অসম অর্থাৎ অযুগ্মসংখ্যক মাত্রাকে স্বীকার করে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, অসমসংখ্যক মাত্রার বিভাগ ওই শ্রেণীর ছন্দের

প্রকৃতিবিরোধী ; বস্তুত মাত্রাচালের সমতাকেই রবীন্দ্রনাথ যৌগিক ছন্দের প্রধান লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই উক্তি যে অতি মূল্যবান্, তা ছান্দসিকমাত্রই স্বীকার করবেন। যাহোক, উনমাত্রিক পয়ার বা উনমাত্রিক চৌপদীর শেষাংশে একটি করে অসমসংখ্যক মাত্রার বিভাগ থাকে যা ঠিক যৌগিক রীতির অনুকূল নয়। ওই অসম বিভাগটি সমগ্র ছন্দটিকেই এমন ভঙ্গিতে দুলিয়ে তুলতে চায়, যা যৌগিক ছন্দের ধ্বনি-আন্দোলনের স্বধর্মী নয় ; বস্তুত ওই অসম বিভাগের ফলে যে দোলা জাগে সেটা হচ্ছে মাত্রাবৃত্তজাতীয়। আর, মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিকের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যুগ্মধ্বনির সংকোচন-সম্প্রসারণ নিয়ে। যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনির সংকোচন ঘটে, মাত্রাবৃত্তে কখনও ঘটে না। আর, উনমাত্রিক পয়ার বা চৌপদীর প্রকৃতি যেহেতু যৌগিকধর্মী নয়, সেজন্যে ও-ছন্দে যুগ্মধ্বনির সংকোচনে কান প্রসন্ন হয় না। 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময়েই রবীন্দ্রনাথের কানে এ তত্ত্বটি ধরা পড়েছিল ; অথচ তখনও মাত্রাবৃত্তের রীতি উদ্ভাবিত হয়নি। তাই তিনি প্রখর কানের স্বাভাবিক প্রেরণাবশেই ওই কবিতাটিতে সযত্নে যুক্তাক্ষর বর্জন করে চলেছেন। কেবল 'পূর্ণিমার' শব্দে একটি যুক্তাক্ষর রয়ে গিয়েছে এবং পরবর্তী রবীন্দ্র-ছন্দে অভ্যস্ত কানে ও-জায়গায় একটু খটকা লাগে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও যে এটা অনুভব করেননি, তা নয়। তার প্রথম প্রমাণ সযত্নে যুক্তাক্ষরবর্জন ; দ্বিতীয় প্রমাণ পরবর্তী কালের উনমাত্রিক পয়ার চৌপদী রচনার রীতিপরিবর্তন।

'মানসী'তে এ-রকম শ্লোকস্তবকের কবিতা একটিও নেই। কিন্তু 'সোনার তরী'তে আছে দুটি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে উক্ত গ্রন্থের 'সোনার তরী' নামক বিখ্যাত প্রথম কবিতাটি। এটি থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমগ্র কবিতাটির মধ্যে ওই 'শূন্য' শব্দটি ছাড়া অন্য কোথাও একটি যুক্তাক্ষর নেই। 'মানসী'র যুগেই মাত্রাবৃত্তের রীতি অর্থাৎ শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণের রীতি উদ্‌ভাবিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বেই দেখেছি পয়ারজাতীয় চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের মাত্রিক কায়দা তখনও কবির আয়ত্ত হয়নি, অথচ উনমাত্রিক পয়ার বা চৌপদী ছন্দের শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনির সংকোচনও ভালো শোনায় না। তাই শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনির ব্যবহারই সযত্নে বর্জন করেছেন এবং সেই জন্যেই যুক্তাক্ষরও বর্জিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, উক্ত 'শূন্য' শব্দটির মধ্যে যে যুগ্মধ্বনিটি রয়েছে সেটি মাত্রিক কায়দায় বিশ্লিষ্টই হয়েছে, যৌগিক কায়দায় সংশ্লিষ্ট হয়নি। কাজেই শুনতেও ভালোই হয়েছে, কানে খটকা লাগে না। কিন্তু আগের দৃষ্টান্তটিতে 'পূর্ণিমা' শব্দের যুগ্মধ্বনিটি মাত্রিক কায়দায় বিশ্লিষ্ট না হয়ে যৌগিক কায়দায় সংশ্লিষ্ট হয়েছে, কাজেই কানের অপ্রসন্নতাও ঘোচে না। প্রশ্ন হতে পারে, 'শূন্য' কথাটিতে যদি সুষ্ঠুভাবে মাত্রিক রীতিতে যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণ হয়ে থাকে, তবে কবি ওই কবিতাটির অন্যত্রও এ-ভাবে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার করলেন না কেন। তার উত্তর এই। আমার বিশ্বাস কবি নেহাত কানের স্বাভাবিক প্রেরণাবশেই 'শূন্য' কথাটিতে যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন, সচেতনভাবে নয়। কবি এ বিষয়ে সচেতন থাকলে সমগ্র কবিতাটিতেই সম্প্রসারিত যুগ্মধ্বনি ব্যবহার অবশ্যই করতেন। কিন্তু আমরা জানি চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দে যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণ-কৌশল তখনও কবির আয়ত্ত হয়নি। ওই একটিমাত্র যুগ্মধ্বনিকে যে নিজের অলক্ষ্যেই সম্প্রসারিত করেছেন, তার অন্য প্রমাণও আছে। 'সোনার তরী' কবিতাটি লেখার ঠিক এক বছর পরে লেখেন 'অনাদৃত'নামক কবিতাটি (ফাল্গুন; ১৮৯৩)। এটিও 'ভুল' এবং 'সোনার তরী'র ন্যায় উনমাত্রিক পয়ার-চৌপদী ছন্দেই রচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতাটিতেও একটিমাত্র যুক্তাক্ষর অর্থাৎ শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি আছে। যথা—

ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলি'
জাল ফেলে টেনে তুলি,

উঠিল গোধূলিধূলি

ধূসর নভে।

গাভীগণ গৃহে ধায় হরষরবে।

এখানে 'তৃষ্ণা' শব্দের যুগ্মধ্বনিটি পূর্বোক্ত 'পূর্ণিমা'র ন্যায় সংশ্লিষ্টই হয়েছে, 'শূন্য' শব্দের মতো বিশ্লিষ্ট হয়নি। ফলে এখানেও কান প্রসন্ন হচ্ছে না। এখানে সহজেই 'তৃষ্ণা'র স্থলে 'তৃষা' লিখে কানের খটকা এড়ানো যেত; বস্তুত এই কবিতারই অন্যত্র (কোনো তৃষা-বাসনার) 'তৃষা' লিখে শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনিকে বর্জন করা হয়েছে। উদ্ধৃত অংশটুকুতে কেন তা করা হল না বলা শক্ত। যা হোক এ কথা প্রমাণিত হল যে, 'শূন্য' শব্দের ধ্বনিবিস্তার সচেতন নয়; সচেতন হলে 'তৃষ্ণা' শব্দে ধ্বনিসংকোচ ঘটত না। যা হোক, 'ভুল', 'সোনার তরী' ও 'অনাদৃত' এই তিনটি কবিতায় যথাসাধ্য যুগ্মধ্বনিবর্জন এবং যথাক্রমে 'পূর্ণিমা', 'শূন্য' ও 'তৃষ্ণা' শব্দের যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণ-সংকোচন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থেকে এই অনুমান হয় যে, শেষোক্ত কবিতার তারিখ (ফাল্গুন ; ১৮৯৩) পর্যন্ত কবি ঊনমাত্রিক পয়ার এবং চৌপদীর পক্ষে মাত্রিক ও যৌগিক রীতির মধ্যে কোন রীতি বেশি উপযোগী হবে তা স্থির করে উঠতে পারেননি। কিন্তু তার তিন-চার মাস পরে রচিত 'হৃদয়যমুনা' কবিতায় (আষাঢ় ; ১৮৯৩) দেখি তিনি উক্তপ্রকার ঊনমাত্রিক ছন্দোবন্ধের বাহন হিসাবে যৌগিক রীতিটিকেই বেছে নিয়েছেন এবং তাতে শব্দমধ্যস্থ সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির ব্যবহারেও বিশেষ কার্পণ্য করেননি।

তল তল ছল ছল কাঁদিবে গভীর জল

ওই দুটি সুকোমল

চরণ ঘিরে।

আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তলসম

মেঘ নামিয়াছে মম

দুইটি তীরে।

ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকি-ঝিনি
কে গো তুমি একাকিনী
আসিছ ধীরে।

খানে শুধু 'বর্ষা' ও 'কুন্তল' শব্দে যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়েছে। অন্যান্য অংশে এ-কম ব্যবহার আরও আছে। কিন্তু এই সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিগুলি যেন উপলখণ্ডের তো ছন্দের অবাধ ধ্বনিপ্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। বস্তুত সমস্ত বিতাই যেন যৌগিক ও মাত্রিক রীতির মধ্যে কেমন অব্যবস্থিত ভাবে দোদুল্যমান হয়ে আছে।

কবি নিজেও এটা অনুভব করেছিলেন বলে মনে হয়। কেননা, অতঃপর দীর্ঘ াল তিনি ঊনমাত্রিক পয়ার কিংবা চৌপদী রচনা করেননি। তারপর পরিণত য়সে আবার যখন এ-জাতীয় ছন্দ রচনা করেন তখন অসংকোচে তাকে মাত্রিক ীতির এলাকায় স্থাপন করলেন। তখন চার মাত্রার ছন্দ-রচনার কৌশল স্পূর্ণরূপে আয়ত্তে এসেছে। তাই যখন ঊনমাত্রিক পয়ার ও চৌপদীতে ওই কৌশলের প্রয়োগ করলেন, ছন্দ তখন উদ্দাম উচ্ছল গতিতে ছুটে চলল; কোথাও কোনো বাধা মানেনি। যথা—

কিংশুক-কুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গিতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

—মহুয়া, বরযাত্রা

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানি না কি লাগি ছিলে অন্যমনে
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।

একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতাপানে আঁখি অন্ধ ছিল।
—বীথিকা, উদাসীন

এই দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে "বিদায় করেছ যারে নয়নজলে" কিংবা "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা" প্রভৃতি নিস্তরঙ্গ লাইনগুলির তুলনা করলেও আমার কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এই দৃষ্টান্ত-দুটিতে প্রচুর শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি রয়েছে এবং সবই মাত্রিক রীতিতে বিশ্লিষ্ট, যৌগিক রীতিতে সংশ্লিষ্ট নয়; আর, তাতেই এ ছন্দের সৌন্দর্য। বলা বাহুল্য যে, এগুলি হচ্ছে নব্যরীতির চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

প্রত্নরীতির চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দেও রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অসামান্য। পূর্বেই বলেছি, আধুনিক কালের আবৃত্তি বা পাঠযোগ্য কবিতা রচনায় প্রত্নরীতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অচল, তাই শুধু গীতিরচনার এলাকাতেই ওই রীতির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। শুধু একটি কাব্যের পক্ষে এই উক্তি প্রযোজ্য নয়, সেটি হচ্ছে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"। এই কাব্যে ইচ্ছাপূর্বক প্রাচীন ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে; তাই এই গ্রন্থের পঠিতব্য কবিতাতেও প্রাচীন ছন্দোরীতি রক্ষিত হয়েছে। যা হোক, এবার এই কাব্য থেকে প্রত্নরীতির চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের উদাহরণ দিচ্ছি।—

গহনতিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি
শূন্য কদমতরু-মূলে,
ভূমিশয়ন-পর আকুল কুন্তল
কাঁদয় আপন ভুলে। —ভানুসিংহ, [illegible]

গোপবধূজন বিকশিতযৌবন
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর-পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কোঁ তুঁহু বোলবি মোয়? —ভানুসিংহ, ২[illegible]

দুটি দৃষ্টান্তেই একটি করে ছন্দোগত ত্রুটি আছে। এ-রকম ত্রুটি ও-গ্রন্থের সর্বত্রই পাওয়া যাবে। কারণ যে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে ও-বই রচিত সেই পদাবলীতেই ও-রকম অজস্র ত্রুটি রয়েছে। যা হোক, এবার রবীন্দ্রনাথের গীতি-রচনা থেকে প্রত্ন চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগযুগধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক, জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।
—গীতবিতান, দ্বিতীয় সং, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৫৪

১৬

রবীন্দ্রসাহিত্যে চতুর্মাত্রক পর্বের বিবর্তনের ইতিহাসটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। তাই একটু বিস্তৃতভাবেই ও-বিষয়ের আলোচনা করা গেল। এবার **পঞ্চমাত্রক পর্ব** (Pentamoric foot) আমাদের অলোচ্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত নেই, অবশ্য যদি গোবিন্দদাসের "চিকনকালা গলায মালা" প্রভৃতি দুটি পংক্তিকে ও-ছন্দের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য না করা হয়। আমাদের লোকসাহিত্যে পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে॥

কিন্তু স্বভাবতই ছড়াসাহিত্যে কোনো ছন্দেরই আদর্শ সর্বত্র সমানভাবে অনুসৃত হয় না; ঘন ঘন ছন্দের রূপ বদল হয়, নানা আদর্শের মিশ্রণ ঘটে, ধ্বনিসন্নিবেশে ত্রুটি ঘটে এবং আবৃত্তির ভঙ্গিতে সে ত্রুটিকে মার্জনা করা হয়।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥

ইত্যাদি ছড়াটির সব অংশের প্রতি লক্ষ্য করলে ওই কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। দেখা যাবে ছড়ার ছন্দে সর্বত্র সমতা রক্ষা করা হয় না। পূর্বোক্ত 'চিকন-কালা' প্রভৃতি লাইনদুটিও ছড়ার আদর্শেই রচিত হয়েছে বলে মনে হয়; তাতেও এক জায়গায় ('তেরছ নয়ানে') ত্রুটি ঘটেছে। যা হোক, আমার বক্তব্য এই যে, পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য থেকে নিয়েছেন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে এ-ছন্দের অতি সুন্দর আদর্শ রয়েছে। যথা—

অহহ কলযামি বলয়াদিমণিভূষণং।
হরি বিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরতি-ঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্॥

—গীত ১৩, ১৯

এই ছন্দের অনুসরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। আমরা দেখেছি অতি অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের এই ছন্দটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর বাল্যরচনাতেই যে এ-ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায় তা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নয়। যা হোক, তাঁর অল্পবয়সের রচনা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

ভ্রমর কহে, "হোথায় বেলা, হোথায় আছে নলিনী,
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলিনি!
মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব!"

—শৈশবসংগীত, ফুলবালা

সুদূর জলে ডুবিছে রবি সোনার লেখা লিখি,
সাঁঝের আলো জলেতে শুয়ে করিছে ঝিকিমিকি।
সুধীর স্রোতে তরণীগুলি যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায়, ভাসিয়া যায়, কত না নরনারী।

—প্রভাতসংগীত, চেয়ে থাকা

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগিয়ে দিল গান।
পুরব মেঘে কনকমুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি,
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।

—প্রভাতসংগীত, সাধ

বলা প্রয়োজন যে, যে-সব কবিতা থেকে এই দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত হল তাদের কোথায় যুক্তাক্ষরের লেশমাত্রও নেই। এতে বিস্ময়ের কারণ নেই; কেননা 'মানসী'র পূর্বে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করার রীতি উদ্ভাবিত হয়নি এবং পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দে যৌগিক রীতিতে সংশ্লিষ্ট ধ্বনি অত্যন্ত খারাপ শোনায়। তাই এ-সব স্থলে শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি তথা যুক্তাক্ষর সযত্নে বর্জিত হয়েছে।

'কড়ি ও কোমল'এর কয়েকটি কবিতায়ও পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ওই কবিতাগুলি ছড়ার আদর্শে রচিত হয়েছে বলে ছড়ার মতোই এগুলিতেও পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দ ও স্বরবৃত্ত ছন্দ মিশে গিয়েছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নিশি-দিশি দাঁড়িয়ে আছে মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট ?···
তোমার মাঝে হৃদয় তারি বেঁধেছিল যে নীড়,
ডালপালায় সাধগুলি তার কত করেছে ভিড়।··

জলের উপর রোদ পড়েছে সোনামাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস, দুটি হাঁসের ছায়া।
—কড়ি ও কোমল, পুরানো বট

হাতটি তুলে চুড়ি দু-গাছি দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে নোলক দোলে নাকে।
—কড়ি ও কোমল, হাসিরাশি

এ-রকম ছড়াসুলভ বিভিন্ন ছন্দোরীতির মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের রচনায় দেখা যায় না। বস্তুত 'কড়ি ও কোমল'এর পরে তিনি আর কখনও ছড়ার লৌকিক আদর্শে কবিতা রচনা করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। পূর্বেই বলেছি ছড়ার ছন্দকে তিনি বহুল পরিমাণেই কাজে লাগিয়েছেন; কিন্তু ওই ছন্দকে তেমনি বহুল পরিমাণেই তিনি সংস্কারও করেছেন। আর, এই সংস্কারের ফলে বিভিন্ন ছন্দোরীতির মিশ্রণ অতি সযত্নে বর্জিত হয়েছে। যা হোক, 'মানসী'র যুগে মাত্রাবৃত্তপদ্ধতি উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের হাতে এমন অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করেছে যে, তার পর থেকে ও-ছন্দটি শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, বাংলার কবিসমাজেরই একটি প্রিয় ছন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত এটি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান এবং এ ছন্দ উদ্ভাবনের সমস্ত কৃতিত্বটুকু একা তাঁর প্রাপ্য। এবার এই পঞ্চমাত্র-পর্বিক ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

বরং থাকো মৌন হয়ে
সসংকোচ লাজে।
অত্যাচারে মত্তপারা
কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহ মাঝে?

অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি
বজ্রসম বাজে

—মানসী, দুরন্ত আশা

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে!
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে!
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে,
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

—কল্পনা, মদনভস্মের পর

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয়গিরিশিখর পানে
অস্তমহাসাগরতট হতে
নবজীবনযাত্রাকালে
সেখান হতে লেগেছে ভালে
আশিসখানি করুণ আলো-স্রোতে।

প্রথম সেই প্রভাতদিনে
পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে
কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি?
চিররাতের তোরণ থেকে
বিদায়বাণী গেলেম রেখে
নানা রঙের বাষ্পলিপি ভরি।

—বীথিকা, প্রণতি

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রত্নরীতির পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের কোনো কবিতা পড়েছি বলে মনে হচ্ছে না। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের রচনা থেকে প্রত্নরীতির পঞ্চমাত্র-পর্বিক ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

অনিল অতি বহিল মৃদু ঝরিল সিত কৌমুদী,
বিগত রবি-তাপ যত সাঁঝে।
স্নিগ্ধকম পরশ লভি আজি সুখ-অম্বুধি
উচ্ছ্বসিত শান্ত মন-মাঝে।

—ফুলশর, নিদাঘে

১৭

মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সবশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে **ষণ্মাত্রক পর্ব** (Hexamoric foot)। কেননা ওটি হচ্ছে বাংলা গীতিকবিতার সর্বপ্রধান বাহন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দে যত বেশি সংখ্যক ও যত বিচিত্র রকমের গীতিকবিতা রচিত হয়েছে, তেমন বোধ করি আর কোনো ছন্দেই হয়নি। গীতগোবিন্দে এ ছন্দ নেই; বস্তুত সংস্কৃত সাহিত্যেই এ ছন্দের অনুরূপ কোনো ছন্দ আছে বলে মনে হয় না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

ঈষৎ-হসিত বয়ানচন্দ
তরুণীনয়ন নয়নকন্দ
বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলী,
ত্রিভুবনমনোমোহিনী।

—গোবিন্দদাস, পদাবলী, গোষ্ঠবিহার

কিন্তু প্রাচীন কবিরা কেউ এ-ছন্দের যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেননি এবং এ-ছন্দের প্রকৃত বাংলা আকৃতি কি হবে তাও নিঃসংশয়ে স্থির করতে পারেননি। অনেক স্থলেই তাঁরা যুক্তবর্ণের বাহুল্য এবং সংস্কৃত রীতিতে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তা ছাড়া, তৎকালীন সাহিত্যে এ-ছন্দের

প্রয়োগদৃষ্টান্তও অত্যন্ত বিরল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এ-ছন্দের স্বরূপ ও মর্যাদা উপলব্ধি করেন এবং তিনি একে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা ছন্দ-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করেছেন। ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দ যে বাংলা সাহিত্যের কত বড়ো সম্পদ্ তা সাহিত্যানুরাগী মাত্রই জানেন। রবীন্দ্রনাথ যদি এ-ছন্দের প্রবর্তন না করতেন তা হলে বাংলা কাব্যজগতের একটি বৃহৎ অংশই অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। বর্তমানে বাংলা গীতিকবিতা, গাথা প্রভৃতি বহু ধরনের অজস্র কবিতারই বাহন এই ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দ। 'মানসী'র যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থভাবে এ-ছন্দের প্রবর্তন হয়। উক্ত গ্রন্থের 'ভুলভাঙা'শীর্ষক কবিতাটিই বাংলার প্রথম খাঁটি ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দের কবিতা। চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কবিতাটি থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু 'মানসী'র পূর্বেও 'শৈশবসংগীত' এবং 'কড়ি ও কোমল'এর সময়েই এ-ছন্দের প্রথম পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল। সে-কথাও যথাস্থানে দৃষ্টান্তযোগে আলোচিত হয়েছে। এবার 'মানসী'র পরবর্তী যুগে এই ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দেব রূপবিবর্তনেব দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত কবছি।—

জগতেব মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।···
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দবাতাসে,
মধুব নৃত্যে নিখিলচিত্ত বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।

—চিত্রা, চিত্রা

এ নহে মুখর বনমর্মর-গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম-রঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।

কোথা রে সে তীর ফুলপল্লব-পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'বো না পাখা ॥
—কল্পনা, দুঃসময়

এবার প্রত্নরীতির ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দের দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।—

পিনহ ঝটিত কুসুমহার, পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি, সিন্দূর দেকে সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ, মিলনগীত গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীররাব কুঞ্জগগন ছাও রে।
—ভানুসিংহের পদাবলী, ৫

জনগণপথ তব জয়রথ-চক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই ?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিনশীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
—গীতবিতান, দ্বিতীয় সং, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৫৬

১৮

ষণ্মাত্রক পর্বের মতো **সপ্তমাত্রক পর্ব**ও (Heptamoric foot) জয়দেবের গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত হয়নি। বস্তুত সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যেই সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত নেই বললেই হয়। আমি একটিমাত্র সংস্কৃত রচনায় ও-ছন্দের

আভাস পেয়েছি ; সেটি হচ্ছে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ। একটু নমুনা দেখাচ্ছি।—

যদা শ্রৌষং। দেবরাজং। প্রবৃষ্টং
শরৈর্দিব্যৈর্বারিতং চার্জুনেন।
অগ্নিং তদা তর্পিতং খাণ্ডবে চ
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যদাশ্রৌষং সংকৃতাং মৎস্যরাজ্ঞা
সুতাং দত্তামুত্তরামর্জুনায়।
তাং চার্জুনঃ প্রত্যগৃহ্নাং সুতার্থে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

—আদিপর্ব, ১ম অধ্যায়, ১৫৩, ১৭৪

বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্তের প্রতিপংক্তিতে পর্ব আছে তিনটি করে ; প্রথম দুটি সপ্তমাত্র এবং তৃতীয়টি অপূর্ণ, পঞ্চমাত্র। ছন্দ বজায় রেখে এই শ্লোকদুটিকে এভাবে বাংলায় তর্জমা করা যেতে পারে।—

যখন শুনিলাম। ইন্দ্রদেবতার। বৃষ্টিপাত
অর্জুনের খর দিব্যশরজালে বারিত হয়,
খাণ্ডবাশনেতে অগ্নিদেবও করে তৃপ্তিলাভ,
তখনি বুঝিলাম বিজয়-আশা নাই, হে সঞ্জয়।

যখন শুনিলাম সুকৃতা সুতা তার উত্তরায়
মৎস্যরাজা দেছে তৃতীয় পাণ্ডবে সুপরিণয়,
পার্থ হরষিত চিত্তে তারে লাভ করেছে, হায় !
তখনি বুঝিলাম বিজয়-আশা নাই, হে সঞ্জয়।

বলা প্রয়োজন যে, ধৃতরাষ্ট্রবিলাপের ছন্দের আদর্শ স্পষ্টতই সপ্তমাত্রক পর্ব বটে, কিন্তু ওই আদর্শ বহু স্থলেই অব্যাহত থাকেনি। এই রচনাটি ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যে অন্য কোথাও ও-ছন্দের ব্যবহার হয়েছে কি না আমার জানা নেই

প্রাকৃতে সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু তা-ও খুব বিরল। প্রাকৃত ছন্দ-শাস্ত্রমতে একটিমাত্র ছন্দে উক্তপ্রকার পর্বের প্রয়োগ দেখা যায়। ছন্দটির নাম হচ্ছে হরিগীতা। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গঅ গঅহি ঢুক্কিঅ | তরণি লুক্কিঅ | তুরঅ তুরঅহি | জুজ্ঝিআ।
রহ রহহি মীলিঅ | ধরণি পীলিঅ | অপ্পপর ণহি | বুজ্ঝিআ।
বল মিলিঅ আইঅ | পত্তি জাইউ | কম্প গিরিবর | সীহরা।
উচ্ ছলই সাঅর | দীণ কাঅর | বইর বঢ্ঢিঅ | দীহরা॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গলম্, ১।১৯৩

এই 'হরিগীতা' ছন্দটির প্রতিপংক্তিব প্রথমে আছে একটি করে দ্বিমাত্রক অতিপর্ব; তার পরে আছে তিনটি সপ্তমাত্রক পর্ব এবং একটি পাঁচ মাত্রার অপূর্ণপর্ব। ছন্দ বজায় রেখে এই প্রাকৃত শ্লোকটির একটি বাংলা তর্জমা কবে দিলাম।—

গজ লড়িছে গজ সাথে, | তুরগ তুরগেরে |
রথীরা প্রতিরথে | আক্রমিছে,
ঢাকি সূর্যে ধূলিজালে পীড়িছে ধরণীরে,
আত্মপরবোধ হল যে মিছে।
সেনা মিলিছে সেনাসাথে ধাবিত অরি-পিছে,
কাঁপিছে গিরিবর-শিখর যেন!
আর সাগর উথলিছে! ভীরুরা ভয়ে মরে,
—দীর্ঘ রণ ঐ চলিছে হেন॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও সপ্তমাত্রপবিক ছন্দের কিছুকিছু দৃষ্টান্ত আছে। এখানে দুয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল।—

নন্দনন্দনচন্দ চন্দনগন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দি' সিন্ধুর ভঙ্গ॥···
কঞ্জলোচন কলুষমোচন শ্রবণরোচন ভাষ।
অমলকোমলচরণকিশলয়নিলয় গোবিন্দদাস॥

কুটিল কুন্তল কুসুমকাঁচলি কান্তি কুবলয়-ভাস।
কুঞ্চিতাধর কুমুদকৌমুদী কুন্দকৈরব হাস॥
—গোবিন্দদাস, পদাবলী, গৌরলীলা

কমলপরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত-রাজা আনি ছয় রাগিণীরাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে।
কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন,
মদন দিল গুণ ধনুকহুলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন,
মধুমুদিত-মন ভাবত ভুলে।
—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

প্রথম দুটি দৃষ্টান্ত প্রত্নপদ্ধতিতে রচিত; বাংলার উচ্চারণরীতি এখানে পীড়িত হয়েছে এবং দুটি জায়গায় ('গোবিন্দদাস', 'কৌমুদী') ছন্দে ত্রুটি ঘটেছে। বস্তুত মধ্যযুগের প্রত্নরীতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এ-রকম বহু ত্রুটি দেখা যায়। এখানে বেছে বেছে যথাসম্ভব নির্দোষ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতে বাংলার উচ্চারণরীতি বজায় আছে; কিন্তু ছন্দ নিখুঁত নয় এবং বিশেষভাবে একটি শব্দের ('বসন্ত') দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এ-ছন্দটি যৌগিক রীতিতেই অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যার হিসাবেই রচিত হয়েছে, মাত্রাবৃত্ত রীতি অর্থাৎ শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণরীতি স্বীকৃত হয়নি। অথচ পূর্বেই বলেছি অসমমাত্রার ছন্দে যৌগিক রীতি চলে না, চালালে শুনতে ভাল হয় না। উপরের তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতে যুক্তাক্ষর তথা সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির বিরলতার দ্বারাও ওই কথা প্রমাণিত হয়। ভারতচন্দ্রের পর আর কেউ সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন কি না জানি না। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এ-ছন্দকে নিখুঁত এবং খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে

াহিত্যে প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের রচনাতেহ এ-ছন্দ ্যবহারের নিদর্শন পাই।—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি !
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখাসখী বসিয়া চোখোচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি।

—প্রভাতসংগীত, প্রভাত-উৎসব

'প্রভাতসংগীত'এর এই পংক্তিগুলি এ-ছন্দের একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। কিন্তু তখনও রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত রীতি প্রবর্তন করেননি; তাই তিনি ধ্বনিসংগতি রাখার জন্য এই কবিতটিতে সযত্নে শব্দমধ্যস্থ যুগ্মধ্বনি পরিহার করে চলেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এ-ছন্দে শব্দমধ্যস্থ বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি ব্যবহারের দ্বারা তিনি অতি সুন্দর মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন।

মন্ত্রে সে যে পূত, রাখীর রাঙা সুতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে;
আজ কি আছে সেটি হাতে ?
বিদায়বেলা এল মেঘের মতো ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দু'হাত গেল কেঁপে,
সে দিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
ভরে যে এল জল-ধারা।
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমার ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথ-হারা।

—উৎসর্গ, ৪৩

জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনী
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
—রচনাবলী (১৫), সংযোজন, জীবনমরণ

দুঃখের বিষয়, বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে এই সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। অন্যান্য কবিদের রচনাতেও খুব সুলভ নয়।

যা হোক, প্রত্ন উচ্চারণরীতিতে রচিত এ-ছন্দের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। বলা হয়েছে যে, প্রত্নরীতির ছন্দকে তিনি গীতিরচনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তাই গীতিরচনা থেকেই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

জাগ জাগ রে, জাগ সংগীত,
চিত্ত-অম্বর কর তরঙ্গিত,
নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।···
পূর্ণ কর রে গগন-অঙ্গন তার বন্দন-গানে॥
-গীতবিতান, দ্বিতীয় সং, প্রথম খণ্ড, পৃ ১০

প্রথম লাইনে প্রত্ন উচ্চারণরীতি সমভাবে রক্ষিত হয়নি। ছন্দের প্রয়োজনে 'জাগ রে' কথার জা অথবা রে এবং 'সংগীত' শব্দের গী ধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণ করা আবশ্যক। নীচের দৃষ্টান্তটি প্রত্ন উচ্চারণ সর্বত্র বজায় আছে।—

মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে!···
সকল যোগী সকল ত্যাগী
এস দুঃসহ দুঃখভাগী,
এস দুর্জয়শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে!
এস জ্ঞানী, এস কর্মী, নাশ' ভারত-লাজ হে!

এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয়পুণ্যসৌরভ,
এস তেজঃসূর্যউজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর-মাঝ হে!
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ' হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
জয় জয় নরোত্তম পুরুষসত্তম জয় তপস্বী-রাজ হে।
—গীতবিতান, দ্বিতীয় সং, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৫৫

১৯

মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দে বিভিন্ন প্রকারের পর্ব গঠন করেই রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হননি। নানা আয়তনের পর্বের একত্র সমাবেশের দ্বারা তিনি ছন্দে বহু বৈচিত্র্যসৃষ্টিও করেছেন। উদাহরণ দিচ্ছি।—

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহতপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত;
অটবী বায়ুবেশে উঠিত সে উছাসি'।
কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে পড়িত রে নিশাসি'।
—মানসী, বিরহানন্দ

এ-স্থলে বলা প্রয়োজন যে, অগ্রজ কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর কতখানি পড়েছে, তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ আলোচনাপ্রসঙ্গে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের ছন্দের পর্বসমাবেশবৈচিত্র্যের বিষয় আলোচনা করে দেখা মন্দ নয়। কিন্তু এ-স্থলে সে-কার্যে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তথাপি শুধু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির সঙ্গে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিকে মিলিয়ে দেখলেই এ-কথার যাথার্থ্য কতকটা বোঝা যাবে।—

দু-সখী এইরূপে চুপে চুপে কহিল কত।
শোভা, কবির সনে আলাপনে হইল রত॥
কখনো চড়ে গিরি, ধীরি ধীরি ; কখনো সবে
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে নবোৎসবে॥

—স্বপ্নপ্রয়াণ, দ্বিতীয় সর্গ, ১২৫-২৬

স্বপ্নপ্রয়াণ'এর ছন্দ সম্বন্ধে কোনো কোনো বিষয় অন্যত্র[১] আলোচনা করেছি। এ-স্থলে সে বিষয় উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের পর্বসমাবেশবৈচিত্র্যের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি ;
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি।...
কোলের সখী তানপুরার 'পরে রাখিল লজ্জিত মাথা,
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্যক্রন্দনগাথা।

—সোনার তরী, গানভঙ্গ

'কথা' কাব্যের 'মস্তকবিক্রয়' কবিতাটিও এই ছন্দেই রচিত ; শুধু একটি করে অতিরিক্ত মিলের জন্যেই অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়েছে। যথা—

কোশলনৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা ;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতা মাতা।...
কহিলা, "সেনাপতি, ধর কৃপাণ,
সৈন্য কর সব জড়ো।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান্,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো।"

[১] ভারতবর্ষ, ১৩৪১, অগ্রহায়ণ

বিভিন্ন আয়তনের পর্বসমাবেশবৈচিত্র্যের আরেক রকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

জগৎস্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই!
চলেছে যেথা রবিশশী চল রে সেথা যাই।
কোথায় চলে কে জানে তা, কোথায় যাবে শেষে!
জগৎস্রোতে বহে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে!
অনাদিকাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।

—প্রভাতসংগীত, স্রো

এখানে পাঁচ ও চার মাত্রার একত্র সমাবেশ ঘটে ছন্দের স্রোত-ধারায় একটু নূত
ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। এ-রকম বৈচিত্র্যের আরেকটি নমুনা দেওয়া যাক।

জন্ম মোর বহি যবে খেয়ার তরী এল ভবে
যে-আমি এল সে-তরীখানি বেয়ে,
ভাবিয়াছিনু বারে বারে প্রথম হতে জানি তারে,
পরিচিত সে পুরানো সব চেয়ে।
হঠাৎ যবে হেন-কালে আবেশকুহেলিকা জালে
অরুণরেখা ছিদ্র দেয় আনি,
আমার নব পরিচয় চমকি উঠে মনোময়,
নূতন সে যে নূতন তারে জানি।…
আনন্দিত মন আজি, কী সংগীতে উঠে বাজি,
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ সব ক্ষতি তুচ্ছ আজি হল অতি
দুঃখসুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

—বীথিকা, নবপরিচয়

এ-স্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা নানা আয়তনের মাত্রাবৃত্ত পর্বে
বিষয় আলোচনা করেছি। দেখেছি উক্তপ্রকার পর্বের আয়তন চার মাত্রা থেকে

সাত মাত্রা পর্যন্ত হতে পারে। আট মাত্রার পর্ব স্বীকার করার কোনো 'নীয়তা নেই; কেননা চতুর্মাত্রক পর্বকে দ্বিগুণিত করলেই আট মাত্রার বিভাগ পাওয়া যায়। কিন্তু কখনো কখনো এমন ঘটে যে, পর্ববিভাজক যতি লুপ্ত হবার ফলে দুটি চার মাত্রার পর্ব পরস্পর জুড়ে গিয়ে একটি আট মাত্রার বিভাগ ৎপন্ন হয়। যথা—

নীলসিন্ধুজল | ধৌত চ : রণ-তল
অনিল-বি : কম্পিত | শ্যামল অঞ্চল।

—কল্পনা, ভারতলক্ষ্মী

আয়ুর ত : বিল মোর | কুষ্ঠির | হিসাবে
অতি অল্ : প দিনেই | শূন্যেতে | মিশাবে।…
শুষ্ক উৎস খুঁজে | মরুমাটি | খোঁড়াটা,
তেলহীন | দীপ লাগি | দেশালাই | পোড়াটা…

—প্রহাসিনী, আধুনিকা

এ-দুটোই হচ্ছে চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দ; তবে প্রথমটা প্রত্নরীতিতে ও দ্বিতয়টা নব্যরীতিতে রচিত। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, দুটি স্থলে ('নীলসিন্ধুজল' এবং 'শুষ্ক উৎস খুঁজে') পর্বযতিস্থাপনের উপায়ই নেই এবং অন্য চারটি স্থলেও (বিন্দুদণ্ডচিহ্নিত) আবৃত্তিকালে পর্বযতি অনুভূত হয় না বললেই চলে। ধরে নিতে হবে ও-সব স্থলে পর্বযতির লোপ ঘটেছে। ও-রকম যতিলোপের ফলে যে দীর্ঘ মাত্রাবিভাগের উৎপত্তি হয় তাকে বলি 'যুক্তপর্ব'। চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দে অনেক সময় এ-রকম যুক্তপর্বের চাল (movement) দেখা যায়। কিন্তু আগাগোড়া যুক্তপর্ব ব্যবহারের রীতি দেখা যায় না। অতএব আট মাত্রার পর্ব স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই।

নয় মাত্রা বা দশ মাত্রার পর্ব স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাও দেখিনে। ছয় মাত্রা বা চার মাত্রার পর্ব ও পর্বাংশের যোগেই ও-সমস্ত বৃহৎ মাত্রাবিভাগের উৎপত্তি হয়, এ-কথা স্বীকার করে নেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। এ-স্থলে ওই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন হতে পারে, সাত মাত্রার পর্ব মানারই কি প্রয়োজন আছে? তা আছে আগের পরিচ্ছেদে সাত মাত্রার পর্বের যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক তিন মাত্রার পরে একটি করে উপযতি রয়েছে এবং তারপর চার মাত্রার পরে রয়েছে পর্বযতি। যেমন—

জীবনে : যত পূজা | হল না : সারা,
জানি হে · জানি তাও | হয়নি : হারা।
যে-ফুল : না ফুটিতে | ঝরিল : ধরণীতে,
যে-নদী : মরুপথে | হারাল : ধারা,
জানি হে : জানি তাও | হয়নি : হারা।

—গীতাঞ্জলি, অসমাপ্ত

তিন মাত্রার পর্ব হয় না। কেননা, তিন মাত্রার বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াতে পারে না। কাজেই এই তিন মাত্রার বিভাগকে বলতে পারি 'উপপর্ব' এবং তৎপরবর্তী যতিটিকে বলতে পারি 'উপযতি'। যা হোক, তিন-চার মাত্রার যোগে উৎপন্ন ছন্দোবিভাগকে যুক্তপর্বও বলা যায় না; কারণ তিন মাত্রার উপপর্বের পরবর্তী ছেদটি স্পষ্ট অনুভূত হয়। আর, ওই উপপর্বকে পূর্ণপর্বের মর্যাদাও দেওয়া যায় না। সুতরাং সাত মাত্রার বিভাগকে পর্ব বলেই স্বীকার করতে হয়। বরং এ-রকম অসমান মাত্রাবিভাগের যোগে উৎপন্ন পর্বকে 'মিশ্রপর্ব' বলে স্বীকার করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ-রকম অযুগ্ম ও যুগ্ম-সংখ্যক মাত্রার যোগে উৎপন্ন পর্বের ছন্দকে 'বিষম' মাত্রার ছন্দ বলে অভিহিত করেছেন।

পাঁচ মাত্রার পর্বকেও একই কারণে 'মিশ্র' বা 'বিষম' পর্ব বলে অভিহিত করা যায়। যেমন—

ঘুমের : দেশে | ভাঙিল : ঘুম | উঠিল : কল | স্বর।
গাছের : শাখে | জাগিল : পাখী | কুসুমে : মধু | কর।

১ ছন্দ, পৃ ১৫-১৭

অশ্ব : শালে | জাগিল : ঘোড়া | হস্তী : শালে | হাতি।
মল্ল : শালে | মল্ল : জাগি | ফুলায় : পুন | ছাতি।

—সোনার তরী, স্বপ্নোত্থিতা

এখানে প্রত্যেক পর্বের উপপর্ব দুটি অসমান। সুতরাং পাঁচ মাত্রার পর্বকেও মিশ্র বা বিষম বলে স্বীকার করা যায়। কিন্তু সাত-পাঁচ বা পাঁচ-চার মাত্রা-সমাবেশকে মিশ্র পর্ব বলে গণ্য করা যায় না; ওগুলিকে বিভিন্ন আয়তনের পর্ব-সমাবেশগত বৈচিত্র্য বলেই গ্রহণ করতে হবে।

২০

এবার **স্বরবৃত্তের** কথা। স্বরবৃত্ত রীতির ছন্দে রবীন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে চতুঃস্বর পর্ব (Tetrasyllabic foot)। যথা—

মনে পড়ে | ছেলেবেলায় | যে-বই পেতুম | হাতে,
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে।···
মনেব উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি
কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।

—আকাশপ্রদীপ, যাত্রাপথ

এখানে প্রতিপর্বেই চারটি করে ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্ আছে। এটাই হচ্ছে স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ রীতি (পৃ ২৮) এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই এ-ছন্দের এই সাধারণ নিয়মটাই লক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি দ্বিস্বর বা ত্রিস্বর পর্বের ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেননি। সুতরাং এ-কথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বগঠনে বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা করেননি। তবু তাঁর রচনায় স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বগত দুটি বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রথমত, ত্রিস্বর ও

চতুস্বর পর্বের একত্র সমাবেশের দ্বারা ছন্দের গতিভঙ্গিতে যথেষ্ট অভিনবৎ এনেছেন। দৃষ্টান্ত—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ-জীবন পুণ্য কর দহনদানে॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে;
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে॥

—গীতালি, ১৮

এখানে প্রতিপংক্তির গোড়াতেই একটি করে তিন সিলেব্‌ল্‌এর পর্ব থাকাতে ছন্দের প্রবাহ এমন একটি অভিনব ভঙ্গিতে দুলে উঠেছে যে, শ্রোতার কান তাতে আপনিই খুশি হয়ে ওঠে। বলা প্রয়োজন যে, এ-ভঙ্গিটা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নয়; বাংলা লোকসাহিত্যেই এর প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

'আছে যার' মনের মানুষ আপন মনে
'সে কি আর' জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
'কাছে রয়' ডাকে তারে উচ্চ স্বরে কোন্ পাগেলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে থাকে ভোলা।

—ছন্দ, পৃ ৫

এখানে তিনটি স্থলে ত্রিস্বর পর্বের ব্যবহার হয়েছে। গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও এই ত্রিস্বরবৈচিত্র্যের নিদর্শন আছে। যথা—

হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ।
'কালসাপ কি' কোনো কালে
'দয়াতে' ভেকে পালে?
'টপাটপ' অম্‌নি করে গ্রাস॥

'বাঙালি' তোমার কেনা,
'এ-কথা' জানে কে না ?
'হয়েছে' চিরকেলে দাস ॥
'তুমি মা' কল্পতরু,
'আমরা সব' পোষা গরু,
'শিখিনি' শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল-বিচিলি ঘাস ॥

—নীলকর

এখানেও ত্রিস্বর ও চতুঃস্বর পর্বের একত্র সমাবেশজনিত বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট। বলা প্রয়োজন যে, ঈশ্বর গুপ্ত সাধারণ রচনায় স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেননি। এ কবিতাটি লৌকিক প্রয়োজনে রচিত বলেই তাতে লৌকিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যা হোক, রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, তিনি যে শুধু লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দটিকেই সুমার্জিত করে সাহিত্যের আসরে স্থান দিয়েছেন, তা নয়; তিনি লৌকিক ছন্দের ওই ত্রিস্বরপর্বযোগের বিচিত্র ভঙ্গিটির মাধুর্যও সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন এবং লোকসাহিত্যের তুচ্ছতা মোচন করে ও তাকে সুনিয়মিত করে বাংলা কাব্যের নূতন বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন।

এবার স্বরবৃত্ত ছন্দের দ্বিতীয় বৈচিত্র্যের বিষয় আলোচনা করা যাক; এ-বৈচিত্র্যটাও ত্রিস্বরপর্বঘটিত। আগে একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা বোঝানো সহজ হবে।

ইতিমধ্যে যোগীন দাদা 'হাৎরাশ জং'শনে
গেছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি দংশনে।…
দাদা ভাবলেন, 'সম্মানটা' নিতান্ত জমকালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তার দেখে চরের ঘনাল সন্দেহ,
এ মানুষটি 'রাজপুত্রই', নয় কভু আর কেহ।

'রাজলক্ষণ' এতগুলো একখানা এই গায়
ওরে বাস্‌রে, দেখেনি সে আর কোনো জায়গায়।

—ছড়ার ছবি, যোগীনদা

এ-ছন্দটিও চতুঃস্বরপর্বিক অর্থাৎ চার-চার সিলেব্‌ল্‌এর পর্বে বিভাজ্য। কিন্তু ও-রকম পর্ববিভাগ করতে গেলেই দেখা যাবে, 'হাংরাশ জং' প্রভৃতি চার স্থলে তিনটির বেশি সিলেব্‌ল্‌এর জায়গা হয়নি। এটা হচ্ছে চতুঃস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দের একটি সাধারণ বৈচিত্র্য। স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত প্রত্যেক কবিতাতেই এ-রকম বৈচিত্র্য কিছু না কিছু মিলবে। কিন্তু চতুঃস্বরের তুলনায় ও-রকম ত্রিস্বর পর্বের সংখ্যা খুবই কম থাকে। সুতরাং এগুলিকে ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হবে। যা হোক, এ-রকম ব্যতিক্রমের রীতিটিও রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের অর্থাৎ ছড়ার ছন্দ থেকেই নিয়েছেন। যথা—

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুম্ ঝুম্ পা ঝুম্ ঝুম্ সীতারামের খেলা॥

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

এ-দুটি অংশে ছড়ার ছন্দের প্রায় সব রকম বৈচিত্র্যই ধরা পড়েছে। প্রথমত, কয়েকটি পর্বে (যমুনাবতী, যমুনা যাবেন এবং শিবুঠাকুরের) রয়েছে পাঁচ সিলেব্‌ল্। এ-রকম ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ সযত্নে বর্জন করেছেন; তাঁর পরিণত বয়সে (ধরা যাক 'ক্ষণিকা'র সময় থেকে) রচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় কোথাও ও-রকম পাঁচ সিলেব্‌ল্‌এর পর্ব দেখা যায় না। দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে 'কুড়োতে' এবং 'না খেয়ে' এ-দুটি ত্রিস্বর পর্ব। উভয় পর্বেরই তিনটি ধ্বনি

অযুগ্ম। কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার উভয়ত্রই (কুড়ো- তে- - এবং না - - খেয়ে- এ-ভাবে) বেশ একটু স্বরের টান রেখে ছন্দের ধ্বনিসংগতি রক্ষা করতে হচ্ছে। ছড়াতে ও-রকম টান অশোভন না হলেও পঠিতব্য কবিতায় এতটা টানের ফাঁক রেখে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; ওতে কবিতার ভাব তথা পাঠকের উপর অনেকখানি অনাবশ্যক চাপ দেওয়া হয়। বস্তুত ছেলেভুলানো ছড়াতে ওই স্বর বা টানের যেটুকু প্রয়োজনীয়তা আছে, পরিণতভাবের কবিতা বা পরিণতবুদ্ধি পাঠকের পক্ষে তা নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এ-রকম ত্রিস্বরপর্বিক ব্যতিক্রমকেও সযত্নে পরিহার করেছেন। এমন কি, 'কাজিফুল'এর মতো যে-সমস্ত ত্রিস্বর পর্বে একটিমাত্র ধ্বনি যুগ্ম এবং দুটি অযুগ্ম, সে-রকম পর্বও রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায় না। উপরের ছড়াদুটির ছন্দে তৃতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে হাত ঝুম্ ঝুম্, পা ঝুম্ ঝুম্, তিন কন্যে এবং এক কন্যে, এই ক'টি পর্ব। এগুলিও তিন সিলেব্‌ল্‌এর পর; কিন্তু এগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলিতে অন্তত দুটি করে যুগ্মধ্বনি আছে এবং সে-জন্যেই কোথাও স্বরের বিশেষ টান রাখতে হয় না। তাই এ-রকম ব্যতিক্রম অনায়াসেই পঠিতব্য কবিতাতেও চালিয়ে দেওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। উপরে 'যোগীনদা'নামক কবিতা থেকে উদ্ধৃত অংশটিতে যে-চারটি ত্রিস্বরপর্বিক ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে সব কয়টিই এই ধরনের।

এ-স্থলেই আরও একটি কথা বলা দরকার। 'হাত ঝুম্ ঝুম্' পর্বটিতে কোথাও টান দেবার প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু 'পা- ঝুম্ ঝুম্' পর্বটিতে 'পা' ধ্বনিটির পরে একটু টান লাগে; আর, ওই টানের দ্বারাই এ-ধ্বনিটির অযুগ্মত্বের অভাব পূর্ণ হয়। তেমনি, 'তিন কন্যে-' ও এক 'এক কন্যে-' এই পর্বদুটিতেও শেষ অযুগ্মধ্বনিটির পরে সামান্য একটু টান লাগে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, তিনটি যুগ্মধ্বনি স্বরবৃত্ত ছন্দের পুরো মাপ। আর, এক-একটি যুগ্মধ্বনির ওজন যদি ধরে নেওয়া যায় দুই মাত্রা, তা হলে বলতে হয় যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে পর্বের মাত্রিক আয়তন হচ্ছে ছয় মাত্রা। স্বরবৃত্তপর্বের এই ষাণ্মাত্রিক প্রকৃতির কথাটা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কেননা, রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ছন্দের এই

ষণ্মাত্রপর্বিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ও-ছন্দ রচনা করেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথমে ও-ছন্দের ষণ্মাত্রপর্বিকতার কথা বিশদভাবে বুঝিয়েছেন।[১] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত স্বরবৃত্ত অর্থাৎ লৌকিক ছন্দের স্বরূপ বুঝতে হলে ও-ছন্দের ষণ্মাত্রপর্বিকতার বিষয়ে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বে আপাত দৃষ্টিতে ছয় মাত্রা লক্ষিত হয় না; কিন্তু কানকে সজাগ রেখে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে তা ধরা পড়ে। যেমন—

ভারতভূমির | সব ঠিকানাই | ভুলি- যদি- | দেবে,
যোগীন দাদার | ভূগোলগোলা- | গল্প মনে- | রইবে।

—ছড়ার ছবি, যোগীনদা

যথাযথভাবে আবৃত্তি করে গেলেই টের পাওয়া যাবে যে, যে-সব পর্বে ছয় মাত্রার স্থান প্রত্যক্ষভাবে ভরতি করা হয়নি সে-সব স্থলে একটি বা দুটি মাত্রার ফাঁক আমাদের স্বাভাবিক আবৃত্তির ঝোঁকে অনায়াসেই ভরতি হয়ে যায়। ও-সব স্থলে স্বভাবতই একটুখানি স্বরের টান এসে যায়; কিন্তু সে টান এত সামান্য যে বিশেষভাবে লক্ষ্য না করলে টের পাওয়া যায় না। এক পর্বে এক মাত্রার বেশি টান না থাকলেই সুশ্রাব্য হয়। কোনো কোনো স্থানে (যেমন, 'ভুলি- যদি-') দুই মাত্রার ফাঁকও থাকে। কিন্তু এ-রকম ডবল ফাঁক বেশি থাকলে ছন্দ দুর্বল হয়। ছড়ার ভঙ্গিতে কোনো পর্বে (কুড়ো- তে- - এভাবে) দু-মাত্রার বেশি ফাঁক রাখা হয় না; কিংবা এক সঙ্গেই দু-মাত্রার ফাঁক রাখা হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই লৌকিক ছন্দকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন, তা বোঝা অবশ্যই প্রয়োজন। তাই আবশ্যকবোধে ও-ছন্দের গঠন-প্রকৃতি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হল। এ-বিষয়ের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা ছন্দ-শাস্ত্রের এলাকাভুক্ত। এ-স্থলে তা অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক।

১ ছন্দ, পৃ ১৩৩-৩৪

২১

ওই লৌকিক বা স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল, তার সারমর্মটা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। প্রথমে দেখেছি ও-ছন্দের প্রতিপর্বে সাধারণত চারটি করে এবং কখনও কখনও তিনটি করে সিলেব্‌ল্ থাকে; তার পরে দেখেছি তার প্রতিপর্বের ধ্বনিপরিমাণগত আয়তন হচ্ছে ছয় মাত্রা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, এ-ছন্দের প্রতিপর্বের মাপ (অর্থাৎ ধ্বনিসংখ্যা) চারের এবং তার ওজন (অর্থাৎ মাত্রাপরিমাণ) ছয়ের[১]। বস্তুত ওই চার সিলেব্‌ল্‌এর সীমার মধ্যে ছয় মাত্রার ব্যবস্থা করতে হয় বলেই এ-ছন্দের ধ্বনিটা এমন তরঙ্গিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। কেননা, এ-ব্যবস্থার ফলে ওর প্রত্যেক পর্বে দুটি (অন্তত একটি) করে যুগ্মধ্বনি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং ওই যুগ্মধ্বনিই ছন্দের প্রবাহকে এমন উত্তাল করে তোলে। যদি ছয় মাত্রাই ছন্দের আসল কথা হত তা হলে অন্তত কোনো কোনো পর্বে ছয়টি অযুগ্ম-ধ্বনিস্থাপনে বাধা হত না। কিন্তু কার্যত ছয়টি কেন পাঁচটি সিলেব্‌ল্ও ও-ছন্দে স্বীকৃত হয় না। যেমন—

> চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
> আজকে আমি কোনো মতেই বলব নাকো সত্যকথা।

—ক্ষণিকা, অতিবাদ

যদি ছয় মাত্রাই ও-ছন্দের আসল কথা হয়, তবে 'আজকে আমি'র স্থলে 'আজিকে আমি তো' বসিয়ে দিলেও ক্ষতি হবার কথা নয়। কিন্তু কার্যত ও-রকম করলে দেখা যাবে, ছন্দ ওখানটাতেই হুঁচোট খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ-ছন্দে পাঁচ সিলেব্‌ল্ স্বীকার্য নয়; 'মুক্ত রেখে' এবং 'বলব নাকো'র স্থলে 'মুক্ত রাখিয়া' এবং 'বলিব নাকো' বসালেই এ-কথার সার্থকতা উপলব্ধি হবে। সুতরাং এ-ছন্দের পর্বে চার সিলেব্‌ল্ থাকা চাই। কিন্তু শুধু চার সিলেব্‌ল্

১ ছন্দবিতর্ক : পরিচয়, ১৩৩৯, শ্রাবণ

থাকলেও চলে না; চার সিলেব্‌ল্‌কে ভিত্তি করে ছয় মাত্রার ব্যবস্থা করলেই এ-ছন্দের স্বরূপ পাওয়া যায়। শুধু চার সিলেব্‌ল্‌ বজায় রেখে যদি লেখা যায়—

হৃদিখানি খোলা রেখে সাধুমতি গেল চলি,
আজি আমি কোনো মতে বলিব না সাধু বুলি।

তা হলে ছন্দটা একেবারেই নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়বে এবং মূল ছন্দের আসল রূপটাই তাতে মারা যাবে। এ-অবস্থায় এটিকে আর যে ছন্দই বলি না কেন, লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দ কিছুতেই বলা যাবে না। ঠিক এই কারণেই একে চার মাত্রার ছন্দ বলেও অভিহিত করা যায় না।

আজ আমি কোনো মতে বলব না সাধু বুলি

এখানে প্রতিপর্বে চার মাত্রা রয়েছে বটে, কিন্তু লৌকিক ছন্দের বৈশিষ্ট্যটিই এখানেই নেই।

সুতরাং এই লৌকিক বা স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রধান নিয়মগুলি হচ্ছে এই. (১) এর প্রতিপর্বে সাধারণত চার সিলেব্‌ল্‌ থাকা চাই। (২) ওই চার সিলেব্‌ল্‌কে আশ্রয় করে ছয় মাত্রা থাকা চাই; সুতরাং ওই চার সিলেব্‌ল্‌এর মধ্যে দুটি যুগ্মধ্বনি, কিংবা একটি যুগ্মধ্বনি ও একমাত্রার ফাঁক থাকা প্রয়োজন; কখনও কখনও ব্যতিক্রম হিসাবে চারটি অযুগ্মধ্বনি ও দু-মাত্রার ফাঁক থাকতে পারে; কিন্তু এটি সাধারণ বিধি নয়। (৩) কখনও কখনও এ-ছন্দের পর্বে তিনটি যুগ্মধ্বনি অথবা দুইটি যুগ্মধ্বনি ও একমাত্রার ফাঁক থাকে।

ফাঁক রাখার নিয়ম এই: (১) চার ধ্বনির পর্বে সাধারণত দ্বিতীয় কিংবা চতুর্থ এবং কখনও কখনও ওই উভয় ধ্বনির পরেই একমাত্রার ফাঁক থাকতে পারে। পূর্বে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে; আর বাড়িয়ে লাভ নেই। (২) তিন ধ্বনির পর্বে সাধারণত তৃতীয় এবং কখনও কখনও প্রথম ধ্বনির পরেও ফাঁক থাকতে পারে; প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনির পরে ফাঁক থাকার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল, পূর্বোদ্ধৃত ছড়াদুটির 'তিন কন্যে' এবং পা- ঝুম ঝুম' স্মরণীয়। রবীন্দ্ররচনা থেকে দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

তার পরে উঃ, বলি মা, শোন্,
সামনে এল প্রকাণ্ড বন,
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা-ছম্‌ছম্ করে।
—শিশুভোলানাথ, পথহারা

মা- বললে-, "কেন ঐ যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
নাই বা হল কুলীন।"...
বাপ বললে-, "থামো,
আরে আরে রামোঃ।"
—পলাতকা, নিষ্কৃতি

একদিন সে-ফাগুন মাসে মাকে এসে বলল,
গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।...
ডাকবে যখন টিয়ে
বরকর্তা- রবেন বসে কানে আঙুল দিয়ে।
—ছড়ার ছবি, ভজহরি

দামামা ঐ বাজে
দিনবদলের পালা এল ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়?
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত,
ভবিষ্যতের দূত।
—জন্মদিনে, ১৬

'নূতন অধ'ধ্যায় এবং 'নিষ্ঠুর অন্'ন্যায়, এই কথাদুটির পূর্বাংশ পরস্প
[illegible]।

এই আলোচনা থেকে দেখা গেল স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতিপর্বে চারের বেশি সিলেব্‌ল্ থাকে না ; অবস্থাবিশেষে তিন সিলেব্‌ল্ও থাকে। কিন্তু তার কম থাকে কি ? তার উত্তর এই যে, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় রেখে যদি দুটি ত্রিমাত্রক ধ্বনির একত্র সমাবেশ করা যায়, তা হলে তাও থাকতে পারে। যথা—

বাইরে কেবল | জলের শব্দ | ঝুপ ঝুপ | ঝুপ,
দস্যি ছেলে | গল্প শোনে | একেবারে | চুপ।

—কড়ি ও কোমল, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

সে কহিল | ভাই,
নাই, নাই, | নাই গো আমার | কারেও কাজ | নাই

—ক্ষণিকা, কূলে

"শোনো অমিকাকা,
গাড়ির ভাঙা চাকা
সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এঁটে ইস্ক্রুপ !"
অমি বললে | কানে কানে, | "চুপ চুপ | চুপ !"

—পরিশেষ, নূতন শ্রোতা

ঝুপ ঝুপ, নাই নাই এবং চুপ চুপ, এই তিনটি পর্বে দুটি করে ধ্বনি আছে এবং প্রত্যেকটি ধ্বনি সম্প্রসারিত হয়ে তিন মাত্রার স্থান দখল করেছে। বলা বাহুল্য এ-রকম দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। ধ্বনিসম্প্রসারণের ন্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দে ধ্বনি-সংকোচনের দৃষ্টান্তও আছে। যথা—

'গঙ্গাপ্রাপ্তির' | আশা করে | গঙ্গাযাত্রা | করেছিলেম।
তোমাদের না | বলে কয়ে | আস্তে আস্তে | সরেছিলেম॥

—কড়ি ও কোমল, পত্র

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না আমার পক্ষে মুখরোচক,
তোমরা যদি পুনর্জন্মে 'হও পুনর্বার' সমালোচক…

—ক্ষণিকা, কর্মফল

'শেষ বসন্তের' সন্ধ্যা হাওয়া শস্যশূন্য মাঠে
উঠল হাহা করি।

—ক্ষণিকা, পরামর্শ

স্বরবৃত্ত ছন্দের চতুঃস্বরপর্বে সাধারণত দুটি অযুগ্ম ও দুটি যুগ্মধ্বনি থাকে; তাতেই প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা পাওয়া যায়। ও-রকম পর্বে দুটির বেশি যুগ্মধ্বনি থাকে না, কেননা তাতে মাত্রাধিক্য ঘটে। কিন্তু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায় গঙ্গাপ্রাপ্তির, হও পুনর্বার এবং শেষ বসন্তের, এই তিনটি চতুঃস্বরপর্বে তিনটি করে যুগ্মধ্বনি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সাধারণ হিসাবে এসব স্থলে সাত মাত্রা পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমরা এসব স্থলে স্বভাবতই একটু দ্রুত আবৃত্তি করে অন্যান্য ষণ্মাত্রক পর্বগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে থাকি। অর্থাৎ এসব স্থলে কিছু পরিমাণে মাত্রাসংকোচ ঘটিয়ে এ পর্বগুলিকেও অন্যান্য পর্বের মত ছয় মাত্রার সীমার মধ্যেই ধরাতে চেষ্টা করি। সুতরাং এসব পর্বে এক মাত্রা পরিমাণ ধ্বনির সংকোচ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের মতে এ-রকম মাত্রা-সংকোচ ঘটানো অবাঞ্ছনীয় বলেই বোধ হয় এবং তাঁর রচনায় এ-রকম দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। আর, পরবর্তী কালের রচনায় স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বে দুটির বেশি যুগ্মধ্বনি স্থাপনের দৃষ্টান্ত বোধ হয় সম্পূর্ণরূপেই বর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ যে-সব কবি এ-ছন্দকে চার সিলেব্‌ল্‌এর ছন্দ বলেই গণ্য করে থাকেন, তাঁদের রচনায় ও-রকম দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত বেশি পাওয়া যায়। যথা—

আসছে নানাবিধ শকট 'অল্পবিস্তর' অন্ধকারে; ···
অনেক বাক্য-হানাহানি, 'গর্জনবর্ষণ' অনেকখানি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল : আলেখ্য, সপ্তম চিত্র

সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি?
রোগের ঋণের শেষ রাখ না, 'কলঙ্কের শেষ' রাখবে কি?

—সতেন্দ্রনাথ : অভ্র-আবীর, মৃত্যুস্বয়ম্বর

অল্পবিস্তর, গর্জনবর্ষণ এবং কলঙ্কের শেষ, এই তিনটি পর্ব লক্ষিতব্য। রবীন্দ্রনাথ

এ-রকম পর্ব যথাসম্ভব বর্জন করেই স্বরবৃত্ত ছন্দ রচনা করেছেন, রবীন্দ্র-ছন্দ-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে এটি একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

২২

আর একটি কথা বললেই স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রসঙ্গ সমাপ্ত হয়। পূর্বে বলেছি, এ-ছন্দের প্রতিপর্বে একমাত্রা এবং কখনও কখনও দু-মাত্রার ফাঁক রাখা যায়। রবীন্দ্রনাথ অন্তত দুটি কবিতায় ওই ফাঁক না রেখে (অর্থাৎ যুগ্মধ্বনির সাহায্যে ফাঁক পূরণ করে) স্বরবৃত্ত ছন্দ রচনার পরীক্ষা করেছেন। ওই দুটি কবিতাই 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'বিজয়ী'। এ-কবিতাটি থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করা যাক।

তখন তারা দৃপ্তবেগের বিজয়রথে
ছুটেছিল বীর মত্ত অধীর, রক্তধূলির পথ-বিপথে।
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক যত
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্তবায়ে ;
বিহঙ্গগান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষছায়ে।

প্রথম পর্বটিতে এক মাত্রার একটি ফাঁক আছে ; আর কোনো পর্বেই ফাঁক রাখা হয়নি। বস্তুত সমগ্র 'বিজয়ী' কবিতাটিতে অল্প কয়েকটি জায়গায় ফাঁক রয়েছে, আর সর্বত্রই যুগ্মধ্বনির বাহুল্যে মাত্রাপূরণ হয়েছে। ওই মাত্রাপূরণের ফলে রচনাটির ধ্বনিতরঙ্গে কেমন একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে, তাই লক্ষ্য করার যোগ্য।

পূর্বোক্ত দ্বিতীয় কবিতাটির নাম হচ্ছে 'বেঠিক পথের পথিক'। এটির সর্বত্রই ফাঁকপূরণ করা হয়েছে, কোথাও বাদ যায়নি। আর, ওই ফাঁকপূরণেরও এটুকু বৈশিষ্ট্য আছে যে, প্রায় সর্বত্রই দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিটিকে যুগ্মপ্রকৃতি দিয়ে ফাঁকপূরণ করা হয়েছে। একটু উদ্ধৃত করলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশথ পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

এটি যে শুধু বেফাঁক স্বরবৃত্ত হয়েছে, তা নয়, সর্বত্রই দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিটি হয়েছে যুগ্মধ্বনি। ফলে 'বিজয়ী' কবিতার বেফাঁক ছন্দ থেকে এর ছন্দের ধ্বনি একটু স্বতন্ত্র রকমের হয়েছে, তা সহজেই টের পাওয়া যায়। আর, ওই এক কারণেই যুগ্মধ্বনির বাহুল্য সত্ত্বেও এ-কবিতাটির কোথাও যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়নি। বলা প্রয়োজন যে, একটি জায়গায় ('মন কেমন করে') ওই রীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থানের পরিবর্তে প্রথম ও তৃতীয় স্থানে যুগ্মধ্বনি স্থাপিত হওয়াতে ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে কেমন একটু উলটো গতি দেখা দিয়েছে। এ-কবিতাটির আরও অল্প কয়েকটি স্থানে এ-রকম ব্যতিক্রম রয়েছে। আর এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, এ স্থলে 'করে' শব্দের মধ্যে পর্বযতি স্থাপিত হওয়াতে বাংলার প্রাস্বরিক রীতি অব্যাহত থাকেনি এবং তার ফলে কানটাও যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন হতে পারেনি। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, এই কবিতাটির শেষ পর্যন্ত ওই বিশিষ্ট ছন্দোভঙ্গিটি রক্ষিত হয়নি। তার শেষ স্তবকেও মাত্রার ফাঁকপূরণ করা হয়েছে বটে; কিন্তু তা যুগ্মধ্বনির সাহায্যে নয়, একেবারে নূতন পূর্ণ সিলেব্‌ল্ আমদানি করে। যথা—

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে।

ছুঁই কি না ছুঁই 'বুঝি না কিছুই'
মন কেমন করে।
'চরণে তাহার' পরান বুলাই
অরূপ দোলায় 'রূপেরে দুলাই' ;
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
'অধরা স্বপন' যে।
'চেনা অচেনায়' মিলন ঘটায
মনের মতন রে।

এখানে প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা ঠিক আছে বটে ; কিন্তু সর্বত্র চার সিলেব্‌ল্‌এর রীতি ঠিক নেই ; কেননা পাঁচটি পর্বে পাঁচ সিলেব্‌ল্ স্থান পেয়েছে। ফলে ছন্দের পূর্বানুসৃত গতিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বস্তুত এ ছন্দকে আর স্বরবৃত্ত ছন্দই বলা যায় না ; একে বলতে হয় ষণ্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। অবশ্য সমগ্র কবিতার ছন্দটিকেই উক্তপ্রকার মাত্রবৃত্ত ছন্দ বলে অভিহিত করলে একরকম সংগতি রক্ষা করা যায়। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ-কবিতাটির আগাগোড়া ধ্বনিসন্নিবেশরীতির সমতা রক্ষিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কবিতার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবিতাটির নাম 'সুসময়'[১]। এই কবিতাটিতে সর্বত্রই চার সিলেব্‌ল্ ও ছয় মাত্রার সমাবেশ ঠিক আছে। যেমন—

হঠাৎ তখন সূর্যডোবার কালে
দীপ্তি জাগায় দিক্‌ললনার ভালে।
মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
পরম আশার চরম প্রদীপ জ্বালে।

১ রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় অংশে 'সংযোজন' বিভাগ দ্রষ্টব্য

কিন্তু একটি পংক্তিতে ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা—

লেখক যে-জন | বাহির-ভুবনে | আসে।

এখানে দ্বিতীয় পর্বে স্বরবৃত্ত ছন্দের রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। কেননা, স্পষ্টতই পাঁচ সিলেব্‌ল্‌ দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যাসোনার | ভাণ্ডারদ্বার | পানে

এখানে দ্বিতীয় পর্বে তিন সিলেব্‌ল্‌। কিন্তু এটা স্বরবৃত্ত ছন্দের রীতি-বিরোধী নয়। বলা প্রয়োজন যে, 'বাহির-ভুবনে' পর্বটির প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র কবিতাটির ছন্দকে যদি ষণ্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্ত বলে অভিহিত করা যায় তা হলে ছন্দ-চ্যুতির অভিযোগ এড়ানো যায়; কিন্তু তাতে এ-ছন্দটির প্রধান বৈশিষ্ট্যটুকুই অলক্ষিত থেকে যায়।

২৩

এ-স্থলেই রবীন্দ্রপ্রবর্তিত বাংলা সাহিত্যের একটি আধুনিক ছন্দোরীতির বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দের রচনায় অনেক সময় দেখা যায়, অনেক পংক্তির সামনেই এমন এককেটি শব্দ থাকে যেগুলিকে ছন্দের এলাকাভুক্ত বলে গণ্য করা গেলেও ঠিক পংক্তির অন্তর্গত বলে গণ্য করা যায় না। যেমন, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে—

ওই বাঁশি-স্বর তার আসে বার বার
সেই শুধু কেন আসে না?
এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।

—কড়ি ও কোমল, বিরহ

স্বরবৃত্ত ছন্দেও ও-রকম শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে

কালো তমালমূলে।

—ক্ষণিকা, জন্মান্তর

এখানে ওই, এই, হের, ওরে, এই চারটি শব্দের উপর কোনো ঝোঁক ব প্রস্বর নেই, এবং এগুলিকে মূল পংক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটু শিথিলভাবে উচ্চারণ করতে হয়। বস্তুত এগুলি ছন্দের বা পংক্তির অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, ওগুলিকে বাদ দিলেও পংক্তির কাঠামো ঠিক থাকে। উক্ত চারটি শব্দ বাদ দিয়ে উপরের দৃষ্টান্ত দুটি আবৃত্তি করলেই একথা বোঝা যাবে। যা হোক, এরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাক্‌পংক্তিক ধ্বনিকে আমরা 'অতিপংক্তিক পব' বা সংক্ষেপে **'অতিপর্ব'** (Anacrusis বা Extrametrical Foot) বলে অভিহিত করতে পারি। বলা বাহুল্য যে, এই অতিপর্ব পংক্তিপ্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্ত হলেও ছন্দ-প্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্ত নয়; ছন্দের পক্ষে অনাবশ্যক হলে তার ব্যবহারই হতে পারত না অথবা তাতে ছন্দের ক্ষতি হত। ছন্দের পক্ষে এই অতিপর্বিক ধ্বনির প্রয়োজন হল এই। প্রথমত ও-রকম ধ্বনি পংক্তির মুখ ববণরূপ অলংকারের কাজ করে; যে-সব স্থলে অতিপর্বের ব্যবহার আছে সে-সব স্থলে ওগুলিকে বাদ দিয়ে পড়লেই এই প্রারম্ভিক ধ্বনিগুলিতে অভাব অনুভূত হয়। তার দ্বারাই এগুলির ছন্দোগত প্রয়োজন প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, শুধু অলংকরণ নয়, অন্য প্রয়োজনও আছে। বাংলা ছন্দের প্রতিপংক্তির প্রথম ধ্বনিটির উপর সর্বদাই একটি প্রস্বর (accent) থাকে। তার ঠিক পূর্বেই ওই অপ্রস্বরিত অতি-পর্বটি থাকার ফলে ওই পংক্তিশীর্ষস্থ প্রস্বরটির উপর যথোচিত জোর দিবার সুবিধে হয় এবং প্রস্বরটি ফোটেও ভাল। যেমন লম্বা লাফ দেবার পূর্বে কয়েক পা পিছু হটে গেলে সুবিধে হয় কিংবা ঘোড়াকে ছুটিয়ে দেবার পক্ষে আগে একটু লাগাম টেনে নেওয়া দরকার হয়, অনেকটা সেই রকম। তা ছাড়া, পংক্তিসূচনার প্রস্বরটির পূর্বে এই অপ্রস্বরিত অতিপর্বটি থাকার ফলে ছন্দের প্রবাহে বেশ একটু নূতন ধরনের দোলা জেগে ওঠে; এই দোলাটিকে কতকটা ইংরেজি আয়াম্বিক দোলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যা হোক, এ-ভাবে পংক্তির পূর্বে

অপ্রস্বরিত ধ্বনিস্থাপনের ফলে যে ছন্দোগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, সেইটিই হচ্ছে অতিপর্ব প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা।

আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যে এই অতিপর্বিক মাত্রা প্রয়োগেব রীতি রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তন করেন। মধুসূদনপ্রমুখ কবিদের রচনায় এ রীতি দেখা যায় না। তার এক কারণ এই যে, তাঁবা সর্বদাই যৌগিক ছন্দ ব্যবহাব করতেন; মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের প্রচলন তখনও হয়নি। আর, অতিপর্বের ব্যবহার শুধু এ-দুই ছন্দেই চলে, যৌগিকে চলে না বললেই হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়সেই এই অতিপর্ব ব্যবহাবের কৌশলটি আয়ত্ত কবে-ছিলেন। যথা—

শুন, নলিনী খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল নাকি!
দেখ তোমারি দুয়ার 'পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।

—শৈশবসংগীত, প্রভাতী

ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।···
আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।

—প্রভাতসংগীত, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথই এই অতিপর্বপ্রয়োগের রীতির স্রষ্টা, এ-কথা মনে করলে ভুল করা হবে। আমার যতদূর ধাবণা সংস্কৃত ছন্দে এ-রীতির নিদর্শন নেই।

কিন্তু প্রাকৃত ছন্দে অতিপর্বের বহুলপ্রয়োগ দেখা যায়, যদিও প্রাকৃত ছন্দ-শাস্ত্রকার তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। ও-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ এ-স্থলে 'হরিগীতা' ছন্দের উল্লেখ করতে পারি। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ও-ছন্দের উদাহরণ দেখানো হয়েছে; তাতেই অতিপর্বের ব্যবহার দেখা যাবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও অবস্থাবিশেষে অতিপর্ব-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

জয় দেবি জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে॥

—ভারতচন্দ্র · অন্নদামঙ্গল, নারদের গা[illegible]

এখানে 'জয়' শব্দটাই পুনঃপুনঃ অতিপর্বরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহু[illegible] এ-ছন্দটা হচ্ছে প্রত্নরীতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগের বাংলা সাহিত্যে এ-রকম ক্ষেত্রে অতিপর্বপ্রয়োগের অনেক দৃষ্টান্তই দেখা যায়। কিন্তু মাত্রাবৃত্তেই নয়, লোকসাহিত্যের ছন্দেও অতিপর্বের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। বাউল প্রভৃতি লোকসংগীতেই তার প্রমাণ রয়েছে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল, ব্রতধর্ম করত সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতি বোল কবেই কবে।···
ও ভাই, আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥

—দুর্ভিক্ষ

রবীন্দ্রনাথ এ-রীতির স্রষ্টা না হলেও আধুনিক কালের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এর সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন এবং প্রধানত লোকসাহিত্য থেকে এটিকে সংগ্রহ করে আপন প্রতিভাবলে ভদ্রসাহিত্যকেও তিনি অলংকৃত করেছেন ওই লৌকিক রীতিটিরই সাহায্যে। তাঁর হাতে এর প্রয়োগ কেমন চমৎকার হয়ে উঠেছে, তা রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। অতিপর্বের প্রয়োগবৈচিত্র্যের বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান আমাদের নেই। আমরা এ-রীতির আর দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎ-ফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়,
আমি নীরবে করিব তরণ
সেই মহাবরষার রাঙাজল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

—উৎসর্গ, ৪৮

দূরে অশথতলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ?
সামনে আঙিনাতে
তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচো।...
দূরে কেন আছ?
দ্বারের আগল ধরে নাচো,
বাউল, আমারি এইখানে।

সমস্ত দিন ধরে
যেন মাতন ওঠে ভবে
তোমার ভাঙনলাগা গানে।
—শিশুভোলানাথ, বাউল

২৪

যৌগিক ছন্দের পর্বগঠনবিষয়ে এ-তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে যে, ও-ছন্দ কোথাও অসমসংখ্যক মাত্রাকে স্বীকার করে না (পৃ ৩৪-৫)। সুতরাং পূর্বতন কবিরা যে-সব ছন্দোবন্ধে তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি অসমসংখ্যার মাত্রাবিভাগের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি সে-সব ছন্দোবন্ধকে যৌগিকের এলাকা থেকে মাত্রাবৃত্তের এলাকায় স্থানান্তরিত করেছেন। তাঁরই রচনা থেকে এ-কথা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যৌগিক ছন্দ-গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে চার মাত্রার পর্ব; এ-ছন্দ মূলত চতুর্মাত্রক পর্বেরই ছন্দ বলে অন্য আয়তনের পর্ব এ-ছন্দে খাপ খায় না। কিন্তু বহুস্থলে দুটি পর্বের সংযোগে উৎপন্ন আটমাত্রার একেকটি **যুক্তপর্ব** এ-ছন্দকে একটি বিশেষ গাম্ভীর্য দান করে; আবার চার মাত্রার একটি পূর্ণপর্ব এবং দু-মাত্রার একটি অর্ধপর্বের সংযোগেও অনেক সময়ে একেকটি যুক্তপর্বের উৎপত্তি হয়; এ-ধরনের যুক্তপর্বকে খণ্ডিত যুক্তপর্ব বা **সার্ধপর্ব** নামে অভিহিত করতে পারি। এই সার্ধপর্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পংক্তির শেষপ্রান্তে স্থাপিত হয়ে থাকে। কি ভাবে পর্বযতি লুপ্ত হবার ফলে যুক্তপর্বের উদ্ভব হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

এ দুর্ভাগ্য | দেশ হতে, | হে মঙ্গল | -ময়,
দূর করে | দাও তুমি | সর্ব তুচ্ছ | ভয়;···
মস্তক তুলিতে দাও | অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে | উন্মুক্ত বাতাসে
—নৈবেদ্য, ৪৮

প্রথম দুই পংক্তিতে প্রত্যেক পর্বের পরে সুস্পষ্ট যতি রয়েছে। কিন্তু পরের অংশে প্রতিপংক্তিতে দুটি করে পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে; ফলে একটি পূর্ণ যুক্ত-পর্ব ও একটি খণ্ডিত যুক্তপর্ব বা সার্ধপর্বের উদ্ভব ঘটেছে। আর, সার্ধপর্ব-দুটি স্থাপিত হয়েছে পংক্তির শেষাংশে, তাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

যা হোক, চার মাত্রার পূর্ণপর্ব, আট মাত্রার যুক্তপব এবং ছয়মাত্রার সার্ধপব, এই তিনটি উপাদানেই সমস্তপ্রকার যৌগিক ছন্দোবন্ধ গঠিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে না হলেও মধুসূদনই এ-তত্ত্বটি প্রথম অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি উক্ত তিন প্রকার পর্বের বিচিত্র সমন্বয় ও যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যের দ্বারা বাংলায় 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এ-তত্ত্বটি তিনি কখনও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেননি; তাই 'মেঘনাদবধ'কাব্যে ছন্দের এমন প্রবল গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও বহু স্থানেই ছন্দ-বিচ্যুতি ঘটা সম্ভবপর হয়েছে (পৃ ৩৪) এবং সে-জন্যই তাঁর রচনায় 'বন অতি রমিত হইল ফুলফুটনে', 'অদয় অক্রূর, যবে সে আইল ব্রজমণ্ডলে', 'মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা অমৃত' ইত্যাদি রকমের ছন্দ-বিকৃতির সাক্ষাৎ পাই। যা হোক, এ-কথা মনে রাখা উচিত যে অমিত্রাক্ষর ছন্দেও অমিত্রাক্ষরতাই আসল কথা নয়; অর্থাৎ যৌগিক পয়ার ছন্দে মিলের অভাব ঘটানোই মধুসূদনের কৃতিত্ব নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

> সেথায় কপোতবধূ লতার আড়ালে
> দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ।
> নবীন চাঁদের করে একটি হরিণী
> আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমায়।
> তার শান্ত নিশাকালে নিশ্বাসপতনে
> প্রহর গণিতে পারি স্তব্ধ রজনীর।
>
> —প্রভাতসংগীত, সম্মিলন

এটি একটি অমিল বা অমিত্রাক্ষর পয়ারের দৃষ্টান্ত। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর

পয়ারের যা বৈশিষ্ট্য, তা-ই এটিতে নেই। সুতরাং তথাকথিত অমিত্রাক্ষর ছ… বৈশিষ্ট্য কি এবং মধুসূদনের কৃতিত্ব কোথায়, তা ভেবে দেখা দরকার। পয়ারে… সংকীর্ণতা, অর্থাৎ ও-ছন্দের পর্বসমাবেশে ও যতিস্থাপনে যে একটা একঘেয়ে… ভাব আছে, সেটাকে ঘুচিয়ে দিয়ে, বিচিত্র ও অভিনব উপায়ে পর্বসমাবেশ- ও যতিস্থাপনরীতির প্রবর্তন করে এবং কবির ভাবকে দুটিমাত্র পংক্তির অপরিসর গণ্ডি থেকে মুক্ত করে তাকে বহু পংক্তির মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়াতেই মধুসূদনের কৃতিত্ব। পয়ার ছন্দের দুর্বলতাই এই যে, ও-ছন্দে প্রতিপংক্তির মধ্যে আট মাত্রার পর একটি অর্ধযতি ও পংক্তির প্রান্তে একটি পূর্ণযতি স্থাপন অত্যাবশ্যক. তা ছাড়া, দুটিমাত্র পংক্তির অল্প পরিসরের মধ্যেই কবির সমস্ত ভাবকেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে হয়। মধুসূদনের বিদ্রোহী মন পয়ারের এই সংকীর্ণ গণ্ডি ও তার নিয়মের বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে তার নিয়মের বন্ধনকে দিলে ছিন্ন করে এবং কবির ভাবকে দিলে পংক্তির পর পংক্তিতে ছড়িয়ে পড়বার অবা… অধিকার। তাঁর প্রবর্তিত ছন্দে পংক্তি যেখানে শেষ হয়, ভাব ও ছন্দের প্রবাহ সেখানেই বিরত হয় না; বরং ভাবের প্রবাহ যেখানে গিয়ে বিরাম লাভ করে ছন্দের গতিও সেখান পর্যন্ত বয়ে যেতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ এ-ছন্দে ভাব ধ্বনিকে অনুসরণ করে না, ধ্বনিই ভাবকে অনুসরণ করে। ফলে কবির প্রয়োজন অনুসারে কবির ভাব ও তার অনুসরণকারী ছন্দের ধ্বনি একাধিক পংক্তির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে; প্রতিপংক্তির অন্তে পূর্ণবিরতি লাভের অবকাশ পায় না। ভাব ও ছন্দের এই যে **প্রবহমানতা** (*enjambement*), এটি… বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের বিশেষ দান। 'মেঘনাদবধ'কাব্যের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ওই প্রবহমানতা; অমিত্রাক্ষরতা বা মিলের অভাবটাই ওই ছন্দের অচ্ছেদ্য বা অত্যাবশ্যক অঙ্গ নয়। সুতরাং 'মেঘনাদবধ'এর ছন্দকে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে অভিহিত করলে সব কথা, এমন-কি আসল কথাটিই বলা হয় না। কারণ ও-নামটি একটিমাত্র গুণের অভাব-সূচনাই করে, ও-ছন্দের আসল স্বরূপটিই জ্ঞাপিত হয় না। Blank Verseএর বাংলা না… 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' হতে পারে; কিন্তু অমিত্রাক্ষরতা Blank Verseএরও মূল ক…

নয়। সুতরাং মধুসূদনের প্রবর্তিত ছন্দের যদি কোনো যথার্থ নাম দিতে হয়, তবে তাকে বলা উচিত 'প্রবহমান পয়ার' ছন্দ। বলা বাহুল্য এ-পয়ার যৌগিক পয়ার, মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত পয়ার নয়। এই প্রবহমান পয়ার ছন্দ অ-মিলও হতে পারে, স-মিলও হতে পারে; মিলের অভাবে কিংবা সদ্ভাবে এর আসল প্রকৃতিতে কোনো পার্থক্য ঘটে না। এবার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু | চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, ¦ কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি, |
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? |

দণ্ডচিহ্নের দ্বারা পূর্ণযতি নির্দেশ করা গেল, অনাবশ্যকবোধে পর্বযতি বা অর্ধযতি কোনো চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়নি। যা হোক, দেখা যাচ্ছে, এখানে সাধারণ পয়ারের মতো প্রত্যেক পংক্তির শেষেই পূর্ণযতি স্থাপিত হয়নি; পূর্ণযতির বিভাগগুলি আয়তনে সমান নয় এবং প্রায় সর্বত্রই এই বিভাগগুলি এক কিংবা একাধিক পংক্তির সীমা অতিক্রম করে অন্য পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। এইটেই এ-ছন্দের আসল কথা। এ-জন্যেই একে আমি বলি প্রবহমান (enjambed বা run-on) ছন্দ। আর, ওই কারণেই রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'পংক্তিলঙ্ঘক' বা 'লাইনডিঙানো' ছন্দ[১]। পারিভাষিক ভাষায় বলা যায় যে, এ-রীতির রচনায় ছন্দ-পংক্তি (অর্থাৎ পূর্ণযতির বিভাগ) অধিকাংশ স্থলেই লিপিপংক্তিকে (অর্থাৎ চোদ্দ মাত্রার সীমাকে) অতিক্রম করে যায়। এটাই এই প্রবাহমান ছন্দের বৈশিষ্ট্য। কাব্যের প্রয়োজনে মধুসূদন এই প্রবহমান পয়ারকে অধিকন্তু অমিল করেই রচনা করেছিলেন। এই অংশটুকুর

১ ছন্দ, পৃ ৭৪, ১৪২

সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত অমিল অপ্রবহমান পয়াব ছন্দের দৃষ্টান্তটির তুলনা করলেই বিষয়টা বোঝা সহজ হবে।

মধুসূদনের প্রবর্তিত ছন্দ সম্বন্ধে এতটা বিস্তৃত আলোচনা করার উদ্দেশ্য আছে। কারণ, ও-ছন্দও রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেই পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। কিভাবে করেছে, সে-কথা আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মধুসূদনের ছন্দের পূর্ণপরিচয়জ্ঞাপক নাম হচ্ছে 'অমিল প্রবহমান পয়াব'। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, মিলের অভাবটাই ও-ছন্দের আসল তত্ত্ব নয়, বরং অন্যান্য সকল ছন্দেরই মতো এ-ছন্দেও অবস্থাবিশেষে মিল থাকার প্রয়োজন আছে। মিল ছন্দের পক্ষে অপরিহার্য না হলেও ওটি ছন্দের একটি প্রধান অঙ্গ, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রাণী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নাট্যকাব্যে অমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দই ব্যবহার করেছেন, কারণ নাট্যকাব্যে মিল না থাকার সার্থকতা আছে। কিন্তু অন্যত্র অর্থাৎ ও-ছন্দে রচিত প্রায় সমস্ত কবিতাতেই তিনি পংক্তিপ্রান্তিক মিল রক্ষা করেছেন। অবশ্য মধুসূদনও তাঁর সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে প্রবহমান পয়ারে মিল রেখেছেন; কিন্তু সে মিল সাধারণ পয়ারের মতো পংক্তিক্রমিক নয়, বিদেশী সনেটের মতো বিশেষ পর্যায়বদ্ধ মিল। রবীন্দ্রনাথও সনেটে প্রবহমান পয়ার-ছন্দ ব্যবহার করেছেন এবং তাতে পংক্তিক্রমিক মিলই রক্ষা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যের চমৎকার সনেটগুলির উল্লেখ করতে পারি। এই গ্রন্থের একটি সনেট থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি।

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো

সমস্ত সংসার মোর লক্ষবতিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।

—নৈবেদ্য, ৩০

শুধু সনেটে নয়, অন্য ধরনের কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ এ-রকম সমিল প্রবহমান ছন্দ ব্যবহার করেছেন এবং পংক্তিক্রমিক মিলই রক্ষা করেছেন। বোধ করি 'মানসী'র যুগেই তিনি এ-ছন্দের কবিতা প্রথম রচনা করেন, আর এই গ্রন্থের 'মেঘদূত'নামক সুবিখ্যাত কবিতাটিই (১৮৯০) সম্ভবত এ-ছন্দে রচিত প্রথম কবিতা। এটি থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি; তাব থেকে দেখা যাবে, এই প্রথম কবিতাটিতেই ও-ছন্দের রচনাকৌশল কেমন পূর্ণপরিণতি লাভ করেছে।

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট; কোথা রহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।

অতঃপর এই সমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'দেবতার গ্রাস' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত এ ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় ছন্দ বলে গণ্য হতে পারে।

২৫

প্রবহমান পয়ার সম্বন্ধে এ-স্থলে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে বহুকাল যাবৎ চোদ্দ মাত্রার পয়ারই চলে আসছে। কিন্তু পয়ারকে শুধু চোদ্দ মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে হবে, এমন কোনো অপরিহার্য বিধান নেই। তাই ষোল মাত্রার পয়ার রচনার প্রয়াস অনেকেই করেছেন. রবীন্দ্রনাথও একসময়ে ষোল মাত্রার পয়ার রচনা করেছেন। যথা—

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন,
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।

—কড়ি ও কোমল, গানরচনা

কেবল সাধারণ পয়ার নয়, রবীন্দ্রনাথ ষোল মাত্রার প্রবহমান ছন্দ নিয়েও পরীক্ষা করেছেন। যেমন—

প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখি শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝরে
আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন 'পরে
একটি শিশিরকণা। চলে গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার
প্রখর প্রমোদ হতে রাখিবে শীতল করি
তোমার তরুণ মুখ।

—মানসী, শেষ উপহার

কিন্তু যৌগিক ছন্দের স্বভাব এই যে, এ-ছন্দ সর্বদাই প্রতিপংক্তির শেষ প্রান্তে একটি করে ছ-মাত্রার সার্ধপর্বের অপেক্ষা রাখে; অর্থাৎ পংক্তিপ্রান্তে দু-মাত্রার

অবকাশ চায়; নতুবা এ-ছন্দের গতিভঙ্গিটা কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়ে। তাই চোদ্দর স্থানে ষোল মাত্রার পয়ার যৌগিক ছন্দে সুবিধাজনক হল না। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে ষোল মাত্রার যৌগিক পয়ার রচনা করেননি এবং আজকালকার অন্যান্য কবিরাও তা করেন না। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত রীতিতে ষোল মাত্রার পয়ার অতি সুন্দর হয়; তাই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ষোল মাত্রার পয়ারে মাত্রাবৃত্তরীতিই অনুসরণ করেছেন। যথা—

সকলের শেষ ভাই সাত ভাই চম্পার
পথ চেয়ে বসেছিল দৈবানুকম্পার।
মনে মনে বিধি-সনে করেছিল মন্ত্রণ
যেন ভাইদ্বিতীয়ায় পায় সে নিমন্ত্রণ॥

—প্রহাসিনী, ভাইদ্বিতীয়া

ষোল মাত্রার সাধারণ পয়ার যৌগিক রীতিতে সুবিধাজনক না হলেও ষোল মাত্রার প্রবহমান পয়ার রচনার পক্ষে কোনো গুরুতর বাধা ছিল না। তথাপি রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান পয়ারেও ষোল মাত্রা ব্যবহার করেননি। তার একটু বিশেষ কারণ আছে। ষোল মাত্রার সংকীর্ণ পরিসরকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই তো কবিরা যোল মাত্রার পংক্তিকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, যৌগিক রীতির পয়ার ছন্দে যদি দ্বিতীয় পর্বের পরেই চার মাত্রার একটি অতিরিক্ত পর্ব যোগ করে দেওয়া যায়, তা হলে আঠার মাত্রার একটি চমৎকার নূতন ধরনের পয়ারের উৎপত্তি হয়। এ-ছন্দের নাম দেওয়া যায় 'বর্ধিতপয়ার' বা **'দীর্ঘপয়ার'**। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'কাব্যে[১] এই দীর্ঘপয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'স্বপ্নপ্রয়াণ'কাব্য থেকেই দীর্ঘপয়ার রচনার আদর্শ গ্রহণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত কাব্য থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

১ প্রথম সর্গ : বঙ্গদর্শন, ১২৮০, শ্রাবণ, গ্রন্থ. ১৮৭৫

বিলম্বে পশ্চিমমূলে, | তরুদের | জটিল মাথায়
ক্ষীণ কর নিবেশিয়া | আশিসিয়া | মাগিয়া বিদায়,
অতিশয় অনিচ্ছায় | লয় পরে | কর অপসারি!
যায় বটে জলধর | চাতকেরে | দিয়া যায় বারি।

—স্বপ্নপ্রয়াণ, দ্বিতীয় সর্গ, ১৭০

অতিরিক্ত তৃতীয় পর্বটি দণ্ডচিহ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হল। অনেক সময় এই পর্বটি পরবর্তী পর্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু আঠার মাত্রার দীর্ঘপয়ার রচনা করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি এ-ছন্দটিকে প্রবহমানরূপেও ব্যবহার করেছেন। যথা—

গম্ভীর পাতাল! যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসযে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাপাপি করে দেশময
তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল।

—স্বপ্নপ্রয়াণ, পঞ্চম সর্গ, ১-২

রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে এ-ছন্দ যে কি শক্তি ও সৌষ্ঠব অর্জন করেছে, তা কারও অজানা নেই। তাঁর সার্থক সাধনার ফলে এখন এ-ছন্দটি বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীর একটি অতিপ্রিয় বাহনরূপেই গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর কবিজীবনের সূচনাকালেই আঠার মাত্রার দীর্ঘপয়ারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে তাঁর বাল্যরচনাতেই। যেমন—

গভীর আঁধার রাত্রি, শ্মশান ভীষণ!
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার-আসন!
সরসর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায়,
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায়!

—বনফুল[১], সপ্তম সর্গ

১ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', ১২৮২ অগ্রহায়ণ-১২৮৩ কার্তিক, গ্রন্থ : ১২৮৬

রবীন্দ্রনাথ এ-ছন্দটিকে শুধু দুই পংক্তির মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখেননি ; অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও এটিকে বহু পংক্তির মধ্যে মুক্ত ও প্রবহমান করেছেন। 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' (১৮৯৩) এবং 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' (১৮৯৪), এ-দুটিই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান দীর্ঘপয়ার ছন্দে রচিত প্রথম কবিতা। এ-দুটি কবিতাই সুবিখ্যাত। তথাপি ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখানো প্রয়োজন বলে প্রথমোক্ত কবিতাটি থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি

> হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
> একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
> চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
> সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
> নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
> অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
> ধ্বনিত করিয়া দশ দিশি।

বলা বাহুল্য এটি হচ্ছে সমিল প্রবহমান দীর্ঘপয়ারের দৃষ্টান্ত। পরবর্তী কালে 'উৎসর্গ' প্রভৃতি কাব্যে এ-ছন্দে বহু কবিতা রচিত হয়েছে। এ-ছন্দটির পরিসর বেশি ; তাই এর প্রবাহ মধুসূদনের লঘুপয়ারের চেয়ে বিপুলতর ও প্রবলতর আকার ধারণ করেছে এবং সে-জন্যেই ষোল মাত্রার প্রবহমান পয়ার অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। দীর্ঘকাল রবীন্দ্রসাহিত্যে এ-ছন্দের কোনো অমিল দৃষ্টান্ত ছিল না। অবশেষে অতি পরিণত বয়সে তিনি 'প্রান্তিক' গ্রন্থে (১৯৩৮) অমিল প্রবহমান দীর্ঘপয়ার ছন্দে কতকগুলি অতি চমৎকার কবিতা রচনা করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন।

> ···এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
> উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদী পার হতে
> যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,

আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আন বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

—প্রান্তিক, ১৭

২৬

পয়ারের বন্ধনমোচন উপলক্ষ্যে মধুসূদনের হাতে যে ছন্দোমুক্তির সূচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের হাতে তা এভাবে অনেকখানি পূর্ণতা লাভ করল। কিন্তু যৌগিক পয়ারকে নানা নিয়মের কৃত্রিম বন্ধন থেকে এতখানি মুক্তি দিয়েও তিনি নিরস্ত হতে পারেননি। সমস্ত ছন্দেই বন্ধনের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু মুক্তিরও একটা সার্থকতা আছে। তাই তিনি যৌগিক ছন্দকে অধিকতর মুক্তির পথে চালিয়ে নিতে প্রয়াসী হলেন। লঘুপয়ার বা দীর্ঘপয়ারের প্রতি-পংক্তিতে নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যার যে বন্ধনটি আছে তার সার্থকতা কোথায়? ছন্দ যখন প্রতিপংক্তির অন্তস্থিত বিরামের রীতিটিকে স্বীকার করে চলে, তখন এই মাত্রাসংখ্যার সীমাবন্ধনটির প্রয়োজনীয়তা থাকে। কিন্তু ছন্দের ধারা যখন মাত্রা-সংখ্যা ও পংক্তির প্রান্তস্থিত বিরামের তীরকে অতিক্রম করে পংক্তির পর পংক্তিকে প্লাবিত করে প্রবাহিত হতে থাকে, তখনও ছন্দকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা-সংখ্যার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। তা-ছাড়া, প্রতিপংক্তিকে সমপরিসর করার দায় থাকলে কবির ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার উপরে যে অনাবশ্যক বাধা চাপানো হয়, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। এ তত্ত্বটি অনুভব করেই রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান ছন্দে পংক্তিগত মাত্রা-

সংখ্যার গণ্ডি দৃঢ়হস্তে ভেঙে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

…নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।

—চিত্রা, প্রেমের অভিষেক

এখানে প্রতিপংক্তির পরে, পূর্ণযতি তো নেই-ই, অর্ধযতিও নেই। অথচ পূর্বাগত নিয়মের খাতিরে চোদ্দ মাত্রার সীমাকে মেনে চলতে হচ্ছে। এই মানাটা কৃত্রিম এবং অনাবশ্যক। পূর্বে নিয়ম ছিল প্রতিপংক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকা চাই। এই নিয়মটিকে না মেনে ছন্দকে প্রবাহিত করে দেওয়া হল পরবর্তী পংক্তিতে, অথচ চোদ্দ মাত্রার সীমাটা অব্যাহতই রইল। এটা অনাবশ্যক নয় কি? মাত্রাসংখ্যার সীমাকে অস্বীকার করে উপরের দৃষ্টান্তটিকে যদি—

নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশবিদেশের ভাষা,
যুগযুগান্তের কথা,
দিবসের নিশীথের গান,
মিলনের বিরহের গাথা,
তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের উৎকণ্ঠিত তান।

এভাবে সাজানো যায়, তা হলে দোষ কি? দোষ কিছুই হয় না। বরং এখানে ছন্দকে যতিবিভাগ অনুসারে সাজানো হয়েছে বলে এটাকেই অধিকতর অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক বলে স্বীকার করতে হয়। এ-কথাটি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন ‘সবুজপত্রে’র যুগে। ও-কাগজে এই নূতন পদ্ধতিতে রচিত অনেক

কবিতা প্রকাশিত হয়; সেগুলি সবই 'বলাকা' কাব্যের (১৯১৬) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ও-গ্রন্থে যে মুক্ত ছন্দের সন্ধান পাই, তাতে অনাবশ্যক ও কৃত্রিম ছন্দের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। সুতরাং এ ছন্দকে **মুক্তক** ছন্দ নামে অভিহিত করতে পারি। এবার এই নূতন রীতির ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার। 'বলাকা'র সুবিখ্যাত 'ছবি'নামক কবিতাটিই (১৯১৪) হচ্ছে এই মুক্তক ছন্দের সর্বপ্রথম রচনা। এই কবিতাটি থেকে একটু অংশ এখানে সংকলন করে দিলাম।

মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন;
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর মুখর ছায়া মাধবী বনের
হত স্বপনের।

এই উৎকলিতাংশটির প্রতি লক্ষ্য করলে অনায়াসেই বোঝা যায়, সমপংক্তিক প্রবহমান পয়ারের চেয়ে এই অসমপংক্তিক প্রবহমান পয়ারে অর্থাৎ মুক্তকে যতি-স্থাপন ও ছন্দোবিভাগগঠনের বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা কত বেশি। এ-স্থলে বলা প্রয়োজন যে, এ-ছন্দের ন্যূনতম আয়তন হচ্ছে দু-মাত্রা এবং বৃহত্তম আয়তন আঠার মাত্রা। আঠার মাত্রার চেয়ে দীর্ঘ পংক্তিও মাঝে মাঝে দেখা যায়। যথা—

যার ভাষা বুঝিতে পারিনি,
অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
—বলাকা, ৪২

এ-রকম দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তাঁর এ-জাতীয় ছন্দে পংক্তিদৈর্ঘ্য সাধারণত আঠার মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে যায় না। সুতরাং এ-কথা বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ আঠার মাত্রাকেই প্রবহমান ছন্দের ঊর্ধ্বতন সীমা বলে গণ্য করতেন। আরেক কথা এই যে, সমায়তন প্রবহমান ছন্দে পংক্তির শেষে অনেক সময় কোনো যতিই থাকে না; কিন্তু মুক্তকের পংক্তিপ্রান্তে কোনো-না-কোনো রকম যতি থাকা চাই। যে পংক্তির শেষে কোনো যতিই থাকে না, সে-রকম পংক্তি রচনার কোনো সার্থকতাও থাকতে পারে না। কিন্তু সাধারণ অপ্রবহমান পয়ারের মতো মুক্তকের প্রতিপংক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে না। সুতরাং মুক্তক ছন্দও প্রবহমান, এ-কথা মনে রাখা চাই। বস্তুত প্রবহমান ছন্দকে অধিকতর মুক্তি দেবার ফলেই ও-ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কোনো ছন্দের পক্ষেই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ বন্ধনই ছন্দের প্রাণ; সকল বন্ধনকে অতিক্রম করলে ছন্দ আর ছন্দই থাকবে না, সে হবে তার পক্ষে আত্মঘাত। ও-রকম যতিমাত্রার বন্ধনহীন রচনার ভাষা আর 'পদ্য' থাকে না, সে হয়ে ওঠে গদ্য। কেননা পদ্য মানে হল পদবদ্ধ রচনা। সুতরাং ছন্দোবদ্ধ পদ্যের পক্ষে কোনো-না-কোনো বন্ধন অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু ছন্দের পক্ষে সকল বন্ধনেরই মর্যাদা সমান নয়। যে-বন্ধন ছন্দের পক্ষে অপরিহার্য সে-বন্ধনই হচ্ছে ছন্দের প্রাণ বা মূল-নীতি; পর্বগঠনপদ্ধতি ও যতিস্থাপনরীতি এ-জাতীয় বন্ধনের অন্তর্গত। আর, যে-বন্ধন ছন্দের পক্ষে অপরিহার্য নয় সে-বন্ধন স্থলবিশেষে ধ্বনিপ্রবাহের বাধা হলেও অধিকাংশ স্থলেই তা ছন্দের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে; পংক্তিগঠন ও শ্লোক-নির্মাণপদ্ধতি ও মিলস্থাপনের রীতি এ-শ্রেণীর বন্ধনের অন্তর্গত। যে নিয়ম-বন্ধনের উপর ছন্দের মূলনীতি নির্ভর করে তাকে বলতে পারি মুখ্য নিয়ম, আর

যে নিয়মের দ্বারা ছন্দের অঙ্গসৌষ্ঠবমাত্র নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বলা যায় গৌণ নিয়ম। যাহোক, আমাদের বক্তব্য এই যে, মুক্তক ছন্দে দ্বিতীয় শ্রেণীর গৌণ নিয়মের বন্ধন থেকেই মুক্তি ঘটে, প্রথম শ্রেণীর মুখ্য বন্ধন থেকে নয়। মুক্তক ছন্দকেও পর্বগঠন ও যতিস্থাপন বিষয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়; কিন্তু পংক্তি ও শ্লোক-নির্মাণ এবং মিলস্থাপন বিষয়ে এ-ছন্দের প্রচুর স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থাৎ যৌগিক ছন্দের মূলনীতিগুলিকেই মুক্তকে রক্ষা করে চলতে হয়, অন্য বিষয়ে এর গতিপ্রকৃতি বিধিবদ্ধ নয়।

এ-কথা মনে হতে পারে যে, মুক্তক ছন্দে যখন সমস্ত গৌণ বন্ধনের অবসান ঘটে স্বাধীনতার পরিধি যথাসম্ভব বিস্তৃত হয়েছে তখন একমাত্র এই ছন্দই অবলম্বনীয়, অন্য ছন্দের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা নয়। ছন্দের মুক্তির যেমন সার্থকতা আছে, বন্ধনেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। কবির প্রয়োজন অনুসারে অল্প বা অধিক বন্ধন স্বীকৃত হয়ে থাকে। কাব্যে যদি পৌরুষ-শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন হয় তবে কবি দরকারমতো নিয়মবন্ধনকে পরিহার করে ছন্দকে অল্পাধিক পরিমাণে মুক্ত করে তুলতে পারেন; পক্ষান্তরে রচনার সৌন্দর্য ও অলংকরণের প্রয়োজনে কবি নানারকম নিয়মবন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে ছন্দকে শোভিত করে তুলতে পারেন।

এ-কথা বলা হয়েছে যে, 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের ন্যায় মুক্তক ছন্দও মূলত প্রবহমান; এ-ছন্দেও ধ্বনির প্রবাহ পংক্তির পর পংক্তিতে বয়ে চলে। আর প্রবহমান পয়ারে যেমন মিল না-দেওয়াটাই অপরিহার্য নিয়ম নয়, প্রবহমান মুক্তকেও তেমনি মিল দেওয়াটাই অত্যাজ্য রীতি নয়। অর্থাৎ সমপংক্তিক প্রবহমান পয়ারের মতো মুক্তক ছন্দও সমিল এবং অমিল, দু-রকমই হতে পারে। 'বলাকা'র যুগে রচিত মুক্তক ছন্দের সমস্ত কবিতাই সমিল। তবে বহুকাল পরে 'পরিশেষ' কাব্যে অমিল মুক্তক ছন্দের কবিতা দেখা দিল। 'খেলনার মুক্তি' নামক একটি কবিতাই (১৯৩২) ও-গ্রন্থের প্রথম অমিল মুক্তক ছন্দের কবিতা। তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথ এ-ছন্দে বহু কবিতা রচনা করেছেন।

তাতে এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হালকা এবং গুরুগম্ভীর উভয় ধরনের কবিতাই এ ছন্দে অতি সুন্দর ফোটে। যাহোক, 'পরিশেষ' থেকে অমিল মুক্তকের দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার।

হানাসান ডেকে বলে,
"চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে,—
যেখানে খেলাব স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।"

—পরিশেষ, খেলনার মুক্তি

হে জরতী,
অন্তরে আমার
দেখেছি তোমার ছবি।
অবসান-রজনীতে দীপবর্তিকার
স্থিরশিখা আলোকের আভা
অধরে ললাটে শুভ্র কেশে।
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যুষের তারা
মুক্ত বাতায়ন থেকে
পড়েছে নিমেষহীন নয়নে তোমার।

—পরিশেষ, জরতী

'পরিশেষ'এর পর দীর্ঘকাল তাঁর রচনায় অমিল মুক্তকের সন্ধান পাই না। তারপর জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে তিনি আবার অনেকগুলি অমিল মুক্তক ছন্দের কবিতা লেখেন। এগুলির মধ্যে বোধ করি 'নবজাতক'এর অন্তর্গত 'রাত্রি'নামক কবিতাটিই (জুলাই, ১৯৩৯) প্রথম রচনা। 'রোগশয্যায়',

'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখা'র বহু কবিতা অমিল মুক্তক ছন্দে রচিত তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতাটিও (৩০ জুলাই ১৯৪১) এ-ছন্দেই রচিত।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।...
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

—শেষ লেখা, ১৫

২৭

অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তক' ছন্দটি ইউরোপ থেকে এ-দেশে আমদানি করেছেন। এ-কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু তাতে তাঁর ছন্দ-প্রতিভার কিছুমাত্র লাঘব ঘটে না। কারণ বিদেশী মুক্তক এবং আমাদের বাংলা মুক্তক ছন্দ বাইরের আকৃতিতে সদৃশ হলেও ও-দুই ছন্দের অন্তরের প্রকৃতি কখনও এক নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণপদ্ধতি অব্যাহত রেখে ছন্দকে মুক্তিদান করার যে কৃতিত্ব, ইউরোপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সে কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকবে। বিলিতি Blank Verseএর অনুসরণ করে বাংলায় 'অমিত্রাক্ষর' অর্থাৎ প্রবহমান ছন্দ প্রবর্তন করায় মধুসূদনের কবি-প্রতিভা উজ্জ্বলতরই হয়েছে, ম্লান হয়নি।

কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, 'সবুজপত্র' বা 'বলাকা'র যুগের বহু পূর্বেই মুক্ত ছন্দ রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের অন্তরে দেখা দিয়েছিল। তাঁর কবিজীবনের সূচনাতেই দেখতে পাই ছন্দের বাধাগুলোকে অতিক্রম করবার

একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গান'এ তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এমন কি 'শৈশবসংগীত'এও বালক কবির নবছন্দ উদ্ভাবনের প্রয়াস ও সাফল্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। পক্ষান্তরে 'কড়ি ও কোমল'এর যুগে কবিচিত্তের অস্থিরতা যখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, তখনও নবপথে ছন্দযাত্রার প্রয়াস প্রশমিত হয়নি। বস্তুত প্রাক্-'মানসী'-যুগে রবীন্দ্রনাথের ছন্দপরীক্ষণের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা এ-পুস্তকে প্রধানত তৎপরবর্তী যুগের ছন্দো-বিকাশের বিষয়ই আলোচনা করছি। যাহোক, 'মানসী'র যুগ থেকেই বিশেষ-ভাবে দেখতে পাই, প্রচলিত রীতির ছন্দের বন্ধনকে অস্বীকার করে কবির ছন্দ-প্রতিভার বহুমুখী ধারা যুগপৎ বহু বিচিত্র পথে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বস্তুত নবনব ছন্দ রচনা করা ও সঙ্গে-সঙ্গেই ছন্দের বাধাকে লঙ্ঘন করে যাবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে সমানভাবে জাগরূক ও সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে মুক্তক ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখতে পাই, 'সন্ধ্যাসংগীত'এই ও-ছন্দের প্রথম সূচনা দেখা দিয়েছে। ও-গ্রন্থেই কবি সার্থকভাবে ছন্দের বন্ধনমোচনের আনন্দ প্রথম অনুভব করেন ; এ-কথা 'জীবনস্মৃতি'তেই বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ-স্থলে ওই প্রাথমিক মুক্ত ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত উৎকলন করা অসংগত হবে না।

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধারসাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া।

যে সমুদ্রতলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী
চিরনির্বাপিতভাতি
শত মৃত তারকার মৃতদেহ রয়েছে শযান,
সেথায় সে করেছে পয়ান।
—সন্ধ্যাসংগীত, তারকার আত্মহত্যা

এটিকে পরবর্তী যুগের পূর্ণপরিণত মুক্তক ছন্দের আদিপ্রকাশ বলে অনায়াসেই গণ্য করা যায়। শুধু 'সন্ধ্যাসংগীত'এ নয়, 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গান'এও এই মুক্তকল্প ছন্দের বহু নিদর্শন রয়েছে। অবশেষে 'মানসী'তে দেখি ও-ছন্দ সুস্পষ্ট ভাবে মুক্তকের রূপ ধারণ করেছে। ও-গ্রন্থের 'নিষ্ফল কামনা'নামক চমৎকার কবিতাটি (১৮৮৭) বাংলা মুক্তক ছন্দের পূর্ণপ্রকাশের প্রথম নিদর্শন বলে ছান্দসিকদের কাছে বিশেষভাবে আদরণীয়। এখানে ওটি থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

যে-অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।
তাই চেয়ে আছি;
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,

বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তিব তলে
তোমারে কোথায় পাব,
তাই এ ক্রন্দন !

কি শক্তিশালী রচনা! বলা বাহুল্য, যথার্থ মুক্তক ছন্দের এই সুন্দর আদি-নিদর্শনটির পংক্তিপ্রান্তে কোনো মিল নেই ; অথচ মিলের অভাব কিছুমাত্র অনুভূত হচ্ছে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমগ্র 'মানসী'গ্রন্থে সমিল বা অমিল মুক্তক ছন্দের রচনা ওই একটি ছাড়া আর নেই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই কবিতাটিতে আশ্চর্যরূপ সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সাতাশ বৎসরের মধ্যে মুক্তক ছন্দে আব কোনো কবিতাই রচনা করেননি। অবশেষে 'বলাকা'র যুগে সমিল এবং 'পরিশেষ'এর যুগে অমিল মুক্তকের আবির্ভাব হল। বস্তুত এই কবিতাটিকেই পরবর্তী যুগের সমিল ও অমিল মুক্তক ছন্দের অগ্রদূত বলে গণ্য করা যেতে পারে। একটি বিষয়ে পরবর্তী মুক্তকের সঙ্গে এটির পার্থক্য আছে। পববর্তী কালে এ-ছন্দের পংক্তিপরিসরের পুরো মাপ হচ্ছে আঠার মাত্রা ; আর এটিব পূর্ণ পরিসর হচ্ছে চোদ্দ মাত্রা। ইংরেজিতেও এ-ধরনের অমিল মুক্তকের নিদর্শন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ Collinsএর Ode to Evening নামক কবিতাটির কথা উল্লেখ করতে পারি।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকগুলিতে বহুস্থলে একপ্রকার অমিল মুক্তক ছন্দের ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর এই বিশিষ্ট ছন্দটি 'নিষ্ফল কামনা'র পূর্বেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রযুক্ত বিশিষ্ট ছন্দটি 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' বা **'গৈরিশ'** ছন্দ নামে পরিচিত। গিরিশচন্দ্র এ ছন্দটি প্রথম ব্যবহার করেন 'রাবণবধ' নাটকে। এটি প্রথম অভিনীত হয় ১২৮৮ সালের শ্রাবণ মাসে। এই সালের মাঘসংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধ' নাটকদ্বয়ের ছন্দ সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশিত হয়।—"আমবা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই

যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকারশাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ-বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম"।[১] বলার ভঙ্গি এবং বিশেষভাবে 'ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি' এই উক্তি থেকে মনে হয় অভিমতটি সম্ভবত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই। মনে রাখতে হবে এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যাসংগীত'এর 'ভাঙা ছন্দ' নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পূর্বোক্ত 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি 'রাবণবধ'এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।[২] সম্ভবত সন্ধ্যাসংগীতের ভাঙা ছন্দ রচনায় গিরিশচন্দ্রের আদর্শে উৎসাহিত হয়েই বলা হয়েছে 'গিরিশবাবু এ-বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম'।

যাহোক, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গিরিশচন্দ্রের ছন্দ আর রবীন্দ্রনাথেব মুক্তক ছন্দ ঠিক সমজাতীয় নয়। ছন্দের পদবিভাগে ও যতিস্থাপনে ও-দুই ছন্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে; তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ছন্দে প্রবহমানতার দিকে ঝোঁক বেশি এবং গৈরিশ ছন্দ অপেক্ষাকৃত কম প্রবহমান, অনেক স্থলেই অনেকটা কাটাকাটা গোছের। এই পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট; পঠিতব্য কবিতা ও অভিনেতব্য নাট্যের প্রয়োজনেই এই ছন্দ দুজনের হাতে দুই রূপ ধারণ করেছে। অভিনয়সৌকর্যের জন্য গিরিশচন্দ্র প্রবহমান পয়ার অর্থাৎ সাধারণ 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দকে ভেঙে তার অসমান পদ-বিভাগগুলিকে অসমপংক্তিতে বিন্যস্ত করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁর রচনায় পংক্তির দীর্ঘতম পরিসর অধিকাংশ স্থলেই চোদ্দ মাত্রা অতিক্রম করে যায়নি; অর্থাৎ চোদ্দ মাত্রার অমিল প্রবাহমান পয়ারই ও-ছন্দের মূল আদর্শ। কিন্তু তা বলে ওর পদবিভাগগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করে চোদ্দ মাত্রার সমান পংক্তি রচনা করা সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মুক্তকের সঙ্গে এ-ছন্দের

১ ভারতী, ১২৮৮ মাঘ, পৃ ৪৮২।
২ ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭৭-৭৮।

সাদৃশ্য আছে, যদিও 'বলাকা'র সময় থেকে ওই মুক্তকের মূল আদর্শ আঠার মাত্রার দীর্ঘপয়ার। গৈরিশ মুক্তকের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ও-ছন্দ প্রধানত অমিল হলেও ওতে স্থানে স্থানে কিছু মিল দিয়ে ওর ধ্বনিপ্রবাহে বেশ একটু অভিনবত্বের আভাস দেওয়া হয়। তাছাড়া, ও-ছন্দের গঠনকৌশলে আরও বৈশিষ্ট্য আছে। গৈরিশ মুক্তক এবং রাবীন্দ্রিক মুক্তক, এই উভয়ের যথোচিত তুলনামূলক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে কাজ বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্যবহির্ভূত, সুতরাং আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

বাংলা নাটকে 'অমিত্রাক্ষর' বা অমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দেব সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন মধুসূদন তাঁর 'পদ্মাবতী'তে।[১] বস্তুত ওই গ্রন্থেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বপ্রথম প্রবর্তন হয়েছে বলে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে ও-বইখানি বিশেষভাবে স্মরণীয়। যাহোক, লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ও-গ্রন্থে মধুসূদন যদিও চোদ্দ মাত্রার পংক্তিকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন, তথাপি স্থানে স্থানে ওই আদর্শ রক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ ও-বইতেই অমিল মুক্তকের অতি ক্ষীণ সূচনা হয়েছে বলা যায়। মধুসূদন অতঃপর আর ছন্দোবদ্ধ নাটক রচনা করেননি; যদি করতেন তবে হয়তো গিরিশচন্দ্রের পূর্বে তিনিই নাট্য-সুলভ মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন করে যেতেন। এ কথা মনে করবার একটু হেতু আছে। সেটি এই যে, কবিতার ক্ষেত্রে মধুসূদন সত্যই মুক্তকল্প ছন্দের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর নীতিগর্ভ কবিতাবলীতে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এ-স্থলে তার থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

গদা সদা নামে
কোনো এক গ্রামে
ছিল দুই জন।

১ গ্রন্থহিসাবে 'পদ্মাবতী'তেই (১৮৬০ এপ্রিল) সর্বপ্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু আসলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্তিত হয় 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে। এই কাব্যের প্রথম দুই সর্গ ১৭৮১ শকাব্দার (১৮৫৯ ইং) শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা 'বিবিধার্থসংগ্রহে' মুদ্রিত হয়। কাব্যখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'পদ্মাবতী'র অল্প পরে ১৮৬০ সালের মে মাসে।

দূর দেশে যাইতে হইল ;
দুজনে চলিল।…
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,
"শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি
জিষ্ণু রথিপতি
জিনি লক্ষ রাজে শূব কৃষ্ণায় লভিল,
মার চোরে করি রণলীলা।"

—গদা ও সদা

এটিকে সমিল মুক্তকের পূর্বাভাস বলে অনায়াসেই স্বীকার করা যায়। কিন্তু মধুসূদন এ-ছন্দটিকে পরিণতি দান করার সুযোগ পাননি এবং তৎকালে এটি কাব্যরচনার রীতি বলেও গৃহীত হয়নি। সুতরাং নাট্য ও কাব্যের ক্ষেত্রে মুক্তক ছন্দ প্রবর্তনের কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য।

বলা প্রয়োজন যে, ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা মুক্তক ছন্দ প্রবর্তনের আরও দাবিদার আছেন। কবি রাজকৃষ্ণ রায় 'হরধনুর্ভঙ্গ' (১২৮৮) প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকে এই ছন্দ ব্যবহার করেন। তারও পূর্বে তিনি 'নিভৃত নিবাস' (১২৮৫) কাব্যের কিছু অংশ 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' (এই নামটি তাঁরই ব্যবহৃত) ছন্দে রচনা করেছিলেন। এই কাব্যে সমিল মুক্তক ছন্দের নিদর্শনও আছে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়কে সমিল বা অমিল মুক্তকের প্রবর্তক বলে স্বীকার করা যায় না। সমিল মুক্তকের সূচনা হয়েছিল মধুসূদনের হাতে। আর ব্রজমোহন রায়ের 'দানব বিজয়' (১২৮২ সালের পূর্বে রচিত) নাটকে অমিল মুক্তক বা ভাঙা অমিত্রাক্ষরের

দৃষ্টান্ত দেখা যায়।[১] তারও বহুপূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ এ ছন্দের ব্যবহার করেন। তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' দ্বিতীয় ভাগের (১৮৬২) প্রথমেই অসমপংক্তিক অমিত্র। ছন্দের একটি কবিতা আছে।

হে সজ্জন ! স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্যরসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র— দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপা চক্ষে হের একবার ; শেষে বিবেচনামতে
যার যা অধিক আছে তিরস্কার কিংবা পুরস্কার
দিও তাহা মোরে— বহু মানে লব শির পাতি।

গিরিশচন্দ্র এই রচনাটি দেখেই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রেরণা লাভ করেছিলেন।[২] সুতরাং গৈরিশ ছন্দও আসলে গিরিশচন্দ্রের ছন্দ নয়। কালীপ্রসন্ন সিংহকেই অসমপংক্তিক প্রবহমান ছন্দের আদিস্রষ্টা বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এ-ছন্দকে ব্যাপকভাবে প্রচলন করার গৌরবের অধিকারী গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, তাতে সন্দেহ নেই।

২৮

যৌগিক রীতিতে যত রকম ছন্দোবন্ধ রচনা করা যায় স্বরবৃত্তেও সে-সমস্তকেই অনায়াসে চালানো সম্ভব, এ-সত্যটিও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই প্রতিপন্ন হয়েছে। যৌগিকরীতির দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বহু ছন্দোবন্ধকেই তিনি অতি চমৎকারভাবে স্বরবৃত্তে রূপান্তরিত করেছেন। দৃষ্টান্তযোগে বিষয়টা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু তৎপূর্বে বলা উচিত যে, প্রচলিত কথায় যাকে বলা হয় 'পয়ার', ছন্দের পরিভাষায় তাকেই বলেছি

১ সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪৫, ৩৫০, ৩৫৪।

২ অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র', পৃ ২২৯ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত কালীপ্রসন্নের কবিতাটি এবং 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' পুস্তকে মুদিত কবিতাটির মধ্যে কয়েক স্থলে পংক্তিবিন্যাসগত এবং একস্থলে ভাষাগত কিছু পার্থক্য আছে। আমরা শেষোক্ত পাঠই অনুসরণ করলাম। এই পাঠভেদ সম্বন্ধে শেষোক্ত গ্রন্থে প্রকাশকের নিবেদন দ্রষ্টব্য।

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত ধ্বনির প্রবাহকেই বলি 'পদ'; সাধারণত দুই বা দেড় পর্বে এবং কখনও কখনও আড়াই পর্বে এক পদ হয়। প্রতিপদে চার মাত্রা। সুতরাং ছয়, আট বা দশ মাত্রায় এক পদ গ[illegible] [illegible]। লঘুপয়ারে চোদ্দ মাত্রা; তার প্রথম আট মাত্রায় এক পদ ও পরের ছয় মাত্রায় আরেক পদ। সুতরাং তাকে বলা যায় লঘুদ্বিপদী। দীর্ঘপয়ার বা দীর্ঘদ্বিপদীতে আঠার মাত্রা; প্রথম পদে আট মাত্রা, দ্বিতীয় পদে দশ মাত্রা। এবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

স্বরবৃত্ত লঘুপয়ার = আট + ছয় সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনি :

> সেদিন ওরা। পড়াশুনোয় ॥ মন কি দিতে। পারে,
> সেদিন ছুটির। মাতন লাগায় ॥ অজয়নদীর। ধারে।
> তার পরে সব শান্ত হলে ফেরে আপন দেশে,
> মা তাহাদের বকুনি দেয়, গল্প শোনায় শেষে।
>
> —গল্পসল্প, রাজার বাড়ি

স্বরবৃত্ত দীর্ঘপয়ার = আট + দশ ধ্বনি :

> বছর বিশেক চলে গেল ॥ সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা;
> নন্দ বললে, "দাদা মশায়, ॥ কী লিখেছ শোনাও তো এই বেলা।"...
> খাতা নিতে হাত বাড়াল, চাদরেতে দিলেন তাহা ঢাকা,
> কইনু তারে, "দেখ্‌ তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয় কাকা।"
>
> —পরিশেষ, নূতন শ্রোতা

ছয়-ছয়-আট মাত্রার ছন্দোবন্ধ লঘুত্রিপদী নামে পরিচিত। সেকালে যৌগিক রীতিতে এই ছন্দোবন্ধ রচিত হত। কিন্তু যৌগিক লঘুত্রিপদী সুশ্রাব্য হয় না বলে রবীন্দ্রনাথ এটিকে মাত্রাবৃত্তের এলাকায় স্থানান্তরিত করেছেন। সুতরাং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যৌগিকরীতির লঘুত্রিপদী রচিত হয় না। স্বরবৃত্তেও লঘুত্রিপদী হয় না। আট-আট-দশ মাত্রার ছন্দোবন্ধের নাম দীর্ঘত্রিপদী।

যৌগিক রীতির দীর্ঘত্রিপদী সুপরিচিত। স্বরবৃত্ত রীতির দীর্ঘত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দিলাম।

আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
বলাকা দল যাচ্ছে উড়ে
জানিনে কোন্ দূরসমুদ্র-পারে!
সজল বায়ু উদাস ছুটে
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
পথবিহীন গহন অন্ধকারে।

—উৎসর্গ, ৩৬

যৌগিক রীতিতে লঘুচৌপদী চলে না তাই স্বরবৃত্তেও চলে না। আট-আট-আট-ছয় ধ্বনির একটি স্বরবৃত্ত দীর্ঘচৌপদীর দৃষ্টান্ত দিলাম।

দুয়ার জুড়ে কাঙালবেশে
ছায়ার মতো চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রৈব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

—ক্ষণিকা, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

দেখা গেল যৌগিক রীতির সকল ছন্দোবন্ধকেই স্বরবৃত্তে রূপান্তরিত করা চলে। সুতরাং আশা করা যায় 'বসুন্ধরা', 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ অঙ্গের সমায়তন প্রবহমান ছন্দের কবিতাও স্বরবৃত্ত রীতিতে রচনা করা সম্ভব। কিন্তু স্বরবৃত্ত প্রবহমান পয়ার ছন্দের কবিতা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে। Paradise Lost প্রভৃতির ন্যায় মহাকাব্য যখন ইংরেজি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচনা করা সম্ভব হয়েছে, তখন বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দকেও ও-রকম মহাকাব্য-জাতীয় কবিতার বাহন করা অসম্ভব নয়। ইংরেজি ছন্দ ও বাংলা স্বরবৃত্ত

ছন্দের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে এ-তথ্যটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের জানিয়েছেন, "বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি, এইজন্য ধ্বনি-হিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি"।[১] স্বরবৃত্ত ছন্দে ওই ধরনের কাব্যরচনার বাধা কবে দূর হবে। অর্থাৎ স্বরবৃত্তকে কবে 'মেঘনাদবধ'এর মতো কাব্যের বাহন করা সম্ভব হবে জানিনে— এই কথাগুলি আমি বলেছিলাম ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে।[২] সুখের বিষয় তার বছর-কয়েক পরেই (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই এ-কথার সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেছেন, "এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস।...এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত, সে-কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমনভাবে আরম্ভ করা যেত,

> যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
> বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
> যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
> অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে
> কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
> রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে, এ-কথা মানব না"।[৩] দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যে প্রবহমান স্বরবৃত্ত পয়ার ছন্দের রচনা বেশি নেই। যা-কিছু আছে তার সূত্রপাতও করেছেন রবীন্দ্রনাথই। তাঁর রচনায় একটিমাত্র প্রবহমান স্বরবৃত্ত পয়ারের দৃষ্টান্ত পেয়েছি। সেটি হচ্ছে 'পলাতকা'কাব্যের (১৯১৮) 'শেষগান' নামক কবিতাটি।[৪] কিন্তু তার পরে তিনি প্রবহমান স্বরবৃত্ত

১ সবুজপত্র, ১৩২১ শ্রাবণ, পৃ ২৩৫।

২ প্রবাসী, ১৩২৯ ফাল্গুন, পৃ ৬১৬-১৭।

৩ ছন্দ, পৃ ৫২-৫৪।

৪ রচনার তারিখ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪। প্রথম প্রকাশ: সবুজপত্র, ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ। সবুজপত্রের পাঠে এবং পলাতকার পাঠে পার্থক্য আছে।

য়ার ছন্দে আর কোনো কবিতা রচনা করেছেন বলে মনে হয় না। পরবর্তী ালে এই কবিতাটি কিছু পরিবর্তিত আকারে ও 'পূরবী' নামে 'পূরবী'কাব্যের ১৯২৫) প্রথমেই স্থান পেয়েছে। যাহোক, উক্ত 'শেষগান' কবিতাটি থেকে কটু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

> যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
> আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদাকালো
> যাদের আলোকছায়ার লীলা, মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
> তাদের প্রাণের ঝরনাস্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা
> চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয়তো কেবল কালের যোগে আয়ু,
> নয় সে কেবল দিনরজনীর সাতনলী হার, নয় সে নিশাসবায়ু।···
> একের বাঁচন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
> বহুদূরে ; নিমেষগুলি ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।
> অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে,
> গর্ভবাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
> বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
> একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
> আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শুষ্ক জীবন মম
> শীর্ণ রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
> শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্তসলিল স্রস্ত অবহেলায়।

টি হচ্ছে আঠার সিলেব্‌ল্‌এর প্রবহমান স্বরবৃত্ত পয়ার। এর পূর্ববর্তী াস্তটি চোদ্দ সিলেব্‌ল্‌এর। সত্যেন্দ্রনাথও চোদ্দ এবং আঠার সিলেব্‌ল্‌এর বহমান ছন্দে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। বাংলা ছন্দের এ-বিভাগটিতে আরও ীক্ষণের প্রয়োজন আছে ; কেননা এদিকে বাংলা ছন্দের যথেষ্ট বিকাশ-ম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যে স্বরবৃত্তরীতির পয়ার ছন্দে প্রবহমান কবিতার দৃষ্টান্ত খুব

বিরল হলেও ও-রীতিতে যে খুব চমৎকার মুক্তক ছন্দ রচনা করা যায় তা-ও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। 'সবুজপত্রে'র যুগেই তিনি এ-তত্ত্বটিকে উদ্‌ঘাটিত করেন। 'বলাকা'র ছন্দ বলতে সাধারণত যৌগিক মুক্তক ছন্দের কথাই বোঝায়, কিন্তু ওই কাব্যখানিতে যে স্বরবৃত্ত ছন্দেরও প্রথম মুক্তি ঘটেছিল সে-কথাটা বিস্মৃত হবার আশঙ্কা থাকে। বস্তুত যৌগিক ও স্বরবৃত্ত এই উভয় রীতিতেই বাহ্য নিয়মের বন্ধন থেকে ছন্দকে মুক্তিদানের জন্যে ওই কাব্যখানি স্মরণীয়। বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে নবযুগসূচনার হিসাবে 'বলাকা'কে 'মানসী' ও 'ক্ষণিকা'র সঙ্গে একাসনে স্থান দিতে হয়। যাহোক, এবার 'বলাকা' থেকে স্বরবৃত্ত মুক্তক ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাগুনদিনের কাল
দখিন হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,
সে-বারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবনলতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।
—বলাকা, ২৬

স্বরবৃত্ত মুক্তক ছন্দের ইতিহাসে 'পলাতকা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা 'বলাকা'য় ও-ছন্দের আবির্ভাব হলেও 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতেই স্বরবৃত্ত মুক্তকের অন্তর্নিহিত শক্তির চরম বিকাশ হয়েছে। এ-বই থেকেও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে,

থামল তাহার হাস্যউছল বাণী,
থামল তাহার নৃত্যনূপুর ঝরঝরানি,
সূর্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্তব্ধ হল এক নিমেষে,
বিজু যখন গেল চলে মরণপারের দেশে
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।...
সমুদ্রঢেউ যেমন বাঁধন টুটে
ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জে ছুটে
ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কূলে কূলে দুলে দুলে পড়ে লুটে লুটে
ধরার বক্ষতলে,
দুরন্ত তার দুষ্টুমিটি তেমনি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার করে
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভরে।
—পলাতকা, ভোলা

চলতি বাংলার লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দে কতখানি শক্তি সঞ্চার করা যেতে পারে তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে এই দৃষ্টান্তটি থেকে। একটি পংক্তি আঠার সিলেব্‌ল্‌এর সীমা অতিক্রম করে গেছে, তা লক্ষ্য করার যোগ্য। বলা বাহুল্য স্বরবৃত্ত মুক্তকের গঠনপ্রণালী সর্বতোভাবে যৌগিক মুক্তকেরই মতো; এক্ষেত্রে শুধু স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষ নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়। সুতরাং এবিষয়ে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শুধু সমিল মুক্তক নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যে অমিল স্বরবৃত্ত মুক্তকের দৃষ্টান্তও আছে। এই প্রসঙ্গে 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের 'ছুটি', 'গানের বাসা' ও 'পয়লা আশ্বিন' নামক শেষ তিনটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ছুটি' কবিতাটিই বোধ করি বাংলা সাহিত্যে অমিল স্বরবৃত্ত মুক্তক ছন্দের প্রথম রচনা। এই নূতন রীতির মুক্তকের নমুনাস্বরূপ এস্থলে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগ আমার মন,
গান জাগিয়ে চল সমুখ পথে,
যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নব সূর্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্তঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আন,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,
লালসাকে দল পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।

—পুনশ্চ, পয়লা আশ্বিন

পরবর্তী কালের রবীন্দ্রসাহিত্যে আরও তিনটি অমিল স্বরবৃত্ত মুক্তক ছন্দের রচনা লক্ষ্য করেছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'জন্মদিনে'র অন্তর্গত চব্বিশসংখ্যক কবিতাটি (১৯৩৯ ফেব্রুয়ারি), আর বাকি দুটি 'সানাই'কাব্যের অন্তর্গত 'বাসা-বদল' (তারিখ নেই) এবং 'পরিচয়' (১৯৩৯ জুন)। রবীন্দ্রনাথের ছন্দো-বিকাশের অন্যতম শেষনিদর্শন বলে এগুলি থেকেও কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম।

ছেড়েফেলা শাড়িগুলো
নানা দিনের নিমন্ত্রণের
ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরে।
সেগুলো সব বিছিয়ে দিয়ে চেপে চেপে
পাট করতে অবিনাশের যে সময়টা গেল
নেহাত সেটা বেশি।...

মোটরগাড়ির চেনা শব্দ কখন দূরে মিলিয়ে গেছে
সাড়ে দশটা বেলায়
পেরিয়ে গিয়ে হাজরা রোডের মোড়।
উজাড় হল ঘর,
দেয়ালগুলো অবুঝপারা তাকিয়ে থাকে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে
যেখানে কেউ নেই।

—সানাই, বাসাবদল

অচিন কবি, তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যেত একটি ছায়াছবি,
স্বপ্নঘোড়ায় চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরে,
রাজপুত্র তুমি যে রূপকথার।···
আমার মায়ার জালটা ছিঁড়ে অবশেষে আমায় বাঁচালে যে;
আবার সেই তো দেখতে পেলেম
আজো তোমার স্বপ্নঘোড়ায় চড়া
নিত্যকালের সন্ধান সেই মানসসুন্দরীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরের মাঠে।

—সানাই, পরিচয়

'সানাই'এর 'পরিচয়' নামক কবিতাটিতে অমিল স্বরবৃত্ত মুক্তক রচনার দক্ষতা যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে, স্বীকার করতে হবে বাংলা ছন্দ-পরিণতির ইতিহাসে তার মূল্য খুবই বেশি।

২৯

যৌগিক এবং স্বরবৃত্তের মতো মাত্রাবৃত্ত রীতিতেও দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি সকল প্রকার ছন্দোবদ্ধ রচনা করাই সম্ভবপর। চতুর্মাত্রক এবং পঞ্চমাত্রক পর্বের সম্বন্ধে এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ষন্মাত্রক পর্বের

কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে ; তাই ও-রকম পর্বের ছন্দেও দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধ রচনা করা গেলেও ওগুলিকে যৌগিক বা স্বরবৃত্ত বন্ধগুলির ঠিক অনুরূপ বলা যায় না। সপ্তমাত্রক পর্বের পক্ষেও এ-কথা সমভাবে খাটে। দৃষ্টান্ত-যোগে এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন।

মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে
কবিরা শুনেছি তার রাস্তাটা জানে।
তাদের ম্যাজিকগুলা খ্যাপা পদ্যের
দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।

—গল্পসল্প, ম্যাজিসিয়ান

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন অর্ঘ্য ভারে ভারে।···
সবাই বড়ো হইলে তবে স্বদেশ বড়ো হবে ;
যে-কাজে মোরা লাগাব হাত সিদ্ধ হবে তবে।

—মানসী, দেশের উন্নতি

এ দুটিকে আমরা যথাক্রমে চতুর্মাত্রপর্বিক ও পঞ্চমাত্রপর্বিক দ্বিপদী বলে অভিহিত করতে পারি। এবার ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নামল,
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থামল।···
এতদিনে জানলেম
যে কাঁদন কাঁদলেম
সে কাহার জন্য।

ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য।
—গীতালি, ১

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণসাঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি,
গন্ধ তারি স্বপ্নসম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি।
—বীথিকা, পাঠিকা

ছন্দভাঙা হাটের মাঝে
তরল তালে নূপুর বাজে,
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে।
কর্কশেরে নৃত্য হানি
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।
—বীথিকা, ছন্দোমাধুরী

এবার যথাক্রমে চতুর্মাত্রপর্বিক ও পঞ্চমাত্রপর্বিক চৌপদীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি

নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো-হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে
উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।

তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে
মগজেতে আসিয়া।
—খাপছাড়া, উৎসর্গপত্র

কলসঘায়ে উর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু।···
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে ঢাকা
বিজন ফুলবনে।
—মানসী, অপেক্ষা

এবার যথাক্রমে ষণ্মাত্রপর্বিক দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া,
দুর্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া।
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে।
—প্রহাসিনী, নারীপ্রগতি

এটি বস্তুত দ্বিপর্বিক ছন্দ। এবার ষণ্মাত্রপর্বিক ত্রিপদী ও চৌপদীর সমবায়ে গঠিত শ্লোকবন্ধ বা স্ট্যাঞ্জা উদ্ধৃত করছি।

সংগীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে,

চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিলে আমার সঙ্গে।
চক্ষে তোমার উদিত রবির
বন্দনবাণী নীরব গভীর,
অস্তাচলের করুণ কবির
ছন্দ বসনভঙ্গে।
উষারুণ হতে রাঙা গোধূলির
দূরদিগন্ত পানে
বিভাসের গান হল অবসান
বিধুর পূরবীতানে॥
— পরিশেষ, তুমি

এই ত্রিপদীটি বস্তুত লঘুত্রিপদী। পক্ষান্তরে চৌপদীটি দীর্ঘ। এ বিষয় নিয়ে বহু আলোচনার অবকাশ আছে; কিন্তু আমাদের পক্ষে তা নিষ্প্রয়োজন। বাহুল্য-বোধে সপ্তমাত্রক পর্বের বিবিধ ছন্দোবন্ধের আলোচনায় বিরত হলাম। বলা বাহুল্য, উক্তপ্রকার বন্ধগুলি ছাড়া আরও বহু বন্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এবং কতকটা অনাবশ্যক বলে ওগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম না।

৩০

কিন্তু মাত্রাবৃত্ত মুক্তক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। যৌগিক ও লৌকিক রীতির মতো মাত্রিক রীতিতেও মুক্তক ছন্দোবন্ধ রচনা করা যায় কি না, এ বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ সংশয় রয়েছে; কারণ মাত্রাবৃত্তের ধ্বনিবিস্তার-প্রবণতা মুক্তক ছন্দের দৃঢ় গতিভঙ্গি ও আংশিক গদ্যপ্রকৃতির অনুকূল নয়। কিন্তু চতুর্মাত্র ও পঞ্চমাত্র-পর্বিক ছন্দে বিস্তারের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত কম এবং ও-দুটিকে যথাক্রমে চতুর্মাত্রপর্বিক যৌগিক ও চতুঃস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দের নিকটতম মাত্রিক

প্রতিরূপ বলে গণ্য করা যায়। সুতরাং চতুর্মাত্রক ও পঞ্চমাত্রক পর্বের ভিত্তিতে মুক্তক ছন্দ রচনা একেবারে অসম্ভব নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উদ্‌ভাবনী প্রতিভার কাছে এ বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়নি। চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দে তিনটি মুক্তক রচনা আমি লক্ষ্য করেছি। একটি আছে 'বীথিকা'য়, নাম 'আদিতম' (১৯৩৪); বাকি দুটি 'নবজাতক'এর অন্তর্গত, 'শেষবেলা' (১৯৪০ জানুয়ারি) এবং 'রাতের গাড়ি' (১৯৪০ মার্চ)। এ-ধরনের ছন্দ বাংলা সাহিত্যে অভিনব বলে তিনটি থেকেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক্ স্থলে জলে
শুনি আদি ওঙ্কার
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

—বীথিকা, আদিতম

ঋতুতে ঋতুতে
আকাশের উৎসব দূতে
এনে দিত পল্লব-পল্লীতে তার
কখনো পা-টিপে চলা হালকা হাওয়ার,
কখনো বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।···
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পুরে
সদয় অতীত কিছু দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।

—নবজাতক, শেষবেলা

ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়।···
নামহীন যে অচেনা বার বার পার হয়ে যায়
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,
তারি যেন বহে নিশ্বাস,
সন্দেহ আড়ালেতে মুখঢাকা জাগে বিশ্বাস।
--নবজাতক, রাতের গাড়ি

চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দে সাধারণত একটু চপল দ্রুতগতির আভাস থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি কবিতায় (বিশেষত 'শেষবেলা'তে) ওই চাপল্যকে সংযত করে চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দেও কি ভাবে মন্থরগতির গাম্ভীর্য সঞ্চার করেছেন, তা সত্যই ঔৎসুক্য ও বিস্ময়ের বিষয়। এ-স্থলে বলে রাখা ভালো যে, 'খাপছাড়া'গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের কবিতাটিতেও চতুর্মাত্রপর্বিক মুক্তকের কতকটা আভাস আছে, বিশেষত তার প্রথম অংশে; শেষাংশে মুক্তক ভঙ্গি রক্ষিত হয়নি।

চতুর্মাত্রকের চেয়ে পঞ্চমাত্রক পর্বের ছন্দে মুক্তক রচনা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমাদের পক্ষে ওই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, পাঁচ মাত্রার ছন্দে যুক্তপর্ব রচনা করা যায় না এবং প্রতিপর্বের অন্তর্গত উপযতিটি অবশ্যস্বীকার্য বলে এ-ছন্দ রচনায় স্বাধীনতা কম। 'মহুয়া'র 'সাগরিকা' কবিতাটিতে মুক্তক ছন্দের একটু আভাস পাওয়া যায়। এটির পংক্তিদৈর্ঘ্যের কোনো স্থিরতা নেই, এ-বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এ-কবিতাটির ভাব দুটি পংক্তির মধ্যেই আবদ্ধ আছে, পংক্তি লঙ্ঘন করে প্রবাহিত হয়নি। সুতরাং এ-ছন্দটিকে খাঁটি মুক্তক বলা যায় না। শুধু পূর্ণ পংক্তি ও নানা রকমের খণ্ডিত পংক্তির যোগে যে ছন্দ হয়, তাকে বলা যায় 'অসমপংক্তিক'; বড় জোর মুক্তকল্পও

বলা যেতে পারে। কিন্তু 'মুক্তক' বলা যায় না। 'সাগরিকা' থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।

দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীত কলিতকল্লোলে।

এখানে মুক্তকের একটু আভাস এসেছে। 'বীথিকা'র 'রাতের দান' কবিতাটিতে মুক্তকের ভঙ্গি আরও একটু ফুটেছে। যথা

অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায়ে তোলে সে যে—
দিনের অতি নিঠুর খর তেজে
যে ফুল ফুটিল না,
যাহার মধুকণা
বনভূমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল বলে
গিয়েছে কবে আকাশপথে চলে
তোমার উপবনের মৌমাছি
কৃপণ বন-বীথিকাতলে বৃথা করুণা যাচি।

ছয় মাত্রার পর্ব নিয়ে যথার্থ মুক্তক ছন্দ রচনা করা বোধ করি সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দে সুরের প্রাধান্য; দ্বিতীয় কারণ ও-ছন্দে বিভিন্ন আয়তনের যুক্তপর্ব বা পদ রচনা করা যায় না। আর যথার্থ মুক্তক ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল তার গদ্যসুলভ সংযত ধ্বনি এবং নানা আয়তনের পদবিভাগের বৈচিত্র্য। এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক। তথাপি নানা আয়তনের পংক্তিসমন্বয়ের দ্বারা এ-ছন্দেও অনেকখানি বৈচিত্র্য ও কিছুপরিমাণে মুক্তকের আভাস আনা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই তার প্রমাণ পাই। তার দৃষ্টান্ত দেবার পূর্বে এ-ছন্দের একটি খাঁটি প্রবহমান রূপের পরিচয় দেওয়া দরকার।

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি 'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।

—সেঁজুতি, যাবার মুখে

এটি বাস্তবিকই একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত; এ-রকম দ্বিতীয় আর-একটি দৃষ্টান্তও চোখে পড়েনি। এর প্রথম ছটি লাইন সত্যিই প্রবহমান, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় এরা যেন গড়িয়েই চলেছে, কোথাও থামতে পারছে না। অর্থাৎ কোথাও অর্ধযতি নেই বলে ওর ধ্বনিটা এমন গতিশীল হয়ে উঠেছে। বস্তুত এ-ছন্দটিকে প্রবহমান না বলে ধাবমান বলাই অধিকতর সংগত। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ওর প্রথম ছটি লাইন আসলে একটি দশ পর্বের বিরাট্ পংক্তি; কোথাও অর্ধযতির ছেদ নেই। তাই ওটি রেল-গাড়ির মতো ছুটে চলেছে। কিন্তু যদি লাইনের শেষে অবস্থিত কয়েকটি 'যাহা' ও 'চোরা' শব্দকে 'অতিপর্ব' বলে মনে করা যায়, তবে এর ধ্বনিটাতে একটা নূতন রকমের বৈচিত্র্য দেখা দেবে এবং তখন তাকে একটি নূতন রীতির মুক্তক বলেও গণ্য করা যাবে। ওই 'যাবার মুখে' কবিতাটি থেকেই আরও কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি।

টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের সুরহারা তার,
শিখা নিবে যাওয়া বাতি,
স্বপ্নশেষের ক্লান্তি-বোঝাই রাতি;—

নিয়ে যাক যত দিনে দিনে জমা-করা
প্রবঞ্চনায় ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।…
নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই
সকল কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়
মন ভোলাবার অকারণ গানে কাজ ভোলাবার খেলায়।

ষণ্মাত্রক পর্বের ছন্দ এখানে যতটা মুক্ত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি মুক্ত কোথাও হয়েছে বলে মনে হয় না এবং সম্ভবত এর চেয়ে বেশি মুক্ত হতে পারেও না। অধিকাংশ স্থলেই এ-ছন্দ পূর্ণ ও খণ্ডিত পংক্তির সমবায়ে অসমপংক্তিক রূপ ধারণ করে মাত্র, যথার্থ মুক্তক বা প্রবহমান হয় না। বলা প্রয়োজন যে, 'পরিশেষ'এর সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অসমায়তন ভঙ্গির প্রবর্তন করেন। আর, তিনি সর্বদাই এ-ছন্দকে সমিল রূপেই রচনা করেন। একটি-মাত্র অমিল রচনা আমার চোখে পড়েছে। তার থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি; কেননা এ-ধরনটি অভিনব বলে বিশেষ ঔৎসুক্যকর।

আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী মসির তুলিকায়
অতীত দিনের বিদ্রূপবাণী
রেখায় রেখায় মুছে মুছে দিক
স্মৃতির পত্র হতে,
থেমে যাক ওর বেদনার গুঞ্জন
সুপ্ত পাখির স্তব্ধ নীড়ের মতো।
—সানাই, ব্যথিতা

এখানে ছয় মাত্রার ছন্দ যে শুধু অমিল হয়েছে তা নয়, যথার্থ মুক্তকের রূপও ধারণ করেছে। তা ছাড়া, যে ছয় মাত্রার ছন্দ বাংলা গীতিকবিতার প্রধানতম বাহন সেই ছয় মাত্রার ছন্দই কি-ভাবে তার সুরের খেলা ও গীতিবিলাস পরিহার করে এখানে গভীর ভাবের গম্ভীর ধ্বনিকে অবলীলাক্রমে বহন করছে, তাই লক্ষ্য করার যোগ্য।

সাধারণ কবিতায় সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দের ব্যবহার অত্যন্ত কম। তাই ও-ছন্দের বন্ধ নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা হয়নি। সুতরাং ও-ছন্দে মুক্তক রচনার চেষ্টাও হয়নি এবং বোধ করি তা সম্ভবও নয়।

৩১

আমরা রবীন্দ্রনাথের ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতিগত কয়েকটি মূলনীতি এবং বাহ্য-আকৃতিগত কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্যের বিষয়ই মাত্র আলোচনা করলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁর ছন্দোবন্ধের অজস্র বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বহু বক্তব্য বাকি রয়েছে। এস্থলে রবীন্দ্রছন্দের একটি প্রধান লক্ষণের কথা বলা দরকার। অতি অল্প বয়স থেকে বরাবর তাঁর একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল, ছন্দ যেন কোনো ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে না পড়ে; ছন্দ একঘেয়ে হয়ে পড়লে তার যে প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকের রসবোধকে সদাজাগরূক করে রাখা তাই ব্যর্থ হয়ে যায়, এটা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। একথা তিনি বহু প্রবন্ধেও বলেছেন। একবার আমাকে তিনি ও-বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করে দিয়েছিলেন। ইংরেজি শব্দের বিচিত্র রকমের প্রাস্বরিক পদ্ধতি ও-ভাষার ছন্দকে কখনও ঝিমিয়ে পড়তে দেয় না। সংস্কৃত ভাষার হ্রস্বদীর্ঘ ধ্বনি ও-ভাষার ছন্দকে সব সময়ই তরঙ্গিত করে রাখে। তা ছাড়া, সংস্কৃত ছন্দের অসমান যতিবিভাগ ও-ছন্দকে সর্বদাই একঘেয়ে হয়ে পড়ার বিপদ্ থেকে রক্ষা করে। এই উপলক্ষ্যে তিনি শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তা ছন্দের অসমান যতি-বিভাগের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক, বাংলায় ইংরেজির মতো বিচিত্র প্রস্বরব্যবস্থা নেই; তাই অতিপর্বব্যবহার ও অন্যান্য উপায়ে

তার অভাবপূরণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা-সত্ত্বেও প্রস্বরবৈচিত্র্যের অভাবটা বাংলা ছন্দকে একদিক্ থেকে দুর্বল করেই রেখেছে। সংস্কৃতের মতো হ্রস্বদীর্ঘ ধ্বনিপ্রয়োগের চেষ্টাও বহু পূর্বেই ব্যর্থ হয়েছে। তাই বাংলা ছন্দের একঘেয়ে ভাবটা দূর করে পাঠকের কান তথা চিত্তকে সর্বদা সজাগ রাখার উদ্দেশ্যে মধুসূদন গুরুগম্ভীর আওয়াজের বহু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাংলায় আমদানি করেছিলেন। মধুসূদনের আতিশয্যটা বর্জিত হলেও তাঁর নীতিটা আজ পর্যন্ত কবিসমাজে স্বীকৃত হয়ে আসছে। সংস্কৃতের ন্যায় অসমান যতিবিভাগ বাংলায় চলে না। বাংলার ছন্দ হচ্ছে পর্বাত্মক, আর সাধারণত একই ছন্দে বিভিন্ন আয়তনের পর্ব ব্যবহৃত হয় না; তাই ছন্দ একঘেয়ে হয়ে পড়ার আশঙ্কা খুবই বেশি। এদিক্ থেকে বাংলা ছন্দকে বিচিত্র করে তোলার জন্যে রবীন্দ্রনাথের আজীবন অক্লান্ত সাধনার কথা ভাবলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমত যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রকতা স্বীকার করে নিয়ে এবং ঘনঘন যুগ্মধ্বনির ব্যবহারের দ্বারা বাংলার নিস্তরঙ্গ ছন্দেও অপ্রত্যাশিতরূপে তরঙ্গ-লীলার সঞ্চার করলেন, তারই ফলে বাংলা ছন্দের বহুশাখায়িত নব্যমাত্রাবৃত্ত বিভাগটির উদ্ভব হয়েছে (পৃ ৯)। শুধু এই একটি মাত্র কীর্তির জন্যেই কোনো কবি সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, ওই একই উদ্দেশ্যে তিনি যুগ্মধ্বনিবহুল চলতি বাংলার "অকৃতবেশ অসংস্কৃতা" ছড়ার প্রাস্বরিক ছন্দটিকেও লোকসাহিত্যের অজ্ঞাত অখ্যাত গৃহকো থেকে উদ্ধার করে সুমার্জিতরূপে সুসংস্কৃতবেশে ভদ্রসাহিত্যের আসরে সমুপস্থাপি করেছেন। আজ ওই হসন্তধ্বনি ও প্রস্বরের যুগ্মনূপুরধাবিণী লৌকিক ছন্দটি নৃত্যধ্বনিতে বাংলা ভদ্রসাহিত্যের সভাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথে এ কীর্তিও ছন্দোবিকাশের ইতিহাসে অনতিক্রমণীয়, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

তৃতীয়ত, বাংলা ভাষার একঘেয়ে ছন্দে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ নানাবিধ বন্ধের আশ্রয় নিয়েছেন। পর্বের আয়তনগত বৈচিত্র্য তে

তিনিই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাংলা ছন্দের একটা মুশকিল এই যে, একই রচনায় বিবিধ আয়তনের পর্বের ব্যবহার সাধারণত চলে না; তাই একই ধরনের পর্বের পুনঃপুনঃ ব্যবহারের একঘেয়েমি দূর করার উদ্দেশ্যে বিচিত্র রকম পর্ব-সমাবেশ ও পদসংস্থানরীতির আশ্রয় নিতে হয় এবং নানা আয়তনের পংক্তিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করতে হয়। পর্ব- পদ- ও পংক্তিসমাবেশের বিভিন্ন রীতিকেই আমি **বন্ধ** নামে অভিহিত করেছি। সংস্কৃত ছন্দে অসমান যতিবিভাগের ফলে যে বৈচিত্র্য দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথ নানারকম বন্ধের সাহায্যেই সে-জাতীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বাংলা ছন্দে তিনি যে কত অসংখ্য ভঙ্গিতে পর্ববন্ধ, পদবন্ধ ও পংক্তিবন্ধ, এককথায় কত অদ্ভুতরকমের ছন্দোবন্ধ, রচনার রীতি প্রবর্তন করেছেন, সেকথার বিশদ আলোচনা না করলে ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি যে কত বিচিত্র ও অজস্র তার যথার্থ ধারণা করা যাবে না। আমরা অন্যত্র এ-বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু এ-গ্রন্থে ও-বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়; কেননা, বিবিধ ছন্দোবন্ধের মোটামুটি পরিচয় না দিয়ে ও-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু ছন্দোবন্ধের পরিচয় দেওয়া সাধারণ ছন্দশাস্ত্রের এলাকাভুক্ত ও তার জন্যে যথেষ্ট স্থান চাই। এ-গ্রন্থে যুগপৎ ছন্দোবন্ধের সাধারণ পরিচয় এবং ও-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র দানের কথা আলোচনা করা সমীচীনও নয়, সে স্থানও আমাদের নেই। এখানে শুধু একথাটি বলা দরকার যে, বাংলা ছন্দকে একধ্বনিকতা বা এক-ঘেয়েমির দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রথম জীবনের বিচিত্র রকম বন্ধের আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি পরবর্তী কালে মুক্তক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, মুক্তকও এক প্রকার বন্ধ বটে; কিন্তু তাতে সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যাশিত রকমের প্রত্যাবৃত্তি ঘটে না বলে তার ভঙ্গির একটা বিশিষ্ট অভিনবত্ব আছে। মুক্তক সম্বন্ধে কয়েকটি পরিচ্ছেদে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এস্থলে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

একঘেয়ে বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্যসৃষ্টির উপায়স্বরূপ তিনি যে চতুর্থ কৌশলটি আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে **মিল** (rhyme) ঘটাবার কৌশল। সংস্কৃত ছন্দে যথেষ্টপরিমাণে লঘুগুরুধ্বনিবিন্যাসজাত তরঙ্গভঙ্গির ব্যবস্থা থাকাতে ও-ছন্দে মিলের প্রয়োজন হয় না। বাংলা ছন্দ rhythm বা ধ্বনিতরঙ্গের অভাবে বড় দুর্বল ও একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল, একথা পূর্বগামী কবিরাও অনুভব করেছিলেন তাই ভারতচন্দ্রপ্রমুখ অনেকেই হ্রস্বদীর্ঘস্বরের প্রত্ন উচ্চারণরীতির পুনঃপ্রবর্তনের ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন। মধুসূদন বেছে নিয়েছিলেন যুগ্মধ্বনিবহুল গুরুগম্ভীর ধরনের সংস্কৃত শব্দপ্রয়োগের রীতিটিকে; তাঁর এ-চেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছে পূর্বেই বলেছি। আর, দাশরথিরায়-ঈশ্বরগুপ্ত-প্রমুখ অনেকে অবলম্বন করলেন ঘনঘন যমক, অনুপ্রাস ও শ্লেষ, এই কয়টি শব্দালংকারকে।[1] বলা বাহুল্য পংক্তিপ্রান্তিক মিল অনুপ্রাসেরই অন্তর্গত। এই অলংকারগুলির ধ্বনিঝংকারেই তাঁরা বাংলার স্পন্দনহীন ছন্দকে বাঙালি শ্রোতার কানে ঝংকৃত করে তুলতে চেয়েছিলেন। বস্তুত reason ও rhythm, এই উভয়েরই অভাব তাঁরা পূরণ করতে চেয়েছিলেন rhymeএর প্রাচুর্যের দ্বারা। Reasonএর কথা আমাদের বিবেচ্য নয়; কিন্তু rhythm বা ছন্দস্পন্দের অভাব যে তাঁরা যথেচ্ছভাবে অনুপ্রাসের অলংকার বাজিয়ে পূরণ করতে পারেননি, একথা স্বীকার করতেই হবে। কেননা, তাঁরা মিল বা অনুপ্রাস নিয়ে যথেচ্ছাচারই করেছেন; মিল রচনার যথার্থ পথে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা কাব্য সাহিত্যের আসরে প্রথম আবির্ভূত হলেন তখন বাংলা ছন্দে rhythm ও rhyme, এই দুয়েরই একান্ত অভাব তাঁর কবিচিত্তকে পীড়িত করছিল। কি করে এই অভাব পূরণ করা যায়, এই হল তাঁর সাহিত্যসাধনার অন্যতম প্রধান সমস্যা। কি ভাবে তিনি বাংলা ছন্দের প্রথম অভাবটা দূর করেন, সেকথা একটু আগেই বলা হল। দ্বিতীয় অভাবটা দূর করাও রবীন্দ্রনাথের আরেকটি বিশেষ কীর্তি। বস্তুত বাংলা ছন্দে যথার্থ মিলসৃষ্টির রীতি তিনিই প্রবর্তন করেছেন।

১ লোকসাহিত্য, কবিসংগীত, ছন্দ, পৃ ২০৫-২০৬।

মধুসূদনপ্রমুখ কবিদের আমলে ছন্দপংক্তির অন্তিম প্রান্তে মিল দেবার যে একটি মামুলি একঘেয়ে পদ্ধতি ছিল, তা সব সময় ত্রুটিশূন্য হত না। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন রীতিটিকে শুধু যে ত্রুটিহীনভাবে প্রয়োগ করেছেন তা নয়; তিনি বাংলা ছন্দে দ্বিদল (dissyllabic), ত্রিদল (trisyllabic) প্রভৃতি নানারকমের মিলসৃষ্টির যে বিচিত্র পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, তার কৃতিত্বও কিছুমাত্র কম নয়। বস্তুত প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগের মিল দেবার মামুলি রীতির সঙ্গে আধুনিক কালের মিল দেবার বিচিত্র রীতির তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথ ক জীবনে কতখানি পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তা ভেবে চমৎকৃত হতে হয়। এস্থলে একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রপ্রবর্তিত নবরীতির মিল শুধু অন্ত্যানুপ্রাসই নয়, অনেক স্থলেই তাতে cadence বা অন্ত্যস্পন্দেরও আবির্ভাব ঘটে। ও-সব স্থলে অন্ত্যানুপ্রাস ও অন্ত্যস্পন্দ, rhyme ও cadenceএর সম্মিলনে যে নিমাধুর্য দেখা দেয়, তা বাস্তবিকই পরম উপভোগ্য। এই বিচিত্র মিল ও অন্ত্যস্পন্দ উদ্ভাবনের ফলে বাংলা ছন্দের ভাণ্ডার অভূতপূর্বরূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। অন্ত্যানুপ্রাস ও অন্ত্যস্পন্দের যে বিচিত্র প্রকারভেদ ও তার যে কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম দেখা যায়, তার যথোচিত আলোচনার স্থান হচ্ছে ছন্দশাস্ত্রের সাধারণ পুস্তক। এখানে আমরা ওই আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে নানারকম মিলের কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই নিরস্ত হব। কিন্তু তৎপূর্বে মিলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলা দরকার। প্রথম কথাই এই যে, মিল ছন্দের অত্যাজ্য অঙ্গ নয়। ছন্দের ধ্বনিতে যথেষ্ট তরঙ্গ-ভঙ্গি কিংবা পদবিভাগ ও যতিস্থাপনের বৈচিত্র্য ঘটাবার যথেষ্ট সুযোগ থাকলে মিল না দিলেও ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না; এজন্যেই সংস্কৃতের তরঙ্গিত ছন্দে কিংবা বাংলা সমপংক্তিক প্রবহমান পয়ার এবং মুক্তকের ন্যায় বিচিত্র যতি ও পদবিভাগের ছন্দে মিল অত্যাবশ্যক নয়। বরং গুরুগম্ভীর ধ্বনি ও ভাবের ছন্দে মিল জিনিসটা অনেক সময়ে দুর্বলতারই কারণ হয়ে ওঠে। পৌরুষ-শক্তিই যেখানে প্রধান, মিলের অলংকরণ সেখানে নিষ্প্রয়োজন। মিলের

অত্যলংকরণে বহুস্থলেই ছন্দের দৃঢ় গতিভঙ্গি ব্যাহত হবার আশঙ্কা থাকে নূপুরের নৃত্যচ্ছন্দে মল্লক্রীড়া শুধু অসম্ভব নয়, হাস্যকরও বটে। কিন্তু তাণ্ডবে পরিবর্তে লাস্যনৃত্যই যেখানে কাম্য, সেখানে নূপুরের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য। রূপকের ভাষা ছেড়ে দিয়ে বলা যায়, যে-ছন্দে শক্তি ও বৈচিত্র প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ থাকে সেখানে মিল অত্যাবশ্যক নয়; কিন্তু অন্যত্র তা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। বাংলার ন্যায় নিস্তরঙ্গ ও বৈচিত্র্যহীন ছন্দে একঘেয়েমি দূর করার অন্যতম প্রধান উপায়ই হল মিল দেওযার বিভি কৌশল, একথা বলা হয়েছে। ছন্দের একঘেয়ে ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে মাঝে মাঝে মিলের ঝংকার থাকলে আমাদের কানটা সহজে ঝিমিয়ে পড়ার অবকা পায় না। একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে মিল থাকলে মনের মধ্যে একটা প্রত্যা জেগে ওঠে এবং মিলের প্রত্যাবৃত্তি দ্বারা আমাদের সে প্রত্যাশা যখন পূর্ণ হয় তখনই আমাদের মনটা আনন্দিত হয়ে ওঠে। তা-ছাড়া, একথাও মনে রা দরকার যে, যথাস্থানে একটা মিলের প্রত্যাশা আমরা করি বটে, কিন্তু মিল ঠিক কি রকম হবে সেটা আমরা আগে থেকেই বুঝতে পারিনে। কাজে এদিক্ থেকে মিলের মধ্যে অভাবনীয়তার স্বাদও থাকা চাই। এই অভাবনীয়তা মাত্রা হিসাবেই মিলের মর্যাদা বাড়ে কমে। মিলটা যত অভাবিতপূর্ব হ তার সার্থকতাও তত বেশি, আর মিলটা যত বেশি প্রত্যাশিত ও পরিচি হবে তার মূল্য সে হিসাবে কমে যাবে। এইজন্যই 'যার-তার, দিলে-নিে তুমি-চুমি, রাত্রি-যাত্রী'—এসব সুপরিচিত মিল আমাদের মনের আনন্দ জাগিয়ে তুলতে পারে না। তবে এগুলিও একেবারে ব্যর্থ নয়; প্রত্যাশি স্থানে এসমস্ত মিল সংঘটিত হয়ে ছন্দের তাল রক্ষা করে যায় এবং তা আমাদের ছন্দোবোধের সহায়তা হয়। কিন্তু প্রত্যাশিত স্থানে অপ্রত্যাশি মিলই হচ্ছে আদর্শ মিল। এই মিলের দ্বারা ছন্দের তাল রক্ষা করা ছাড় আরও দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; আমাদের মনের উপর তার দুটি ক্রিয়া হয় প্রথমত, এই মিলের ঝংকারে ও তার বর্ণবৈচিত্র্যে আমাদের চিত্ত অনুরণি

অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ওসব মিলের দ্বারা প্রত্যাশিত স্থলে অভাবিতের আবির্ভাবের দ্বারা আমাদেব হৃদয়টা আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। আর, ওই অভাবিতের আবির্ভাবটা যদি একটু অদ্ভুতরকমের অর্থাৎ 'অঘটনঘটনপটীয়সী' রকমের হয়, তা হলে ওই আনন্দরসটাও হাস্যরস বা কৌতুকরসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মিলের দ্বাবা কবির এত বিচিত্রবকমের কার্য সিদ্ধ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ওই মিলকে সববকম কাজেই লাগিয়েছেন এবং তাঁরই রচনা থেকে মিলেব এই বিচিত্র চরিত্রেব বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে। মিলের দ্বারা কিভাবে হাস্য- ও কৌতুক-রসের সৃষ্টি করা যায়, তার একটি অফুরন্ত উৎসস্বরূপ তাঁব 'খাপছাড়া' বইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, মাত্রিক ও লৌকিক ছন্দে মিল ঘটাবার যত বেশি সুযোগ আছে যৌগিক ছন্দে তা নেই। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই। মিলের প্রধান আশ্রয়স্থল হল পংক্তির প্রান্তস্থিত শেষ পর্বটি। মাত্রিক ও লৌকিক রীতির ছন্দে এই অন্তিম পর্বটি নানা আয়তনে ও বিচিত্র ভঙ্গিতে গঠিত হতে পারে; তাই ওই পর্বটিতে মিলের বাহাদুরি দেখাবারও সুযোগ বেশি। পক্ষান্তরে যৌগিক রীতির ছন্দে ওই শেষ পর্বটির আয়তন কখনও দুই মাত্রার বেশি বা কম হয় না; তাই ওই অপরিসব অংশটিতে মিলের খেলা দেখাবার সুযোগও কম। অতএব বাংলা-সাহিত্যে মাত্রিক ও লৌকিক রীতির যিনি প্রবর্তক তিনিই যে মিলেবও বৈচিত্র্যস্রষ্টা হবেন, সেটা বিস্ময়ের বিষয় নয। এবার বিভিন্ন বকম মিলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।

পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়
কাজকর্ম কর সায়, এস চটপট!
শামলা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব
একা প'ড়ে মোর চিত্ত করে ছটফট!

—মানসী, শ্রাবণের পত্র

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ, রয়েছে রেশ কানে,
কী যেন করা উচিত ছিল, কী করি কে তা জানে !
অন্ধকারে ওই রে শোন্ ভারতমাতা করেন groan,
এহেন কালে ভীষ্ম-দ্রোণ গেলেন কোন্‌খানে ।

—মানসী, দেশের উন্নতি

ব্রত নানামতো সতত পালয়ে, এক কানা কড়ি মূল্য না লয়ে
ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে বিতরিছে যাকে তাকে ।
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে, কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে সন্ধান তার রাখে ।··
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ পবিত্র পদপঙ্কে ।

—সোনার তরী, পুরস্কার

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী,
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে,
কত মঞ্জুল রাগিণী ।

—চিত্রা, চিত্রা

মানবজন্ম নহে তো নিত্য, ধন জন মান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য, কালনদী ধায় অধীরা ।

দাও তবে ঢালি—কেবল মাত্র দু-চারি দিবস দু-চারি রাত্র,—
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র জনসংঘাতমদিরা।

—চিত্রা, নগরসংগীত

আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাটফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

—কল্পনা, প্রণয়প্রশ্ন

কী আছে পাত্রে যাহার গাত্রে বসেছে তৃষিত মক্ষী ?
শলাকাবিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ মনুনিষিদ্ধ পক্ষী।

—কল্পনা, উন্নতিলক্ষণ

আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-কিংকিণিতে
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কানায় কানায়।
আমি নাবব মহাকাব্য-সংবচনে
ছিল মনে।

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপূরণ

তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ্-অভ্যাস,
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস,

কিছু না হোক 'লঙ্‌ফেলো'দের হব আমি সমান তো,
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।···
তাই বসেছি ডেস্‌কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,
'কাগজ লে আও, কলম লে আও, কালি লে আও, ধাঁ কর্‌কে।'

—পূরবী, শিলঙের চিঠি

শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ,
কৃশ তনু ক্লান্ত,
উড়ে পড়ে উত্তরীপ্রান্ত
উত্তর পবনে।
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে
আজি তারে বন্দে,
নীপবন মর্মর ছন্দে
জাগে তার স্তবনে।

—বনবাণী (নটরাজ), শেষ মিনতি

পাড়াতে এসেছে এক নাড়ী-টেপা ডাক্তার,
দূর থেকে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার।
নাম লেখে ওষুধের, এ-দেশের পশুদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা,—এই বড়ো জাঁক তার।

—খাপছাড়া, ৭৬

নিমের ডালে পাখির ছানা পাড়তে গেল ওরা কি ?
পকেট ভরে নিয়ে গেল কাঠবিড়ালীর খোরাকি।···
দক্ষিণে ঐ উঠল হাওয়া, বৃষ্টি এখন থামল কি ?
গাছের তলায় পা ছড়িয়ে চিবোয় ভুলু আমলকি।

—ছড়া, ৫

নানা ধরনের মিলের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। দৃষ্টান্তগুলি বিশেষভাবে বেছে বের করিনি; অনেকটা যথেচ্ছভাবে সংগ্রহ করেছি। কিন্তু তবু আশা করি এগুলির থেকেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথের মিলের পরিমাণ কত অজস্র ও তার ভঙ্গি কত বিচিত্র। বস্তুত এত অজস্র মিলবর্ষণ কোনো কবি কোনো সাহিত্যে করেছেন কি না জানিনে; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে যে কেউ করেননি, এ-বিষয়ে সংশয় হবার সম্ভাবনা নেই। একটু চেষ্টা করলে মিল হয়তো অনেকেই দিতে পারেন; কিন্তু পদে পদে অজস্র মিল দিয়েও কাব্যের উৎকর্ষ অব্যাহত রাখার যে দুঃসাধ্য কৃতিত্ব, সেইটেই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। যাহোক, উপরের দৃষ্টান্তগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মিলগুলির যেন একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে; ওই ঝোঁকের প্রভাবে ছন্দে নূতন-রকম স্পন্দন জেগে ওঠে, এখানেই মিল দেবার প্রধান সার্থকতা। তা-ছাড়া, মিলগুলি যে সর্বত্রই প্রত্যাশিত জায়গায় ঘটেছে, তা নয়; কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত স্থলেও মিল দেখা দিয়ে মনে একটু অতিরিক্ত রসের সঞ্চার করেছে।

এবার রবীন্দ্রনাথের একটি সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় রীতির কথা বলব। মিলের জাদুকর বলেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শুধু মিলের ঝংকারটারই নয়, তার আকস্মিকতারও একটা রস আছে। এই আকস্মিকতার রসটা শুধু যে, অপ্রত্যাশিত মিলের দ্বারাই সঞ্চারিত হয়, তা নয়। অপ্রত্যাশিতভাবে মিলের অভাবের দ্বারাও একরকম আকস্মিকতার রস সঞ্চার করা যায়। প্রত্যাবৃত্তি বা অভ্যাসের ফলে যেখানে আমরা মিল পাবার প্রত্যাশা করি, হঠাৎ যদি অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে মিল না পাওয়া যায়, তাতেও মনটা সজাগ হয়ে ওঠে। সংগীতে যেমন, অনেক স্থলে ফাঁকের দ্বারাই তাল রাখা হয়, এখানেও ঠিক তেমনি প্রত্যাশিত স্থলে মিল না দিয়েই মিল দেবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়। এরকম হঠাৎ মিল না দিলে অতিপ্রত্যাশিত মিলের একঘেয়েমি দূর হয়ে ছন্দে বৈচিত্র্য জেগে ওঠে। বৈচিত্র্যসৃষ্টির এ-কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন !
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্ত বিলীন !
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন ;
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন ।

—মানসী, দুরন্ত আশা

'নিরুদ্দেশ' শব্দটি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো কথার সঙ্গে মেলেনি ; পূর্ববর্তী 'দিন' কথাটি এক লাইন ডিঙিয়ে 'হীন' কথাটির সঙ্গে মিলেছে। 'নিরুদ্দেশ' কথাটির প্রান্তে একটি মিল প্রত্যাশিত ছিল ; অথচ এখানে মিল দেওয়া হয়নি। তার ফলেই মনটা ওখানে এসে একটা নাড়া খেয়ে সজাগ হয়ে ওঠে। বহু বৎসর পূর্বে ইস্কুলের ছাত্রাবস্থায় এরকম একটা মিলের অভাবে ধাক্কা খেয়ে মনের যে বিস্ময় ও আনন্দ জেগে উঠেছিল, তা আজও মনে আছে। মাঝে মাঝে এরকম মিলের ফাঁক থাকার সার্থকতা তখনই উপলব্ধি করেছিলাম। মনে হয়েছিল ছন্দোবদ্ধ কবিতার প্রত্যেক পংক্তিরই একটি করে দোসর বা সঙ্গী থাকে ; কিন্তু একেকটা পংক্তি যেন নিঃসঙ্গভাবে একাই দাঁড়িয়ে থাকে, ওই একাকিত্বের মধ্যেই ওর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা। মনে মনে এরকম পংক্তিকে নাম দিলাম 'নিঃসঙ্গ পংক্তি'। আজও ওই নামের সার্থকতা স্বীকার করি এবং এ-গ্রন্থেও ওই নামটা ব্যবহার করাই সমীচীন মনে করি। যাহোক, ও-রকম মিলের ফাঁক তথা নিঃসঙ্গ পংক্তির আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

তবে পরানে ভালবাসা কেন গো দিলে,—
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে।

—মানসী, গুপ্তপ্রেম

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,—
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

—কল্পনা, দুঃসময়

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে,
কাঁদিছে আপন মনে,
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে,
কহিছে সে, 'হায় হায়,
বেলা যায়, বেলা যায় গো—
ফাগুনের বেলা যায়।'
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই—
কিছু নাই তোর ভাবনা ;
কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে, পুরিবে সকল কামনা,
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না।

—উৎসর্গ, ৯

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।···
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।

তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলেছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে—
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

—গীতাঞ্জলি, ১০১

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনাতেও এ-ভঙ্গিটি দেখা যায়। তার থেকেও ছুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে এ মোর ছন্দ-বন্ধনে।
বলাকা-পাঁতির পিছিয়ে-পড়া ও পাখি,—
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।
গত ফসলের পলাশের রাঙিমারে—
ধরে রাখে ওর পাখা,
ঝরা শিরীষের পেলব আভাস ওর কাকলিতে মাখা।
শুনে যাও বিদেশিনী,—
তোমার ভাষায় ওরে
ডাকো দেখি নাম ধরে।

—সানাই, অধরা

এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে,
প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে।
কালো ছায়াখানি মনে পড়ে গেল আঁকা,
বিমুখ মুখের ছবি অন্তরে ঢাকা,
কলঙ্করেখা যেন—
চিরদিন চাঁদ বহি চলে সাথে সাথে।

—সানাই, কৃপণ

তব দক্ষিণ হাতের পরশ করনি সমর্পণ।…
যতটুকু পাই ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে—
নাই বা উচ্ছলিল,—
সারাদিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারাজীবনের স্বপ্নের আয়োজন।

—সানাই, উদ্‌বৃত্ত

বিভিন্ন-রকমের দৃষ্টান্ত দিলাম। আশা করি এর থেকেই পাঠক নিঃসঙ্গ-পংক্তির বিচিত্র ভঙ্গি ও ছন্দোগত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ ছন্দে বৈচিত্র্য ও তরঙ্গলীলা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যেসব রীতি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, সে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করলাম। রবীন্দ্রছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) এবং সুরমাধুর্য (melody) সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্মতর ও বিস্তৃততর আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। তা-ছাড়া, ও-ছন্দের সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দ ও উচ্চারণ-পদ্ধতির আপেক্ষিক আলোচনা, বিশেষত তার সঙ্গে সংগীতের সুর ও তালের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে আলোচনা, করার বিশেষ সার্থকতা আছে। আশা করি যোগ্যতর ব্যক্তি এই আপেক্ষিক বিশ্লেষণকার্যে অগ্রসর হবেন।

৩২

বাংলা সাহিত্যে ভাষারীতির সঙ্গে ছন্দোরীতির একটা বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়; রবীন্দ্রসাহিত্যে সে সম্পর্কটা কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সে-বিষয়েও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার চলতি ও সাধু রীতির সঙ্গে বাংলা ছন্দের স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক রীতির কি সম্পর্ক, তা-ই আমাদের বিবেচ্য।

প্রথমেই বলা দরকার যে, চলতিরীতির বাংলায় আমাদের উচ্চারণের প্রাস্বরিক ব্যবস্থাটি যেমন সুস্পষ্ট ও তাতে যুগ্মধ্বনির যেমন বাহুল্য, সাধুরীতির

বাংলায় তা নয়। লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দটিও সুস্পষ্ট প্রস্বর ও যুগ্মধ্বনিবাহুল্যের অপেক্ষা রাখে। বস্তুত এই লৌকিক ছন্দটিকে একহিসাবে প্রাস্বরিক ছন্দ বলেও অভিহিত করা যায়। তাই চলতিরীতির প্রাস্বরিক বাংলা স্বভাবতই লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দের বাহন হয়েছে। লৌকিক ছন্দটি যে মূলতই চলতি বাংলার ছন্দ, সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাধুরীতির বাংলায় প্রস্বর-ব্যবস্থা অত্যন্ত চাপা, তাতে যুগ্মধ্বনির স্বাভাবিক বাহুল্যও নেই। তাই সাধু-বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের বাহন হতে পারে না, অর্থাৎ সাধুরীতির বাংলায় প্রাস্বরিক ছন্দ রচনা করা সম্ভবপর নয়। বস্তুত সাধু বাংলা হচ্ছে প্রত্ন (archaic) বাংলা; তাই স্বভাবতই জীবন্ত চলতি বাংলাব শক্তিমান্ প্রস্বরবিধির সোনার কাঠির স্পর্শে ও-ভাষা সজাগ ও সচল হয়ে উঠতে পারে না। কাজেই চলতি স্বরবৃত্ত ছন্দের সচল বাহন হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তা-সত্ত্বেও স্বরবৃত্ত ছন্দে কথনও কথনও দুয়েকটা সাধুশব্দের প্রযোগ দেখা যায়। যথা—

ইচ্ছা করে নীরব হযে 'রহিব' তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের 'পরে বুকের কথা উথলে উঠে পাছে,
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই।

—ক্ষণিকা, ভীরুতা

প্রিয়সখীব নামগুলি সব
ছন্দ ভরি 'করিত' রব।···
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান 'গাহিতে' ভুলত বাণী।

—ক্ষণিকা, সেকাল

আমায় যদি মনটি দেবে, 'রাখিয়া' যাও তবে;
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাকতে হবে।

—ক্ষণিকা, অসাবধান

জানি আমি ছোটো আমার ঠাঁই,
'তাহার' বেশি কিছুই 'চাহি নাই'।···
সন্ধ্যা যেমন সন্ধ্যাতারাটিরে
'আনিয়া' দেয় ধীরে
সূর্য-ডোবার শেষ সোপানের ভিতে
সলজ্জ তার গোপন থালিটিতে।
—সানাই, স্বপ্ন

এখানে 'রহিব, করিত, গাহিতে, রাখিয়া' প্রভৃতি সাধু শব্দগুলি লক্ষিতব্য। লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দে ওরকম সাধুশব্দের প্রয়োগ খুবই বিরল। বলা বাহুল্য, সাধু ও চলতি রীতির বাংলার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রতিনাম (pronoun) ও ক্রিয়াপদের রূপ নিয়ে। তার মধ্যেও প্রতিনামের চেয়ে ক্রিয়াপদের গুরুত্বই বেশি; বস্তুত ক্রিয়াপদের রূপের মধ্যেই সাধু ও চলতি বাংলার রূপ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। উপরের ব্যতিক্রমশব্দগুলিব মধ্যেও একটিমাত্র ('তাহার') প্রতিনাম আছে, বাকি সবগুলিই ক্রিয়াপদ। যাহোক, ছন্দরীতির সঙ্গে ভাষারীতির সম্পর্কবিচারে ওই ক্রিয়াপদের, বিশেষত (করবে, আসত, ছুটল, আনতে প্রভৃতি) হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের কথাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

আমরা দেখলাম স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক বাহন হচ্ছে চলতি বাংলা; মাঝে মাঝে দুয়েকটি সাধুশব্দ সহ্য হলেও সাধুরীতির বাংলা সাধারণভাবে ও-ছন্দের ধাতুতে সহ্য হয় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, বিশুদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ সাধুরীতির বাংলা মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক রীতির ছন্দেও চলে না। কেননা কার্যত দেখা যায় ও-দুই রীতির ছন্দের বাহন হচ্ছে চলতি ও সাধু রীতির মিশ্র বাংলা। যথা—

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে মনে হল যেন চিনি,
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলাসঙ্গিনী।

কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে।
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে
বাজাইলে কিংকিণি।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের আলোতে তোমারে চিনি॥
—পূরবী, লীলাসঙ্গিনী

এটি হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর ভাষাতে 'ডাকিলে' ও 'বাজাইলে' এ-দুটি ক্রিয়াপদের সাধুরূপ এবং 'হল, ফেলে, চলে, পড়ে প্রভৃতি চলতিরূপের মিশ্রণ ঘটেছে। এরূপ সর্বত্রই। এবার যৌগিক রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল,
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।···
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিঃশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।
—আরোগ্য, ১০

এটি যৌগিক রীতির ছন্দ। এখানেও 'এসেছে, করেছে, বয়ে যাবে, দেবে' প্রভৃতি চলতিরূপের ক্রিয়াপদের সঙ্গে-সঙ্গেই 'উড়িয়াছে, আসিয়াছে, রাখিবে' প্রভৃতি সাধুরূপের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এই মিশ্র ভাষাই মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের সাধারণ বাহন। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, এই উভয় রীতির ছন্দেই 'উড়ায়েছে, ভাসায়ে' প্রভৃতি কবিতাসুলভ একরকম বিশেষ ধরনের ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। এই বিশেষরূপের ক্রিয়াপদগুলি আসলে সাধু ক্রিয়ারই প্রকারভেদ মাত্র।

বস্তুত মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক, এই উভয় রীতির ছন্দেই সাধু ও চলতি, এই দুই রূপের ক্রিয়াপদেরই ব্যবহার চলে এবং পাশাপাশিই চলে। কেবল একটি জায়গায় ব্যতিক্রম দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক রীতির ছন্দে হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার খুব কমই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঠিক একথাই বলেছেন ভাষান্তরে। তাঁর ভাষা এই— "সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য"।[১] কিন্তু তাঁর একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; তাঁর নিজের রচনা থেকেই তাঁর এ-উক্তির ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দেব। 'সাধুভাষার ছন্দ' বলতে তিনি মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক এই উভয় রীতির ছন্দের কথাই বোঝাচ্ছেন; কেননা ও-দুই ছন্দেই ক্রিয়াপদের চলতি রূপের সঙ্গে-সঙ্গে সাধুরূপেরও যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। পূর্বেই বলেছি কোনো রীতির ছন্দই পুরোপুরি সাধুভাষার ছন্দ নয়। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, প্রাক্‌রবীন্দ্র-যুগে যৌগিক রীতির ছন্দে সাধু ক্রিয়ারই প্রাধান্য দেখা যায়, চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কমই ছিল। রবীন্দ্রনাথই ও-ছন্দে (তথা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে) প্রচুর পরিমাণে চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহারের নীতি প্রবর্তন করেছেন। তার ফলে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ভাবপ্রকাশের সুবিধা বহুলপরিমাণে বেড়ে গিয়েছে, একথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু তিনি অকুণ্ঠভাবে যে চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার

১ ছড়ার ছবি, ভূমিকা।

চালিয়েছেন, সে হচ্ছে (এসেছে, বয়ে, যাবে, যেতে, দেবে প্রভৃতি) অ-হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ। হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহারে তাঁর বোধ হয় একটু কুণ্ঠা ছিল; পূর্বোদ্ধৃত তাঁর উক্তিটি থেকেই একথা সমর্থিত হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিরল হলেও তাঁর রচিত যৌগিক ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদেরও অভাব নেই। যথা—

শেষকালে বহু ইতস্তত করে
লেখা করলেম শুরু।···
শুকনো কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি নিমেষে নিমেষে
—পরিশেষ, খ্যাতি

সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।
—পরিশেষ, প্রাণ

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই যৌগিক রীতির ছন্দে 'করলেম, পড়ল, উঠত, মিলত' প্রভৃতি হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদ যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। 'পরিশেষ' কাব্যখানিতে এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্য কোনো কাব্যে ওরকম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আরও বলা প্রয়োজন যে, এসব ক্ষেত্রে 'উঠত, পড়ল' প্রভৃতি হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের অন্তর্গত যুগ্মধ্বনিটি সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে 'শুকনো' শব্দের 'শুক' যুগ্মধ্বনিটি সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক রূপে গৃহীত হয়েছে। তেমনি 'পড়ল, উঠত' প্রভৃতি কথার মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিটিও অনায়াসেই সংকুচিত হয়ে একমাত্রা বলে গণ্য হতে পারত। কিন্তু

রবীন্দ্রসাহিত্যে ওরকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তবে তাঁরই রচিত কয়েকটি ছন্দের উদাহরণে ওরকম সংকোচনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা—

ছুটল কেন মহেন্দ্রের আনন্দেব ঘোর,
টুটল কেন উর্বশীর মঞ্জীরের ডোর।

—ছন্দ (২য় সং), পৃ ৭৬

এখানে 'ছুট' ও 'টুট' যুগ্মধ্বনিদুটি সংকুচিত হয়ে একমাত্রার স্থান অধিকার করেছে। এ-বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করেছি (পৃ ৪৯-৫১)। অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখাব। প্রথমেই বলা দরকার যে, চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দে রবীন্দ্রনাথ বহুলপরিমাণেই হসন্ত-মধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। বস্তুত পক্ষে স্বরবৃত্ত ছন্দের পরেই তিনি চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দে চলতি ক্রিয়াপদের অজস্র প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্ত দিলেই একথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে।

লিখেছিনু কবিতা সুরে তালে শোভিতা—
এই দেশ সেরা দেশ বাঁচতে ও মরতে।
ভেবেছিনু তখুনি এ কি মিছে বকুনি,
আজ তার মর্মটা পেরেছি যে ধবতে।...
বড়ো হলে নেব তার পদখানি দেবতার,
দাদা নাম বলতেই আঁখি হবে সিক্ত।

—প্রহাসিনী, ভাইদ্বিতীয়া

ইদিলপুরেতে বাস নরহরি শর্মা,
হঠাৎ খেয়াল গেল যাবেই সে বর্মা।
দেখবে শুনবে কে যে তাই নিয়ে ভাবনা,
রাঁধবে বাড়বে, দেবে গোরুটাকে জাবনা,
সহধর্মিণী নাই, খোঁজে সহধর্মা॥

—খাপছাড়া, ১৭

মরেছে অতুলমামা আজি তারি শ্রাদ্ধের
জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাদ্যের।···
কাঁকরোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে,
শাকআলু কচু কিনা পারে না সে চিনতে।···
দেখলেম কিনছে যে ও-পাড়ার সরকার,
বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার।

—গল্পসল্প, বিজ্ঞানী

ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এসব ফসল ফলে কন্‌গ্রেসী শস্যে।···
ঠাট্টার অর্থ টা ব্যাকরণে খুঁজতে
দেরি হল, পরদিনে পারল সে বুঝতে।···
দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয়সম্পর্কের।

—ছড়া, ৩

চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দে রবীন্দ্রনাথ হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। বস্তুত ও-ছন্দে তিনি চলতি ও সাধু ক্রিয়াপদ প্রায় সমভাবেই ব্যবহার করেছেন। এমন কি, তাঁর রচনায় কোনো কোনো স্থলে ও-দুই রকম ক্রিয়াপদের পাশাপাশি ব্যবহারও দেখা যায়। যথা—

আধা-রাতে গলা ছেড়ে মেতেছিনু কাব্যে,
ভাবিনি পাড়ার লোকে মনেতে কী ভাববে।··
আমি শুধু করেছিনু সামান্য ভণিতাই,
সামলাতে পারল না অরসিক জনে তাই।
কে জানিত অধৈর্য মোর পিঠে নাববে।

—খাপছাড়া, ৩০

এখানে 'পারল' এবং 'জানিত' শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগ লক্ষিতব্য। এস্থলে

ও-দুটিকে সাধু অথবা চলতি রূপে ব্যবহার করার কোনো বাধা ছিল না। এ-ধরনের আরও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় ; কিন্তু নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্ররচিত পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দে হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিনি। ছয় মাত্রার ছন্দেও ও-রকম প্রয়োগ খুব বিরল। কিন্তু একেবারে যে নেই তা নয়। উদাহরণ দেখানো দরকার।

তারে যে কখন কটাক্ষে চায়
কিছু তো পাবিনে 'জানতে'।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন,
যায় যবে জল 'আনতে'।
—ক্ষণিকা, দুই বোন

সূর্য যখন উড়াল কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু 'জানতে'।
—পরিশেষ, তুমি

বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি 'করতে' এসে
আনমনা হয়ে শেষে
কেবল তোমার ছায়া
রচে দিয়ে ভুলে ফেলে গিয়েছেন, শুরু করেননি কায়া।
যদি শেষ করে দিতেন, হয়তো হত সে তিলোত্তমা,
একেবারে নিরুপমা।
যত রাজ্যের যত কবি তাকে ছন্দের ঘের দিয়ে
আপন বুলিটি শিখিয়ে 'করত' কাব্যের পোষা টিয়ে।
—সানাই, সম্পূর্ণ

পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর, লেজখানা যায় ছিঁড়ে ;
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার 'কুটছে' নতুন চিঁড়ে।…
গরানহাটায় সজনেডাঁটা-[১] 'কিনছে' পুলিস সার্জন,
চিতপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী কাত হয়ে মরে চারজন।

—ছড়া, ৭

ছয় মাত্রার ছন্দের এই দৃষ্টান্তগুলিতে পুরোপুরি চলতি ভাষার প্রয়োগ হয়েছে। হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে এরকম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

পূর্বেই বলেছি বাংলা সাহিত্যে সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দেব যথেষ্ট প্রয়োগ এখনও হয়নি (পৃ ৭৯)। তার মধ্যেও একটি স্থলে হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি। যথা—

তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘ পথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুন্ গুন্ স্বরে।
কেননা গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে-গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে, সময় হল তারো,
'ফুটল' তব পূজা-তরে।

—উৎসর্গ, ৪৩

সমগ্র কবিতাটির ধ্বনিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, ও-কবিতাটিতে (তথা সাতমাত্রার ছন্দে) 'ফুটল' শব্দের মতো বহু হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদ অতি অনায়াসেই প্রযুক্ত হতে পারত। 'তুচ্ছ, আজকে, দীর্ঘ, একটি' প্রভৃতি

১ এখানে একমাত্রার ফাঁক আছে। স্বরবৃত্ত ছন্দে এবং চতুর্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রায়শ একমাত্রার ফাঁক রাখা হয়। কিন্তু ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দে এরকম ফাঁক রাখার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

শব্দের ঝোঁকের দ্বারাই ওই উক্তি সমর্থিত হয়। ওই কবিতাটির একটি লাইন হচ্ছে এরকম—"আজকে বসে আছি, পথের এক পাশে"। এস্থলে 'আজিকে' না লিখে 'আজকে' লেখাতে, 'ফুটিল' না লিখে 'ফুটল' লেখাতেই বোঝা যায়, সাতমাত্রার ছন্দে 'ফুটল'র মতো চলতি ক্রিয়াপদ বেশ মানানসই ভাবেই চলতে পারে।

পাঁচমাত্রার ছন্দেও হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদ অচল মনে করার কোনো হেতু নেই। যদি লেখা হত

পঞ্চশরে দগ্ধ করে 'করলে' এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিলে যে তারে ছড়ায়ে।

তাহলে ছন্দোগত দোষ ঘটত বলে মনে করিনে। আধুনিক কালের সাহিত্য থেকে পাঁচমাত্রার ছন্দের এরকম একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

বুঝেছি কাঁদা বৃথায় হেথা, তাই
কাছেই পথে জলের কলে সখা
কলসি কাঁখে 'চলছি' মৃদু চালে,
গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এল।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক, বধূ

যাহোক, আমরা দেখলাম লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দে চলতি ভাষার একচেটে অধিকার, সাধুভাষা সেখানে অচল। পক্ষান্তরে তথাকথিত 'সাধুভাষার ছন্দে'ও সাধুভাষার একচেটে অধিকার নেই, সেখানেও চলতি ভাষার অবাধ প্রবেশাধিকার। সাধুভাষার সাহায্যে সবরকম ছন্দ রচনা করা যায় না, তাতে জীবন্ত ভাষার সাবলীলতা নেই। বস্তুত ছন্দরচনার ক্ষেত্রে সাধুভাষার অধিকার ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে এবং কবিতার ভাষায় প্রত্ন (archaic) শব্দের যে স্থান, সাধুভাষার শব্দগুলি ক্রমশ সেই স্থলবর্তী হয়ে আসছে। গদ্যের ভাষায় সাধুরীতির যথেষ্ট প্রয়োগ থাকাতে পদ্যের ভাষায় সাধুশব্দের প্রত্নপ্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। পক্ষান্তরে কবিতার ভাষায় চলতি রীতির অধিকার

ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে এবং পুরোপুরি চলতি ভাষাতেই তিন রীতির ছন্দই অনায়াসে রচনা করা চলে। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকেই একথা প্রমাণিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেকথা দ্বিধাহীন ভাবে বলে গেছেন : "এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস"।[১]

৩৩

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাব প্রতি যুগপৎ দৃষ্টিস্থাপন করলে একথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়, কত বিচিত্র ও অবিশ্রান্ত তাঁর ভাব ও রূপসৃষ্টির প্রবাহ এবং কবিজীবনের সেই প্রথম অভ্যুদয় থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্রজীবনব্যাপী নবনব ছন্দ, সংগীত, ভাব ও রূপ রচনার সাধনা তাঁর কত বিপুল, কত অজস্র ও অবিরাম। তাঁর এই দীর্ঘজীবনব্যাপী রূপসমৃদ্ধ সাধনার কথা ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, তাঁর মতো রূপসচেতন কবি পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ। তাঁর ওই রূপচেতনা স্বভাবতই শিল্পচেতনায় পরিণত হয়েছে। এস্থলে শুধু তাঁর ছন্দশিল্পের কথাই আমাদের বিবেচ্য। তিনি কোনো উপলক্ষ্যে নিজেকে 'ছন্দোবিলাসী কবি' বলে অভিহিত করেছেন। একথা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি বিশেষভাবেই সচেতন ছন্দশিল্পী ছিলেন। বস্তুত যিনি আধুনিক বাংলা ছন্দোজগতের প্রায় একক স্রষ্টা তাঁর পক্ষে ছন্দসচেতন না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয় হত। তাঁর এই নিত্যজাগরূক ছন্দচেতনার ফলে শুধু যে বাংলার সাহিত্যাকাশ অফুরন্ত ছন্দসংগীতে নিত্য মুখরিত হয়ে উঠেছে তা নয়; তাঁর ওই ছন্দচেতনার ফলেই বাংলা সাহিত্যে একটি যথার্থ ছন্দশাস্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। বস্তুত বাংলা ছন্দ-শাস্ত্রেরও তিনিই প্রথম প্রবর্তক। বাংলার কবিসমাজ তাঁকে ছন্দোগুরু বলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন; বাংলাব ছান্দসিকগণও একথা স্বীকার কববেন যে, তিনিই হচ্ছেন বাংলার আদি ছান্দসিক। বস্তুত ত্রিশ বৎসর পূর্বে

১ ছন্দ, পৃ ৫২। ২ ১৩২১—জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ।

'সবুজপত্রে'র পৃষ্ঠায় যখন বাংলা ছন্দের উপর তাঁর প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হল তখনই বাংলা ছন্দশাস্ত্রেরও উদ্‌বোধন হল। যথার্থ ছন্দশাস্ত্রগঠনের সে-ই প্রথম সূত্রপাত। বালকবয়সে সেই প্রবন্ধ যখন পড়ি তখন কি যে অভিনব বিস্ময়, আনন্দ ও প্রেরণা অনুভব করেছিলাম তা আজও ভুলতে পারিনি। তখনই বাংলা ছন্দের অন্তর্নিহিত নীতির অন্বেষণে আমার চিত্ত উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তারপর নানা উপলক্ষ্যে তিনি ছন্দ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে তাঁর 'ছন্দ'নামক পুস্তকে। বাংলা ছন্দোবিশ্লেষণের ইতিহাসে ওই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মূল্য যথার্থই অপরিমেয়। আগামী বহুকাল পর্যন্ত অতি অপরিহার্যরূপেই ওই বইখানি বাংলার ছান্দসিকগণের উপজীব্য ও অফুরন্ত প্রেরণার উৎসস্থল হয়ে বিদ্যমান থাকবে, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। পৃথিবীতে বহু মহাকবিই ছন্দশিল্পী-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো মহাকবি যুগপৎ ছন্দশিল্প-রচনায় ও ছন্দবিজ্ঞানের নীতি-আবিষ্কারে এমন সমভাবে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন বলে জানিনে। জনশ্রুতি অনুসারে স্বয়ং কালিদাসই 'শ্রুতবোধ'-নামক ক্ষুদ্র ছন্দশাস্ত্রখানির রচয়িতা। কিন্তু আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা শুধু 'তারিখ-সাল' নিয়ে বিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা কালিদাসের 'শ্রুতবোধ'এর রচয়িতৃত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান। তাছাড়া সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের স্রষ্টারূপে কালি-দাসের কোনো কৃতিত্বের কথা জনশ্রুতিতেও স্বীকৃত নয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহেই ওই কৃতিত্বের অধিকারী এবং তাঁর 'ছন্দ' পুস্তক সম্বন্ধেও কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। সুতরাং অন্তত এ-হিসাবেও তিনি যে "কালিদাসকে হারিয়ে দিযে গর্ব" করার অধিকার লাভ করেছেন, একথা সর্বতোভাবে স্বীকার্য।

সৌরজগতের মহাকর্ষণনীতির ন্যায় বাংলা ছন্দোজগতের যে মূলনীতিগুলি, পরম বৈজ্ঞানিকের ন্যায় আপন অসাধারণ বোধশক্তির দ্বারা তিনি সেগুলিকে আবিষ্কার করলেন। আবার অদ্বিতীয় রূপকারের ন্যায় তিনিই সেগুলিকে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ছন্দের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে বাংলার সাহিত্যসমাজকে

মুগ্ধ করে রাখলেন। বোধ করি সাহিত্যজগতের ইতিহাসে এমন অব্যর্থসন্ধানী সব্যসাচীর আবির্ভাব আর কখনও ঘটেনি।

৩৪

এবার রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। কাব্যের সুনিয়মিত ধ্বনিবিন্যাসরীতিকেই বলে ছন্দ এবং ওরকম ছন্দোবদ্ধ রচনাকেই বলা হয় পদ্য। আর যে-রচনায় ওই সুনিয়মিত ধ্বনি-বিন্যাসকে স্বীকার করা হয় না তারই নাম গদ্য। সুতরাং স্বভাবতই গদ্যের কোনো ছন্দ থাকতে পারে না; বস্তুত 'গদ্যের ছন্দ' কথাটাই স্ববিরোধী। গদ্যকাব্য হতে পারে না, একথা আমি বলিনে। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র চিরকাল পদ্যকাব্যের ন্যায় গদ্যকাব্যকেও স্বীকার করেছে। আধুনিক কালেও অস্বীকার করবার কোনো কারণ দেখিনে। কিন্তু খটকা লাগে 'গদ্যকবিতার ছন্দ' কথাটি নিয়ে।

পদ্যের ছন্দোবিন্যস্ত ধ্বনি হচ্ছে সুনিয়মিত, সুপরিমিত ও সুনির্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, ছন্দোবদ্ধ কাব্যের ধ্বনি হচ্ছে 'অতিনিরূপিত', অর্থাৎ ছন্দোভূষিত ভাষায় ধ্বনিকে সুস্পষ্ট 'রূপ' দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। পক্ষান্তরে গদ্যের ধ্বনিবিন্যাস হচ্ছে অনিয়মিত, অপরিমিত ও অনির্দিষ্ট, এক-কথায় অনিরূপিত; অর্থাৎ গদ্যভাষায় ধ্বনির কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ নেই। কাজেই 'গদ্যছন্দ' কথাটি অনর্থক ও অবাস্তব। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে গদ্যকাব্য অসংকোচে স্বীকৃত হলেও সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে গদ্যরচনার ছন্দনিরূপণের কোনো প্রয়াস দেখিনে। উপনিষদের কাব্যলক্ষণাক্রান্ত গদ্যরচনা কিংবা 'কাদম্বরী' প্রভৃতি সর্বস্বীকৃত গদ্যকাব্যের ছন্দ-নির্দেশ কেউ করেছেন বলে জানিনে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গদ্যের ছন্দ হচ্ছে 'ভাবের ছন্দ' বা 'ভাবচ্ছন্দ'। এই উক্তিটিও হেঁয়ালির মতো বোধ হয়। কেননা ছন্দ কথার সর্বস্বীকৃত ও চিরন্তন অর্থ হচ্ছে কাব্যের ধ্বনিবিন্যাসরীতি। কাজেই ভাববিন্যাসপ্রণালীকেও যদি ছন্দ বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে ও-শব্দটির অকারণ অর্থসম্প্রসারণ

ঘটে এবং তার সংজ্ঞার্থনিরূপণও কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু যে অকারণে জটিলতা-সৃষ্টিই হয় তা নয়; মনের মধ্যে এই সংশয়ও উপস্থিত হয় যে গদ্যকবিতার ছন্দ যদি বস্তুত ভাবচ্ছন্দই হয়, তাহলে কি ওসব কবিতার রচনাভঙ্গিতে ধ্বনি-সুষমা একেবারেই নেই। আমাদের মন যদিও বা ভাবচ্ছন্দের অনুকূলে রায় দেয়; আমাদের কান কিন্তু তাতে সায় দেয় না। কেননা আমাদের কানে গদ্যকবিতার রচনাতেও একরকম ধ্বনিগত সৌষম্য ধরা পড়ে, একথা স্বীকার করব। সুতরাং অনিবার্যরূপেই প্রশ্ন ওঠে, গদ্যছন্দ মূলত ভাবচ্ছন্দ না ধ্বনিচ্ছন্দ। মন ও কানের এই বিরোধ মেটানো যাবে কি করে?

বিচার করে দেখা যাক রবীন্দ্রস্বীকৃত গদ্যকবিতায় কোনোপ্রকার ধ্বনি-সৌষম্যের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। প্রথমেই বলা দরকার যে, যথাযথরূপে ভাবের অনুবর্তন করে ওই কবিতাগুলি সুস্পষ্ট স্বরে আবৃত্তি করে গেলে আমাদের কান যেন স্বতই প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাতেই বোঝা যায় ওই গদ্য-কবিতা একেবারে ধ্বনিরূপহীন নয়। দ্বিতীয়ত যদি গদ্যকবিতারও একটা ধ্বনিরূপ আছে বলে অনুভব না করতেন, তাহলে কবি কখনও ওই গদ্য-রচনার কথাগুলিকে গাঁটে গাঁটে বিভক্ত করে স্তবকে স্তবকে সাজাতেন না। ওই সাজানোটা নেহাত চাক্ষুষ তৃপ্তির জন্যে নয়। 'লিপিকা'র কয়েকটি গদ্য-কবিতার ধ্বনিবিন্যাস উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছাপবার সময় বাক্য-গুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ"।[১] তাঁর এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয যে, পদ্যকবিতার ন্যায় গদ্যকবিতারও একটি ধ্বনিরূপ আছে এবং ওই রূপটিকে বজায় রেখে তার কথাগুলিকে খণ্ডিত করে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পদ্যের ন্যায় গদ্যকবিতারও কথাগুলিকে যথেচ্ছভাবে ছিন্ন করা যায় না, গাঁটে গাঁটে ভেঙে সাজাতে হয়। তাতেও গদ্যকবিতায় ধ্বনিসৌষম্যের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। তৃতীয়ত অবনীন্দ্রনাথের রচিত কতকগুলি গদ্যকবিতা সম্বন্ধে কবিগুরু মন্তব্য করেছেন, "তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল,

১ পুনশ্চ, ভূমিকা।

কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি"। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গদ্যকবিতাতেও ভাষাগত অতএব ধ্বনিগত খানিকটা পরিমাণরক্ষা হওয়া চাই। অর্থাৎ গদ্যকবিতার ধ্বনিবিন্যাস পদ্যের মতো সুপরিমিত না হলেও একেবারে অপরিমিতও নয়। চতুর্থত রবীন্দ্রনাথের মতে "পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে···গদ্যে কবিতার রস দেওয়া"তেই উক্তপ্রকার কাব্য-রচনার সার্থকতা। একথা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, গদ্যকবিতায় পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না থাকলেও একটা অস্পষ্ট ঝংকার থাকা চাই। বস্তুত "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙা" হয় বটে; কিন্তু গদ্য-কাব্যের ধ্বনিবিন্যাস একেবারে অ-নিরূপিত অর্থাৎ যথেচ্ছ বা উচ্ছৃঙ্খলও নয়। রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্যকবিতাতেই ও-শ্রেণীর কবিতার ধ্বনিস্বরূপের কথা নিঃসংশয়রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

এমন সময় আওয়াজ এল কানে,
দাদামশায়, কিছু লিখেছ নাকি ?···
ওকে আমার কবিতা শোনাবার দাবি
সকলের আগে।
আমি বললেম, সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, আচ্ছা তাই সই।
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে,
বললে, তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রং ধরে পদ্যের।

—আকাশপ্রদীপ, ময়ূরের দৃষ্টি

ওই যে সূক্ষ্ম আবৃত্তভঙ্গিতে গদ্যেও পদ্যের রং ধরানো, অর্থাৎ ছন্দের আভাস ফুটিয়ে তোলা, ওখানেই গদ্যকবিতার ধ্বনিসৌষ্ঠবগত সার্থকতা।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি তথা প্রয়োগ থেকে একথা নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, গদ্যকবিতাতেও একটি অনতিনিরূপিত ধ্বনিচ্ছন্দ তথা অনতিস্পষ্ট ঝংকার বা ধ্বনিস্পন্দন (rhythm) থাকা চাই। অবস্থাটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, গদ্যকবিতার ধ্বনিবিন্যাস 'অসংকুচিত' ও অবারিতগতি গদ্যের ন্যায় সম্পূর্ণ অবাধ এবং মুক্তও নয়; আর, 'সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠিত' পদ্যকবিতার মতো 'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধনে' আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধাও নয়।

নিরলংকার সরল ভাষায় তার মানে এই যে, গদ্যকবিতায় সুস্পষ্ট ছন্দ নেই বটে, কিন্তু ছন্দের আভাস আছে। এরকম ছন্দের আভাস তথা ধ্বনি-সুষমাযুক্ত গদ্যকবিতাকে 'ছন্দোগন্ধি' বা 'পদ্যগন্ধি' কবিতা বলে অভিহিত করাই সমীচীন। কেননা ওসব কবিতার ভাষা 'অসংকুচিত' বা নিছক আটপৌরে গদ্যরীতিসম্মত নয়। ওরকম রচনার ধ্বনিতে কিঞ্চিৎ ছন্দের আভাস দেবার জন্যে সাধারণ আটপৌরে গদ্যভাষাকে যে কিছুপরিমাণে বিপর্যস্ত করতে হয়, একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত সাধারণ গদ্যের অন্বিত অংশগুলিকে একটু সাধারণভাবে বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যই হল গদ্যের ভঙ্গির মধ্যেও কতকটা ছন্দের আভাস সঞ্চার করা।

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাধারণ গদ্যরচনাতেও অবস্থাবিশেষে ভাবের উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে কোনো কোনো স্থলে ছন্দের আভাস ফুটে ওঠে। এসমস্ত ছন্দ-আভাসময় গদ্যাংশগুলির সঙ্গে ছন্দোগন্ধি গদ্যকবিতার পার্থক্য এই যে, উক্ত গদ্যাংশগুলির ছন্দোগন্ধ অর্থাৎ ছন্দের আভাস আকস্মিক কিন্তু গদ্যকবিতায় তা নয়। আর সাধারণ গদ্যরচনায় ছন্দের আভাস এখানে-ওখানে ফুটে ওঠে, সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকে না; কিন্তু গদ্যকবিতার সর্বাঙ্গই ওরকম ছন্দের আভাসে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছন্দের ইঙ্গিতময় গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অজ্ঞাত ছিল না। অংশত ছন্দোগুণযুক্ত গদ্যরচনাকে শাস্ত্রকার 'বৃত্তগন্ধি' নামে অভিহিত করেছেন।[১] অবশ্য সংস্কৃত বৃত্তগন্ধি

১ ছন্দোমঞ্জরী ৭।৫।

গদ্যরচনা এবং আধুনিক ছন্দোগন্ধি গদ্যকবিতার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত আধুনিক কালের 'ছন্দাভাস'সমুজ্জ্বল গদ্যকবিতা তৎকালে অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন গদ্যকাব্য ছিল মূলত ভাবরসময়, সুসমঞ্জসভাবে ধ্বনিরূপের আভাযুক্ত গদ্যরচনার রীতি তখন ছিল না; তখনকার দিনে তা আশাও করা যায় না।

ধ্বনিময় বাক্ ও ভাবময় অর্থ পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, একথা অন্তত কালিদাসের কাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। ছন্দোবদ্ধ কবিতায় এ-দুয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতখানি, তা ভেবে দেখা দরকার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ছন্দোবদ্ধ রচনায় বাক্ ও অর্থ, ধ্বনি ও ভাবের সমান প্রাধান্য থাকে না; অর্থাৎ এ উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায় না। গানে যেমন সুরের প্রবাহে বহুস্থলেই বাক্‌বন্ধনের গ্রন্থি বহুধা বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, কথার অন্বয় ভেঙে-চুরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কাব্যছন্দের আবেগে ধ্বনিবাহী বাক্যের এত বিপর্যয় না ঘটলেও ছন্দোবদ্ধ কাব্যে বাক্‌রীতির বৈয়াকরণিক বিধান সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে না। ধ্বনিগত সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়োজনে কবিকে ছন্দের বহু বিধিবিধান মেনে চলতে হয়; তার ফলে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পারস্পরিক অন্বয়কে বহুস্থলেই লঙ্ঘন করতে হয়। মেঘদূতের প্রথম শ্লোকে 'কশ্চিৎ যক্ষঃ বসতিং চক্রে' এই কথাটা ছন্দের প্রয়োজনে কিভাবে বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তা মনে করলেই পূর্বোক্ত মন্তব্যের সার্থকতা বোঝা যাবে। বাংলা কবিতায় এতটা দূরান্বয় স্বীকৃত না হলেও ছন্দের প্রয়োজনে অন্বয়কে অনেকখানি উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়, একথা কবিতাপাঠক বালকেরও সুবিদিত। তার চেয়েও বড কথা, বাক্‌রীতির প্রধান অঙ্গ যে যতি ও প্রস্বর (accent), ছন্দের খাতিরে তাকেও বহুস্থলেই উল্লঙ্ঘন করা হয়; ফলে বাক্যের স্বাভাবিক যতি ও প্রস্বর অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকৃত হয়। সাধারণ গদ্যরচনাতেও বাক্যের ধারা অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হয় না; শব্দার্থের অন্বয় অনুসারে বাক্য স্বভাবতই কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত হয়। এ-রকম অর্থগত বাক্যখণ্ডকে বলতে পারি 'বাক্‌পর্ব'; আর যেহেতু বাক্‌পর্ব

হচ্ছে মূলত অর্থানুসারী, সেজন্যে ওই বাক্‌পর্বকে 'ভাবপর্ব' বলেও গ্রহণ করা যায়। ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেও বাক্য পর্বে পবে বিভক্ত হয়; কিন্তু সে পর্ব-বিভাগ গৌণত অর্থগত হলেও মুখ্যত ধ্বনিসৌষম্যের প্রয়োজনগত। সুতরাং গদ্যরচনার উক্তপ্রকার বিভাগকে ভাবপর্ব এবং পদ্যরচনার বিভাগকে ধ্বনি-পর্ব বলে অভিহিত করা সমীচীন। দেখতে পাচ্ছি, গদ্যে যতি, প্রস্বর ও পর্ববিভাগ ভাবগত; আর পদ্যে সেগুলি মূলত ধ্বনিগত, যদিও ভাব যাতে ধ্বনির দ্বারা আচ্ছন্ন না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। তাছাড়া, মিলের খাতিরে পদ্যরচনায় যে শব্দযোজনার স্বাধীনতা অল্পবিস্তর ব্যাহত হয়, তা সর্বজনবিদিত। এককথায়, গদ্যে ধ্বনি সর্বদাই রচয়িতার মনোভাবের অনুগত হয়ে চলে; কিন্তু পদ্যে ভাবকে অনেকাংশেই ছন্দোগত ধ্বনিপ্রয়োজনের অনুগামী হয়ে চলতে হয়। এইজন্যেই কবিসমাজে ছন্দের বিধিবিধানকে ছন্দের বন্ধন বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পদ্যরচনায় ছন্দের বন্ধনকে মেনে নিতে হয় বলে কবিকে অনেকাংশেই ভাবগত স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয়; আর গদ্যরচনায় ছন্দোবন্ধের বালাই থাকে না বলে রচয়িতার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে।

অবশ্য যে রচনায় ভাব ও ছন্দের পূর্ণ সমতা রক্ষিত হয়, তা-ই হচ্ছে আদর্শ কবিতা। কিন্তু সে সমতা রক্ষা করা খুব সুসাধ্য নয়। অনেক স্থলেই ছন্দের সোনার শিকলে বাঁধা পড়ে ভাবের অবাধ গতি অল্পবিস্তর ব্যাহত হয়। তাই কবিকে অবস্থাবিশেষে ভাবের প্রাধান্য রক্ষার জন্যে ছন্দের বাঁধনকে শিথিল করে দিতে হয়। বাংলা দেশে একাজ সর্বপ্রথমে করেছিলেন মধুসূদন। যতিস্থাপনের বাঁধাধরা রীতি এবং মিলের বন্ধনকে ছিন্ন করে তিনি আমাদের সাবেক পয়ারছন্দকে কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তি দান করেছিলেন, তা আজ আর কারও অবিদিত নেই। রবীন্দ্রনাথ ওই প্রবহমান ছন্দের প্রতিপংক্তির নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যার বন্ধনকেও অস্বীকার করার রীতি প্রবর্তন করে ও-ছন্দকে আরও কত মুক্ত করে তুলেছেন, তার প্রমাণ রয়েছে 'বলাকা' থেকে 'পরিশেষ' পর্যন্ত বইগুলিতে। 'পরিশেষ' কাব্যেই মুক্তক ছন্দের পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে।

কিন্তু মুক্তক ছন্দও ছন্দ; সুতরাং তাতেও কবিকে ধ্বনিবিন্যাসগত বিধিবিধান কিছু না কিছু মেনে চলতে হয়। এইটুকু বন্ধনকেও অস্বীকার করে কাব্যরস অব্যাহত রাখা যায় কিনা, সে পরীক্ষা করার জন্যে কবিচিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাই দেখতে পাচ্ছি, 'পুনশ্চ' কাব্যে (১৯৩২) ধ্বনিগত ছন্দের আভাসমাত্র রেখে তিনি 'অসংকুচিত' গদ্যরীতির রচনাতেই কাব্যরস সঞ্চার করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং 'পত্রপুট' গ্রন্থে (১৯৩৫) এই ছন্দোগন্ধি গদ্যকবিতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

এই গদ্যকবিতায় দেখতে পাই গুচ্ছে গুচ্ছে সাজানো বাক্‌পর্বরাশি। এই বাক্‌পর্বগুলি মূলত গদ্যরীতির মতো ভাবেরই পর্ব; তাই এগুলি পদ্যের ধ্বনি-পর্বের মতো সুপরিমিত এবং সুনিরূপিত নয়। কাজেই তাতে সহজেই গদ্যের ভাবানুসারী যতি, প্রস্বর ও অন্বয় অনেক পরিমাণে সুরক্ষিত হয়। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার ছন্দকে 'ভাবচ্ছন্দ' (অর্থাৎ ভাবানুসারী পর্ববিন্যাসমূলক ছন্দ) বলে অভিহিত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ভাবচ্ছন্দ কথাটিকে হেঁয়ালির মতো বোধ হলেও গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে ওকথাটির সার্থকতা উপলব্ধি হবে। অথচ পূর্বেই বলেছি এজাতীয় কবিতা একেবারে ধ্বনিরূপহীনও নয়। কারণ এসব রচনার ভাবানুসারী বাক্‌পর্বগুলি সাধারণ গদ্যের মতো একান্ত অপরিমিত বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। ভাবকে অব্যাহত রেখে পর্বগুলিকে এমনভাবে ঈষৎ-একটু নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাতে তাদের মধ্যে একটি অনতিস্পষ্ট ঝংকার বা ছন্দের আভাস (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পদ্যের রং') ফুটে ওঠে। তাই এই ছন্দোগন্ধি গদ্যরচনার মধ্যে শব্দের বিন্যাস অসংকুচিত গদ্যের সুকঠোর অন্বয়ের অনুবর্তীও নয়, অথচ পদ্যের ছন্দপ্রবাহে ভেসে-চলা কুসুমদামের মতো সুসজ্জিতও নয়। এখানে একটা কথা বলা দরকার। কঠোর নিয়মের অনুবর্তী হয়ে চলতে গেলে রচয়িতার স্বাধীনতা খর্ব হয় বটে, কিন্তু নিয়ম মেনে চলার মধ্যে একটা আরাম এবং সুবিধাও আছে। সেটি এই যে, ওসব ক্ষেত্রে রচয়িতার দায়িত্ব বহুলপরিমাণেই কমে যায়; কেননা তখন রচনার অনেকখানি দায় গিয়ে পড়ে ওই নিয়মেরই উপর, তা সে নিয়ম ব্যাকরণের অন্বয়গতই হোক আর

ছন্দশাস্ত্রের ধ্বনিপরিমাণগতই হোক। ওই নিয়মই রচনাকে বহুলাংশে সংযত করে রাখে। কিন্তু গদ্যকবিতায় ব্যাকরণের অন্বয়গত নিয়মের বন্ধনকেও অনেকখানি শিথিল করে দেওয়া হয় এবং ছন্দের মাত্রাগত নিয়মকেও মেনে চলার প্রয়োজন থাকে না। তাই রচনাকে সৌষ্ঠবের সীমার মধ্যে সংযত করে রাখার সমস্ত দায়িত্ব নির্ভর করে রচয়িতার রসবোধের উপর। স্বাধীনতালাভের এই দায়িত্বভার বহন করা সহজ নয়। এ-হিসাবে দেখা যাবে, ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করাই বরং সোজা; স্বচ্ছন্দবিহারী গদ্যকবিতা লেখা মোটেই তা নয়। ওরকম গদ্যরীতির রচনা শক্তিশালী কবির পরিণত রসবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

এবার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

মহাকাল, | সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের | তরঙ্গ-শিখরে |
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে | সৃষ্টি, |
আবার নেমে যাচ্ছে | ধ্যানের তরঙ্গতলে
প্রচণ্ড বেগে চলেছে | ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য, |
তারি | নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে |
তুমি আছ | অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, | দাও আমাকে | তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, | পাওয়া আর হারানোর | মাঝখানে, |
যেখানে আছে | অক্ষুব্ধ শান্তি, |
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নি-শিখার | অন্তরতম |
স্তিমিত নিভৃতে |
দাও আমাকে শান্তি।

—শেষসপ্তক, সাত

এখানে বাক্‌পর্বগুলিকে দণ্ডচিহ্নের দ্বারা বিভক্ত করে দেখানো হল। পাঠকের অভিরুচি এবং আবৃত্তিভঙ্গি অনুসারে ওসব বিভাগের সামান্য ইতর-বিশেষ হওয়া অসম্ভব নয়। যাহোক, প্রবহমান মুক্তক ছন্দের অবাধ গতি

এখানেও সুস্পষ্ট; বাক্‌পর্বগুলি সর্বত্রই ভাবানুসারী। কিন্তু ওই বাক্‌পর্ব বা ভাবপর্বগুলি কোথাও পদ্যের ধ্বনিপর্বের মতো সুপরিমিত ও সুনিরূপিত নয়। অথচ সর্বত্রই একটি অনতিস্পষ্ট ঝংকার, একটি ধ্বনিরূপের ব্যঞ্জনা ও ছন্দের আভাস এই রচনাটিকে নেহাত গদ্যত্বের নীরসতা থেকে ধ্বনি ও ভাবের ব্যঞ্জনা-মহিমায় বিকশিত করে তুলেছে; সমগ্র রচনাটি যেন পদ্যছন্দের একটি ফিকে রঙে ঈষৎ রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। এই কলাকৌশলের মধ্যেই রবীন্দ্ররচিত ছন্দোগন্ধি গদ্যকবিতার মর্মগত ধ্বনিসৌন্দর্য নিহিত রয়েছে।

গদ্যকবিতার গঠনপ্রকৃতির বিচার করা যেতে পারে দুটি বিভিন্ন দিক্‌ থেকে। এক হিসেবে একে গদ্যরীতিরই পদ্যাভাসময় রূপান্তরবিশেষ বলে গ্রহণ করা যায়। গদ্যরচনার মধ্যেও এমনভাবে ভাবের আবেগ সঞ্চার করা সম্ভব যে, ওই আবেগের কম্পনেই সে রচনার ধ্বনি উঠবে স্পন্দিত হয়ে। ওই আবেগ-ভরা ধ্বনিস্পন্দনময় গদ্যরচনা নিশ্চয়ই কাব্যের মর্যাদালাভের অধিকারী। আরেক হিসাবে গদ্যকবিতাকে পদ্যরচনারই ছন্দের বাঁধনছেঁড়া মুক্তরূপ বলেও গণ্য করা যেতে পারে। তাতে ছন্দোবদ্ধ কবিতার সব গুণই অব্যাহত আছে, কেবল তার অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধনটিকে ছিন্ন করে দিয়ে তার আভাস-মাত্র রেখে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা রচনায় অগ্রসর হয়েছেন কোন্‌ দিক্‌ থেকে, এমন প্রশ্ন হতে পারে। তিনি গদ্যকেই পদ্যের প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত এবং একটুখানি ছন্দের রঙিন আভায় মাধুর্যময় করে তুলেছেন, একথা বললে অন্যায় হবে না। কিন্তু তাঁর কবিজীবনে ছন্দোবিবর্তনের ক্রমপরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখলে, 'বলাকা' ও 'পলাতকা' থেকে 'পরিশেষ' এবং 'পরিশেষ' থেকে 'পুনশ্চ' গ্রন্থে কিভাবে তিনি কাব্যকে ছন্দের আধিপত্য থেকে ক্রমশ মুক্তি দিয়েছেন সেদিকে লক্ষ্য করলে, স্বীকার করতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে ছন্দোমুক্তিসাধনার ফলেই গদ্যকবিতার আবির্ভাব হয়েছে। মুক্তক ছন্দে যে সাধনার সূচনা হয়েছিল তারই পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে এই গদ্যকবিতায়।

বস্তুত এই গদ্যকবিতাগুলিতেই রবীন্দ্রনাথ রসরচনার পরিপূর্ণ ছন্দোমুক্তি

ঘটিয়েছেন, অর্থাৎ কাব্যরসকে ধ্বনিরূপের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ছন্দের ঐন্দ্রজালিক যে রবীন্দ্রনাথ আজীবন ধ্বনিরূপের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে কাব্যের তাজমহল গড়েছেন, সেই রবীন্দ্রনাথই পরিণত বয়সে কাব্যের রসকে রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্যে ব্যাকুল হলেন, এটা অনেকের কাছেই পরম বিস্ময়ের মতো ঠেকেছে। আমাদের চিত্ত যেদিন সচেতন হয়ে রসানুভূতিলাভে সমর্থ হল, সেদিন থেকেই অবিশ্রান্ত-ভাবে তাঁর অজস্র ছন্দের বিচিত্র রূপে ও রসে মুগ্ধ ও অভিষিক্ত হয়ে আসছে। তাঁর ছন্দের প্রাচুর্যে ও মাধুর্যে আমাদের হৃদয় এমনই একান্তভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, পরিণতকালে তিনি যখন কাব্যকে বাহ্য রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন তখন আমাদের ছন্দপিঞ্জরবাসী হৃদয়টা ধ্বনিরূপের সোনার শিকলটার জন্যেই হায় হায় করে উঠল। কিন্তু অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ যেমন পাওয়া যায় বন্ধনহীন ব্যঞ্জনাময়তার মধ্যেও তেমনি সৌন্দর্য-রস পাওয়া অসম্ভব নয়, একথা স্বীকার করা চাই। সুনিপুণ কলাবিতের হাতে সুনিয়ন্ত্রিত জলতরঙ্গ বাজনায় যেমন রস ও আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি সীমাবন্ধনহীন অকূল সমুদ্রের অনিয়ন্ত্রিত জলধিতরঙ্গেও একরকম ভীমকান্ত সৌন্দর্যের আভাস মেলে।

যাহোক, একথা সত্য যে, পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ বাহ্য রূপসৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান না করেও রূপাতীত অন্তঃসৌন্দর্যের 'পিয়াসী' হয়েছিলেন। একদিকে যেমন তার প্রমাণ পাই তাঁর ছন্দোগন্ধি গদ্যকবিতায়, অপর দিকে তেমনি এর প্রমাণ রয়েছে তাঁর রূপগন্ধি চিত্রশিল্পে। অতিনিরূপিত-ছন্দোবন্ধনহীন গদ্য-কবিতা এবং অতিনিয়ন্ত্রিত-রূপরেখাহীন চিত্রশিল্পরচনায় তিনি যে প্রায় একই কালে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এটা নেহাত আকস্মিক নয়। তাঁর অন্তর্নিহিত রূপাতীত সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস আত্মপ্রকাশ করেছে এই উভয় ক্ষেত্রেই। আর, ধ্বনি ও বর্ণের রূপরেখাময় সৌন্দর্যে চিরাভ্যস্ত আমাদের হৃদয় ওই একই কারণে রবীন্দ্র-নাথের গদ্যকবিতা ও চিত্রশিল্পের রসগ্রহণে অসমর্থ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষ

ছন্দ-সংলাপ

ক। পদ্যকবিতার ছন্দ

১

যে মূলতত্ত্বকে আশ্রয় করে আমি বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি, সে তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখি এবং সে বিষয়ে তাঁর মত কি জানতে চাই। দীর্ঘ পত্রে এ-বিষয়ের আলোচনা করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে বলে তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লেখেন। দেখা যখন হল (চৈত্র ১৩৩৮) তখন তিনি নিজেই ছন্দের কথা উত্থাপন করে বললেন—পাঁচটা unitকে দু-গুণ করে দশ unit হয় বটে; কিন্তু একেকটা unit তো দিনুর[১] মতো মোটাও হতে পারে, আবার একজন রোগা মানুষের মত সরুও হতে পারে। তেমনি সব ছন্দের unitগুলো আকারে সমান নয়।

আমি বললুম—ধ্বনির unitএর আকৃতি ও প্রকৃতির এই পার্থক্য অনুসারেই তো আমি বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতে চাই।

কবিগুরু বললেন—কিন্তু একসময়ে বাংলায় সব unitকেই সমান মূল্য দেওয়া হত; যুগ্ম-অযুগ্ম ধ্বনির পার্থক্য স্বীকার করা হত না। কিন্তু তিন unitএর ছন্দে, যাকে আমি বলেছি 'অসম' ছন্দ, তাতে যুগ্মধ্বনিকে এক unit ধরলে ভারি খারাপ শোনায়। এইটে অনুভব করেই তখনকার দিনে কবিরা এজাতীয় ছন্দে যুক্ত অক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করে চলতেন। যুক্ত অক্ষর সম্পূর্ণ বর্জন করে একটি কবিতা রচনা করতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন, মনে করতেন কবিতাটি খুব প্রাঞ্জল, সরল ও শ্রুতিমধুর হল। কবি বিহারীলালের কাছে আমার প্রথম শিক্ষা। তাঁর রচনাতেও যুক্তাক্ষর বড়ো কম।

১ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমারও বাল্যকালের রচনায় যুক্তাক্ষর খুব কম ; তবু মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়ে ছন্দকে বন্ধুর করে তুলেছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতেই তার নিদর্শন পাবে। তখনও আমি যুগ্মধ্বনিকে দু-মাত্রা বলে ধরতে আরম্ভ করিনি ; কারণ খারাপ শোনালেও তখনকার দিনে জবাবদিহি ছিল না। কিন্তু 'মানসী'র সময় থেকে আমি যুগ্মধ্বনিকে দু-মাত্রা বলে ধরতে শুরু করেছি।

আমি—তখন থেকেই তো বাংলায় এক নতুন ধরনের ছন্দের সূচনা হল।

কবি—এজাতীয় ছন্দ আমিই যে প্রথম করলুম, তা নয়।

আমি—বৈষ্ণব পদাবলীতেও অবশ্য ছ-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন আছে। কিন্তু তার উচ্চারণভঙ্গি তো ঠিক বাংলা নয়, সংস্কৃতপন্থী।

কবি—কেন, চণ্ডীদাসের ছ-মাত্রার ছন্দ তো বাংলা-উচ্চারণ-অনুযায়ী। যথা—

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরান সহিতে মোর।

যাহোক, 'মানসী'র সময় থেকে আমি অসমমাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দু-মাত্রার value দিয়ে আসছি এবং এখন বাংলা সাহিত্যে এই রীতিটাই চলে গেছে। আজকাল আর কোনো কবি অসমমাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে চালাতে সাহস করেন না ; আর করলেও তাঁকে কেউ ক্ষমা করবে না। কিন্তু আমি নিজেও একটিমাত্র রচনায় এরকম করেছি। যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি।

আমি বললুম—আবৃত্তির ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখলে এ-ছন্দটাকে সমর্থন করাও যেতে পারে।

কবি—তা যেতে পারে। কিন্তু তবু ওটা ঠিক হয়নি। ওরকম না করলেই ভালো হত। বাস্তবিক ও-কবিতাটির জন্যে আমি একটু কুণ্ঠিত আছি। ওরকম করার একটু কারণও আছে। যুগ্মধ্বনিকে দু-মাত্রা হিসেব করে ছন্দ রচনা না করলে ও-ছন্দে 'অনাথপিণ্ডদ' কথাটা ব্যবহার করা মুশকিল। তাই

সমস্ত কবিতাটিতেই যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলেই চালিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু অসমমাত্রার আর কোনো ছন্দেই আমি যুগ্মধ্বনিকে এক unit বলে গণ্য করিনি।

তারপরে কবি সমমাত্রার ও অসমমাত্রার ছন্দের প্রসঙ্গ তুলে বললেন—সমমাত্রার ছন্দের অর্থাৎ পয়ারজাতীয় ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এ-ছন্দে দুই চার ছয় আট দশ প্রভৃতি দুয়ের multipleএর পর ইচ্ছামতো যতি স্থাপন করা যায়। এখানেই এ-ছন্দের শক্তি। আর এজন্যেই এজাতীয় ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ (*enjambement*) চালানো সম্ভব হয়েছে। আঁজাঁব্‌মাঁ শব্দের তুমি কি বাংলা করেছ?

আমি বললুম—প্রবহমানতা।

কবি—যেখানেই দুয়ের multiple পাওয়া যায়, সেখানেই থামতে পারা যায় বলেই প্রবহমান পয়ার রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এ-ছন্দে অযুগ্মসংখ্যার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর যতি দিয়েছেন। এটাকে অবশ্য এক রকম করে সমর্থনও করা যায়। কিন্তু তথাপি বলতে হয় যে, এ-ছন্দে অযুগ্ম unitএর পর যতি না দেওয়াই রীতি। আর এজন্যেই অসমমাত্রার ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ বা প্রবহমানতা আনা যায় না। যে-ছন্দে তিনের পর ভাগ, যাকে আমি বলেছি অসমমাত্রার ছন্দ, তাতে যেখানে-সেখানে থামা যায় না, লাইনের মধ্যেও থামা যায় না, একেবারে লাইনের শেষে গিয়ে থামতে হয়। যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
                    হেরিলেন সুর-নদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী-রতন
                    খেলা করে নীল-নলিনী-দলে।

আমি—এজাতীয় ছন্দকেও তো সব সময় তিন-তিন মাত্রায় ভাগ করা যায় না।

কবি—হাঁ, তা ঠিক। দুয়ের multiple না হলে থামবার জায়গা পাওয়া যায় না। এজন্যেই এসব ছন্দেও ছ-মাত্রার পরেই থামতে হয়।

আমি—ছ-মাত্রার পরেই যতি থাকে বলে আমি এ-ছন্দকে 'ষণ্মাত্রপর্বিক' ছন্দ বলি।

কবি—লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, অসমসংখ্যার পরে ধ্বনি থামতে পারে না। সেখানে একটা ভাগ থাকলেও ধ্বনিটা পরবর্তী বিভাগের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। যেমন—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী।

এখানে 'পঞ্চশরে' কথাটার পর যতিটা স্থায়ী হয় না।

তারপরে প্রসঙ্গক্রমে তিনি accentএর বিষয়[১] উত্থাপন করে বললেন—ইংরেজি ভাষার একটা মস্ত গুণ এই যে, ও-ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা বিশেষ জোর আছে; সেটা ও-ভাষার accentএর জন্যেই হয়। প্রত্যেকটি শব্দই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, অন্য কথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। শব্দগুলিকে এভাবে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় বলেই ইংরেজি ছন্দ এমন তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না। এজন্যে বাংলায় আমরা এক ঝোঁকে অনেকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে আবৃত্তি করে যাই; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই অর্থবোধ হয় না। অর্থবোধের জন্যে বিষয়টাকে আবার ফিরে পড়তে হয়। এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' প্রভৃতি পংক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছ। অল্পবয়সে আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলুম, পরবর্তী কালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই সমতলতা, এই দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করেছি।

[১] দ্রষ্টব্য 'ছন্দ' (২য় সং), ১-২, ৮-৯, ১২২ পৃষ্ঠা।

তারপর কবিকে একটু ক্লান্ত দেখে বিদায় নিয়ে যাবার সময় তিনি রহস্য করে বললেন—অন্য সময় আবার এস। তখন তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা যাবে।

২

সন্ধ্যার পর আবার যখন তাঁর কাছে গিয়ে বসলুম, তখন তিনি সস্নেহে বললেন—তোমার কি কি জিজ্ঞাস্য আছে বুঝিয়ে বল দেখি। তারপরে তোমার কথার উত্তরে যা বলবার আছে তা বলব। তখন আমি আমার বক্তব্য বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে বুঝিয়ে বলতে লাগলুম। তিনি প্রসন্ন ধৈর্যের সঙ্গে মন দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর যা বক্তব্য তা খুব স্পষ্ট করে বোঝাতে লাগলেন।

আমি বললুম—কয়েকটি মূলতত্ত্বকে অবলম্বন করে বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে আমি আপনার কাব্যের ছন্দোনির্ণয়ের কাজেই প্রবৃত্ত হয়েছি। একাজে আমি দুটি প্রণালী অবলম্বন করতে চাই। প্রথমত 'মানসী' থেকে 'বনবাণী' পর্যন্ত কাব্য-গুলিকে একে একে ধরে তার প্রত্যেকটি কবিতার ছন্দের analytic বিচার করব এবং তারপর সব কবিতার ছন্দের analysisএর উপর নির্ভর করে একটা synthetic আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে আপনার সব কবিতাকে আমি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করব। এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানা আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

কবিগুরু বললেন—তুমি কি কি শ্রেণীতে ভাগ করতে চাও?

আমি—আপনি যাকে বলেছেন 'পয়ারজাতীয়' ছন্দ, সেগুলির কথাই আগে বলছি। সাধারণত 'অক্ষর'সংখ্যার সাহায্যেই এ-ছন্দগুলির পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন—চোদ্দ অক্ষরের পয়ার, আঠার অক্ষরের পয়ার। তাই প্রচলিত প্রথাকে একেবারে অগ্রাহ্য না করে আমি প্রথমে এগুলিকে বলেছিলুম 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ। কিন্তু আপনি বলেছেন 'আক্ষরিক ছন্দ' বলে কোনো ছন্দ হতে পারে না, কারণ ছন্দ তো ধ্বনি নিয়ে কারবার করে, আর অক্ষর তো ধ্বনির চিহ্নমাত্র।

আমিও বারবার ওকথাই বলেছি। কাজেই 'চোদ্দ অক্ষরের পয়ার', 'আঠার অক্ষরের পয়ার' এরকম পরিচয়টা ঠিক নয়। এসব ছন্দে ধ্বনির পরিবেষণটা কিভাবে ঘটে তা-ই দেখা দরকার। আমি এ-ছন্দের ধ্বনিসন্নিবেশপ্রণালীটাই দেখাতে চেষ্টা করেছি।

কবি—যদি 'চোদ্দ অক্ষরের পয়ার' না বল তবে কি বলবে?

আমি—আমি বলি চোদ্দ unit বা ব্যষ্টির পয়ার। এই unitগুলির হিসাব কিভাবে করতে হবে আমি সেটাই দেখাতে চাই। অযুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই সমান, তাকে এক unit ধরা যায়। আর যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্র সমান নয়। আপনিই দেখিয়েছেন যে, আমাদের সাধারণ কথাবার্তাতেও আমরা যুগ্মধ্বনিকে কখনও ঠেসে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করি, আর কখনও টেনে বাড়িয়ে উচ্চারণ করি। যুগ্মধ্বনির সংক্ষিপ্ত উচ্চারণকে আমি বলি 'সংশ্লিষ্ট' উচ্চারণ, আর প্রসারিত উচ্চারণকে বলি 'বিশ্লিষ্ট' উচ্চারণ। যদি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিকে এক unit এবং বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিকে দুই unit ধরা যায়, তাহলে আমরা সাধারণ পয়ারেও ধ্বনিসন্নিবেশের একটা নির্দিষ্ট প্রণালী পাই।

এ-বিষয়ে কবির সমর্থন পেয়ে আমি একটু উৎসাহিত হয়ে বললুম—ওই নির্দিষ্ট প্রণালীটা হচ্ছে এই যে, সাধারণ 'পয়ারজাতীয়' ছন্দে প্রত্যেকটি শব্দকে গদ্যের মতো স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করতে হয়; তাই প্রত্যেক শব্দকে পরবর্তী শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন। এজন্যেই আমরা এ-ছন্দে শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করি এবং কাজেই তার মূল্য দুই unit। কিন্তু শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে সাধারণত বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করি না। কাজেই তার মূল্যও এক unitএর বেশি নয়। আপনি বলেছেন যেখানে-সেখানে যুগ্মধ্বনি থাকা সত্ত্বেও পয়ারের ভারসাম্য নষ্ট হয় না, এটা এ-ছন্দের একটা অসাধারণ গুণ। আপনার একথা খুবই সত্য। আমার মনে হয় যুগ্মধ্বনিকে আমরা প্রয়োজনমতো সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করি বলেই যেখানে-সেখানে যুগ্মধ্বনি থাকা সত্ত্বেও এ-ছন্দের ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে থাকে।

কবি দৃষ্টান্তের কথা বলাতেই আমি বললুম—

মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

এখানে তের্, মান্, রাম্, দাস্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিকে আমরা টেনে পড়ে দু-মাত্রার মর্যাদা দিয়ে থাকি, হসন্ত র্, ন্, ম্, স্-কে তো একেকটি 'অক্ষর' বলে গোনা যায় না। পক্ষান্তরে 'পুণ্য' শব্দের 'পুণ্'কে আমরা ঠেসে উচ্চারণ করি। তাই ছন্দ ঠিক থাকে। মাঘের 'পরিচয়'এ আপনি পয়ারের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেছেন—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল।[১]

এখানে 'অক্ষর'সংখ্যা বেশি হয়েছে বটে; কিন্তু শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট এবং শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট বলে এই লাইনটাতে চোদ্দ unit ঠিক আছে।

তারপর আমি আরেকটি দৃষ্টান্ত দিলুম—

দিনেরে মাভৈঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজনায়।[২]

কবি নিজেই বললেন—এখানে 'ভৈঃ' ধ্বনিতে দুই unit এবং 'অন্ধকার'এর 'অন্'এ এক unit হয়েছে।

আমি বললুম—এইটেই এ-ছন্দের নিয়ম। যদি এ-ছন্দে 'ভৈরব' শব্দটা ব্যবহার করা যায়, তবে 'ভৈ'কে এক unit বলেই ধরা হবে।

কবি একটু ভেবে বললেন—

ভৈরব রবে যবে শৃঙ্গ ফুকারে

এখানে তো 'ভৈ'তে দুই unit ধরা হয়েছে।

আমি বললুম—এটাও পয়ারেরই লাইন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যপ্রকৃতির পয়ার। একে আমি বলি 'মাত্রাবৃত্তপয়ার'। কারণ, এ-ছন্দে অবস্থান-নির্বিশেষে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্বত্রই বিশ্লিষ্ট।

১ ছন্দের হসন্ত হলন্ত: পরিচয়, ১৩৩৮ মাঘ; পুনর্মুদ্রিত: ছন্দ (২য় সং), পৃ ৫৯-৭৯।
২ পৃ ৪২ দ্রষ্টব্য।

এ-কথার উত্তরে কবি শুধু বললেন—সে কথা ঠিক।

তারপর আমি বললুম—'পরিচয়'এ আপনি দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, 'চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে' ইত্যাদি, যাতে 'চিম্‌নি' শব্দে একবার দুই unit এবং মারেকবার তিন unit ধরা হয়েছে। পয়ারজাতীয় ছন্দে 'চিম্‌নি' শব্দে কয় ınit ধরা সাধারণ নিয়ম ?

কবি বললেন—ও-তর্কটা কি ভাবে উঠেছিল তা তো তুমি জান। নীরেন ায় লিখেছিল, 'একটি কথা এতবার হয় কলুষিত'। মণ্টু[১] প্রশ্ন তুলেছিল, একটি'কে দুই ধরতে হবে, না তিন ধরতে হবে। আমি এই উপলক্ষ্যেই 'চিম্‌নি' াব্দটাকেও এনেছিলুম। পয়ারে 'চিম্‌নি' শব্দে দুই unit ধরাই সাধারণ নিয়ম, তবে তিন unitও ধরা যায়, একথাটাই আমি বলতে চাই।

আমি বললুম—এজাতীয় ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক এবং কাথাও সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক হয় বলেই আমি এ-ছন্দকে **'যৌগিক'** ছন্দ নাম দতে চাই। এ-বিষয়ে আপনার মত কি ?

কবি—তুমি এসব ছন্দকে 'যৌগিক' নাম দিতে পার। আমার আপত্তি নই। নামে কিছু আসে যায় না। ছন্দের প্রকৃতি-অনুসারে ভাগ করলেই হল।

আমি—যেসব ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দ্বৈমাত্রিক তাকে আমি বলি **মাত্রাবৃত্ত**।

কবি—এসব ছন্দকেই আমি বলেছি অসম বা তিনমাত্রার ছন্দ।

আমি—শুধু যে ত্রৈমাত্রিক ছন্দেই যুগ্মধ্বনির ডবল মূল্য হয় তা নয়, দ্বমাত্রিক ছন্দেও তা হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়', বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে', 'এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের', 'বুঝিয়াছি এজীবন একেবারে মরু না' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

কবি—এগুলি একটি স্বতন্ত্রশ্রেণীর ছন্দ বটে; চার মাত্রায় একেকটি ভাগ চ্ছে। তুমি তো জানই 'মানসী'তে আমি প্রথম এরকম ছন্দ রচনার চষ্টা করেছিলুম।

[১] দিলীপকুমার রায়।

আমি—'মানসী'তে 'নিষ্ফল উপহার' ও 'কবির প্রতি নিবেদন', এই দুটি কবিতায় তা দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ পয়ারজাতীয় ছন্দে দ্বৈমাত্রিক যুগ্মধ্বনি ব্যবহার করায় তা ভাল হল না। পরে চার-চার মাত্রায় ভাগ করাতে খুব সুন্দর 'মাত্রিক পয়ার' রচিত হয়েছে।[১]

এস্থলে আমি প্রসঙ্গক্রমে বললুম— পয়ার, ত্রিপদী শব্দ দ্বারা ঠিক ছন্দ বোঝায় না, বোঝায় ছন্দোবন্ধ। কারণ, পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি তিন রকমের হতে পারে। যৌগিক পয়ার ('সাত কোটি সন্তানেরে' ইত্যাদি), মাত্রিক পয়ার ('বরষার নির্ঝরে' ইত্যাদি), আর স্বরবৃত্ত পয়ার। আপনি যাকে বলেছেন 'প্রাকৃত ছন্দ', তাকেই আমি বলেছি **স্বরবৃত্ত**। এ-ছন্দটা আসলে syllabic; প্রত্যেক syllableএই একটি করে স্বর অর্থাৎ vowel থাকা চাই বলে নাম দিয়েছি স্বরবৃত্ত।

কবি বললেন—তুমি যে প্রাকৃত ছন্দকে চার-চার সিলেব্‌ল্‌এ ভাগ কর সেটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। আমি বলি এ-ছন্দে তিন মাত্রার ভাগটাই মূল কথা। এ-ছন্দে আমি যত গান রচনা করেছি তার সবগুলিতেই দাদরা তাল, সব সময়েই তিন মাত্রার ভাগ হয়।

আমি—সে কথা ঠিক বটে। আপনি 'পরিচয়'এ সে-দিক্‌টা দেখিয়েছেন গানের পক্ষে ধ্বনির মাত্রিক দিক্‌টাই মুখ্য, কিন্তু ছন্দের পক্ষে এর syllabic দিক্‌টাই মুখ্য। গানে এ-ছন্দের প্রতিপর্বে ছ-মাত্রা পাওয়া যায়, প্রকাশ্যত না থাকলেও সেটা পূরণ করে নিতে হয়। কিন্তু কবিতা পাঠ বা রচনার পক্ষে এ-ছন্দের প্রতিপর্বে ছয় মাত্রার দিকটা গৌণ, চাব সিলেব্‌ল্‌এর দিক্‌টাই মুখ্য। প্রতিপর্বে ছ-মাত্রা ঠিক রেখে সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যাকে তো ইচ্ছামতো পাঁচ বা ছয় করা চলে না।

কবি—এ-ছন্দে কি সর্বত্রই চার সিলেব্‌ল্‌এর ভাগ হয়?

আমি—সর্বত্রই হয়; তবে স্থলে-স্থলে তিনটি যুগ্ম বা দ্বিমাত্রক সিলেব্‌ল্‌ও

১ পৃ ৫৫-৬১ দ্রষ্টব্য।

চলে ; তাতে ছয় মাত্রা ঠিক থাকে। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়ম নয়, exception মাত্র। এ-ছন্দের পর্বগুলিতে কখনও পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্ চালানো যায় না।

কবি—তাহলে তো অন্যরকমের ছন্দ হয়ে যাবে।

আমি—কিন্তু এ-ছন্দটা মুখ্যত চার সিলেব্‌ল্‌এর হলেও গৌণত ছয় মাত্রারই বটে। ছ-মাত্রা প্রকাশ্যত না থাকলেও ছ-মাত্রার স্থান ঐ ছন্দে আছে। প্রয়োজনমতো আবৃত্তির সময় তা পূরণ করা যায়। আপনি 'পরিচয়'এ দেখিয়েছেন, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ইত্যাদি ছড়াটাকে তিন মাত্রায় ভাগ করা চলে।[১] কিন্তু সুর করে ছড়া-আবৃত্তির সময় এরীতিটা যেমন খাটে, কবিতা-পাঠের সময় তা ঠিক খাটে না। যেমন, 'ক্ষণিকা'র 'সেকাল' কবিতাটি।

কবি—'সেকাল' কবিতাতেও খাটে। এর লয় চার মাত্রার নয়। সেইজন্যে তিনের ভাগে যেখানে কম পড়েছে সেখানে টেনে পুরিয়ে দিতে হয়। যেমন—

আমি— | যদি— | জন্‌ম | নিতেম |
কালি— | দাসের | কালে— |

এরকম ছন্দে আমরা যে প্রত্যেক পর্বে ফাঁক ভরিয়ে নিই তা নয়, গানের তালের মতোই যেখানে সুবিধে পাই সেখানেই কর্তব্য সেরে নিয়ে থাকি। তাতে ছন্দোনৃত্যের বৈচিত্র্য ঘটে। ভালো করে বিচার করলে দেখতে পারবে, ঐ লাইনটাতে 'আমি যদি' দুই-দুই মাত্রায় দ্রুত পাঠ করে 'জন্ম' এবং 'নিতেম' শব্দের কাছ থেকে উভয়ের জরিমানা ডিক্রি করে নিয়েছি। নইলে ছন্দের তাল কাটতই, কেননা এটা নিঃসন্দেহ তিন-মাত্রার তাল। 'কালিদাসের' শব্দটাতেও ঐ রকম রফানিষ্পত্তি করতে হয়েছে। অর্থাৎ 'কালি'তে যেটুকু কম পড়েছে, 'দাসের' মধ্যে সেটা আদায় করে নিতে হল। সব ফাঁকগুলি ভরিয়ে দিয়েও আমি কবিতা লিখেছি।[২]

আমি—সেই রকম ছন্দকেই আমি নাম দিয়েছি **স্বরমাত্রিক**। এ-ছন্দে

[১] পৃ ১৮৮, পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।
[২] সেকাল···লিখেছি, এই অংশটুকু কবির স্বহস্তলিখিত।

স্বরসংখ্যা ও মাত্রাপরিমাণ দুটোই যুগপৎ ঠিক থাকে বলে এ-ছন্দকে স্বরমাত্রিক নাম দিয়েছি।

কবি—স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দাও দেখি।

আমি—'বিহঙ্গগান শান্ত তখন অন্ধরাতের পক্ষছায়ে', এখানে প্রতিপর্বে চার স্বর ও ছ-মাত্রা ঠিক আছে।[১]

কবি—'পূরবী'র 'বিজয়ী' কবিতাটিতে আমি মাত্রার ফাঁক পূরণ করতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সর্বত্র তা আমি পারিনি। কারণ ছন্দের নূতনত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে কবিতাকে তো খর্ব করতে পারিনে। কাজেই এই কবিতাটিতে কোনো কোনো জায়গায় মাত্রার ফাঁক আর পূরণ করা হয়নি। যারা কবিতা পড়বে তারাই ফাঁক পূরণ করে নেবে। ছন্দের ঝোঁক আপনিই পাঠককে ঠিক পথে চালায়।

তারপর কবি প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি 'বলাকা'য় যে নতুন রকমের ছন্দ রচনা করেছি তাকে তুমি কি নাম দিয়েছ? তাকেও কি তুমি প্রবহমান ছন্দ বল?

আমি বললুম—'বলাকা'র নতুন ছন্দও প্রবহমান বটে; কিন্তু শুধু প্রবহমান বললে এ-ছন্দের পুরো পরিচয় দেওয়া হয় না। কারণ এ-ছন্দে তো পংক্তির একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য নেই; এ-বিষয়েও তাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তাই এ-ছন্দকে আমি বলেছি **মুক্তক**।

কবি—মুক্তক? এ-নাম চলতে পারে।

আমি—অবশ্য শুধু বাইরের বাঁধন থেকেই মুক্তি ঘটেছে, ভিতরের বাঁধন থেকে নয়।

কবি—তা তো হবেই।

আমি—কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দকে আমি শুধু মুক্তক বলিনে, বলি 'যৌগিক মুক্তক'। কারণ 'পলাতকা'র ছন্দও তো মুক্তক; সে ছন্দকে আমি বলেছি 'স্বরবৃত্ত মুক্তক'।

১ পৃ ৯৬ দ্রষ্টব্য।

কবি—মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও মুক্তক রচনা করা যায় কি না আমি তা-ই ভাবছি। কিন্তু তাতে মুশকিল আছে। এ-ছন্দ গড়িয়ে চলে কি না, যেখানে-সেখানে থামানো যায় না।

আমি—কিন্তু পাঁচমাত্রার ছন্দে তো কতকটা মুক্তক আপনি রচনা করেছেন। 'মহুয়া'র 'সাগরিকা' কবিতাটি কতকটা মুক্তক ছন্দে রচিত।

কবি—আজকাল আমি ছ-মাত্রার মুক্তক রচনার চেষ্টা করছি।

তারপর তিনি তাঁর কবিতার খাতা থেকে কয়েকটি নবরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। ছ-মাত্রার ছন্দ, পংক্তিতে পংক্তিতে মিল আছে; কিন্তু পংক্তিদৈর্ঘ্যের কিছু স্থিরতা নেই, অথচ কবিতার ভাব বহু পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। তাঁর এই ছ-মাত্রার মুক্তক ছন্দের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হলুম। আজও তাঁর নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিকার্যে কিছুমাত্র বিরাম ঘটেনি। আজও তিনি নূতন ছন্দ-রচনায় সমানভাবে নিরত রয়েছেন।

৩

পরের দিন আবার যখন কবিগুরুর কাছে গেলুম তখন তিনিই ছন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন— ছন্দ এমন একটা বিষয় যাতে সকলে একমত হতে পারে না। তোমার সঙ্গে একমত হতে পারব এমন আশা করা যায় না। ছন্দ হচ্ছে কানের জিনিস; একেক জনের কান একেক রকম ধ্বনি পছন্দ করে। তাই আবৃত্তির ভঙ্গির মধ্যে এতটা পার্থক্য ঘটে। আমি দেখেছি কেউ কেউ খুব বেশি টেনে টেনে আবৃত্তি করে, আবার কেউ কেউ আবৃত্তি করে খুব তাড়াতাড়ি। কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে; আর আবৃত্তি করারও অভ্যাস থাকা চাই। আমি কিন্তু কবিতা রচনার সময় আবৃত্তি করতে করতেই লিখি; এমন কি, কোনো গদ্যরচনাও যখন ভালো করে লিখব মনে করি তখন গদ্য লিখতে লিখতেও আবৃত্তি করি। কারণ রচনার ধ্বনিসংগতি ঠিক হল কি না তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কান।

আমি—গদ্যরচনার মধ্যেই যে rhythm থাকা প্রয়োজন, একমাত্র কানের সাহায্য ছাড়া তো সে rhythmকে আয়ত্ত করার কোনো উপায় নেই।

কবি—বাংলায় rhythmic prose রচনা নেই। একসময়ে আমি rhythmic prose রচনার চেষ্টা করেছি। 'লিপিকা'তে সে rhythm ধরতে পারবে। 'লিপিকা'র রচনাগুলিকে আমি প্রথমে rhythm-রক্ষার জন্যে পদ্যের মতো ভাঙা-ভাঙা লাইনেই লিখেছিলুম। পরে গদ্যের মতো করেই ছাপানো হয়েছে।

আমি—Rhythmic proseকে rhythm-অনুযায়ী ভেঙে ভেঙে রচনা করার সার্থকতা আছে। তাতে rhythmটা সহজে ধরা পড়ে।

কবি—তা আছে। আমি একসময় সত্যেনকে বলেছিলুম বাংলায় rhythmic prose রচনা করতে, কিন্তু সে তো তা করলে না। সে কবিতার ছন্দের ঝংকারে এমন আকৃষ্ট হল যে, শেষের দিকে একরকম ছন্দে-পাওয়া হয়েই গিয়েছিল। অবন (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর) একসময় rhythmic prose লিখতে চেষ্টা করেছিল। তার লেখা আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু বেশি প্রলম্বিত এবং অসংশ্লিষ্ট হওয়াতে চলল না।

আমি—আপনি rhythmic proseএর আদর্শ কেমন হবে তা দেখিয়ে দিন না।

কবি—'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের proseএ যে rhythm রয়েছে, তাতে সে-দেশের লোকেরা আকৃষ্ট হয়েছে। মনে করেছি বাংলা গদ্যেও ওরকম rhythm রেখে কিছু রচনা করব। কিন্তু আমাকেই সেটা করতে হবে কেন? আধুনিক কবিরা যে মিল বর্জন করে লাইন ভেঙে ভেঙে কবিতা রচনা করছে তাতে দোষ নেই। মিল না-দেওয়াটা মোটেই অন্যায় নয়। কিন্তু অমিল কবিতা রচনা করা খুবই শক্ত; তাতে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন।

আমি—অমিল অসমপংক্তিক কবিতা তো আপনিই সর্বপ্রথমে রচনা করেছেন। কিন্তু ওরকম কবিতা তো একটির বেশি পাইনে। 'মানসী' 'নিষ্ফল কামনা'ই তো তার একমাত্র নিদর্শন।

কবি—ও-ছন্দের কবিতা আরও রচনা করেছিলুম। কিন্তু সেগুলি আর প্রকাশ করা হয়নি।

কবি বললেন—মিল জিনিসটার প্রতি কিছুকাল পূর্বেকার কবিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সতর্কতা ছিল না। তাঁদের অনেকে পংক্তির শেষে কোনো রকমে একটু মিল ঘটিয়েই তৃপ্ত হতেন; অনেক সময় তো শুধু 'রে, হে' ইত্যাদি দিয়েই মিলের কাজ শেষ করতেন।

আমি—আপনিই প্রথমে বাংলায় disyllabic (দ্বিদল), trisyllabic (ত্রিদল) প্রভৃতি মিলের আদর্শ দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পংক্তির শেষ পর্বে মিলের সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বনির উত্থানপতনের দ্বারা যে cadenceএর সৃষ্টি হয়, তাও আপনার কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল।[১]

তারপর আবার ছন্দের কথা উঠল। কবি বললেন—ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা কর। কিন্তু ছন্দ এমন হওয়া উচিত, এমন হওয়া উচিত নয়, এ-কথা বোলো না। ছন্দ কেমন হবে তা কবিরাই ঠিক করবেন; তাঁরা নিজের কান আর ছন্দ-বোধের উপর নির্ভর করে নতুন নতুন ছন্দ রচনা করবেন। ইংরেজি সাহিত্যে একসময়ে ছন্দের ভাগ অত্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল, কোথাও ব্যতিক্রম হত না। তারপর কোল্‌রিজ প্রভৃতি কবিরা এসে নতুন ছন্দের প্রবর্তন করলেন; তাঁরা কাটা-কাটা ছন্দের ভাগ মানলেন না, কোথাও বেশি কোথাও কম চালাতে লাগলেন। প্রথম-প্রথম তাতে আপত্তি হয়েছিল। পরে কিন্তু তাঁদের প্রথাটাই চলে গেল। সুতরাং ছন্দের কোনো অকাট্য নিয়ম নেই এ-কথাটা মনে রাখা দরকার।

আমি—আমার আদর্শটাও তাই। কবিদের কি করা উচিত, কি করা অনুচিত তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কবিরা বর্তমানে কোন্ নিয়মে ছন্দ রচনা করছেন আমি তাই আবিষ্কার করে দেখাতে চাই। আমার কাজ হচ্ছে শুধু induction। Stateএর lawএর মতো কোনো law চালিয়ে দিতে চাইনে।

১ পৃ ১৪৯ দ্রষ্টব্য।

Natureএর lawএর মতো ছন্দের law ; সেটি শুধু আবিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেই আমার কাজ শেষ হয়। কেউ যদি কোনো নতুন নিয়মের ছন্দ চালায় তবে তাও চলবে। তার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা তো বৈয়াকরণিকের কাজ নয়।

কবি—শাস্তির ব্যবস্থা আছে বই কি। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যে-ছন্দ কানকে খুশি করতে পারবে না সে-ছন্দ কেউ পড়বে না। এর চেয়ে বড়ো শাস্তি আর কি আছে? কাজেই যেখানটাতে কান খুশি হয় না সেখানটাতে ছন্দ-পতন হয়েছে,এ-কথাও বলা চলে।

আমি—তা তো চলেই। কেন ছন্দ-পতন হয়েছে তাও দেখানো দরকার।

তারপর অন্য প্রসঙ্গে বললুম—ইংরেজ কবিরা পংক্তির এবং পর্বের দৈর্ঘ্যে অনেক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। ও-রকম বৈচিত্র্য আপনার কবিতাতেও প্রচুর আছে এবং তাতে যে কত ছন্দোবন্ধের সৃষ্টি হয়েছে তার সীমা নেই। আমি এই বৈচিত্র্যকে বোঝাবার জন্যে 'বর্ধিত' এবং 'খণ্ডিত' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করছি। যেমন, একটি পংক্তিতে আছে চোদ্দো unit, তার পরের পংক্তিতে যদি থাকে দশ unit তবে বলি দ্বিতীয় পংক্তিতে চার unitএর একটি পর্ব খণ্ডিত হয়েছে; তার পরের পংক্তিতে আবার চার unitএর দুটি পর্ব যোগ করে আঠারো unitএর একটি বর্ধিত পংক্তি রচিত হতে পারে। এ-ভাবে যোগ-বিয়োগের দ্বারা যে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আপনার রচনায় পাই।

আমাদের আলোচনা চলছে এমন সময় একজন ফরাসি অধ্যাপক কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অন্যান্য কথার পর কবি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন-ফরাসি কাব্যে quantitative ছন্দ আছে কি?

অধ্যাপক—না, ফরাসি কাব্যে quantitative ছন্দ চলে না। শুধু syllabic ছন্দই চলে।

তারপর তিনি কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোন্ ছন্দ ব্যবহার করেন?

কবি—আমি quantitative ও syllabic দু-রকম ছন্দই ব্যবহার করে থাকি।

অধ্যাপক—আপনি বাংলায় free verse রচনা করেছেন কি ?

কবি—আমি অনেক free verse রচনা করেছি।

তারপর অধ্যাপক মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বর্তমানে ফরাসিতে free verse যেমন চলে, rhythmic proseও তেমনি চলে। Rhythmic prose রচনার ভঙ্গি এমন যে, তাতে কবিতার ধ্বনিস্পন্দ ধরা পড়ে, কিন্তু তা কোনো ছন্দের নিয়মের আমলে আসে না।[১]

তারপরে কবিকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে এলুম।

৪

কবির পুনশ্চ বক্তব্য

সেদিনকার আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, ছন্দে সিলেব্‌ল্ প্রধান অথবা মাত্রা প্রধান। এ-সম্বন্ধে আমার মত এই যে, মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কি ভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো, সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা। ষাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পর্বে ঊর্ধ্বসংখ্যা কয় সিলেব্‌ল্‌এর স্থানে আছে, তা আমি পূর্বে বিচার করে দেখিনি। 'বিচিত্রা'-সম্পাদক বলেন, ছয় পাঁচ চার সবই চলে। আমি তাঁকে দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করতে অনুরোধ করেছিলুম। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করে দৃষ্টান্ত স্বয়ং রচনা করেছেন। পাঠকের গোচর করা গেল.

১

আজিকে তোমারে ডাক দিয়ে বলি, শুন গো সখী,
তোমার বীণায় বাজে অপরূপ ছন্দ ও কি ?

১ পৃ ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

কোনো পদ তার চার সিলেবিলে, কোনোটা পাঁচে,
এ যেন মিতালি ঝাঁপতালে আর কাবালি নাচে !...
চারে পাঁচে মিল হয় না, এ কোন্ দেশের কথা ?
চার-পাঁচে নয়, তার অভিনয় যথা ও তথা। ..

২

রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বরষা ঝরে, বরষা ঝরে তরুর দেহে,
লতা দুলে দুলে পরশে তারে, পরশে তারে সজল স্নেহে
ঘন তমসার সজল মায়া বিছালো ছায়া নেত্রে তব,
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে হাস্য ঝরে কি অভিনব !

৩

না জানি আজি গাহ চুপি চুপি কি গান সখী,
একি এ আলো নয়নে তোমার আজি নিরখি '
বুঝি না কি যে আছে তব মনে সংগোপনে,
প্রণয়ী জনে কেন অকরুণ বিদায়-খনে !

আর কত বল মিলাইব মিল চারে ও পাঁচে,
এখনো কাহারো মনে সন্দেহ কিছু কি আছে ?
সেদিন সন্ধ্যা, গুরুদেব-গৃহে উঠিল কথা—
চার-পাঁচ দিয়ে ছন্দ করার নাহিক প্রথা।
গুরুর আদেশে ত্রিবিধ প্রমাণ দিলাম এনে,
দেখিব এখন কি বিধি করেন প্রবোধ সেনে।

দেখা যাচ্ছে, 'আজিকে তোমারে' ছয় সিলেব্‌ল্, তার পরেই 'ডাক দিয়ে বলি' পাঁচ সিলেব্‌ল্। পরবর্তী ছত্রে 'তোমার বীণায়' চার সিলেব্‌ল্, আবার 'বাজে অপরূপ' পাঁচ।

প্রাকৃত-বাংলা ছন্দেও এ-রকম দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

৫ ৪ ৩ ১

শিবুঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে | দান

এই একটা লাইনেই দেখা যাচ্ছে, চার অসমানসংখ্যক সিলেব্‌ল্‌-পিণ্ড নিয়ে একই ষাণ্মাত্রিক ছন্দ রচিত।

৫

ছান্দসিকের নিবেদন

কবির 'পুনশ্চ বক্তব্য' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে।[১] এ-স্থলে আরও দুএকটি কথা নিবেদন করা সমীচীন মনে করি। নতুবা লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দের সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার আলোচনাটা অসমাপ্ত থেকে যাবে।

কিন্তু তৎপূর্বে ওই 'পুনশ্চ বক্তব্য' রচিত হবার উপলক্ষ্যটা জানানো দরকার। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার কিছুকাল পরেই কলকাতায় কবিগুরুর সঙ্গে আবার দেখা করি। এ-বিষয়ে 'বিচিত্রা'সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তিই উদ্ধৃত করছি।—

"কয়েক দিন পূর্বে জোড়াসাঁকোর কবিগৃহে বাংলা ছন্দ নিয়ে একটা ছোটো-খাটো আলোচনা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে প্রবোধবাবু এবং আরও দুএক জন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে প্রবোধবাবু বললেন যে, বাংলা ছন্দে চার সিলেব্‌ল্‌এর সঙ্গে পাঁচ সিলেব্‌ল্‌এর মিল হয় না; অন্তত এমনি ধরনের একটা কথা। আমার মনের মধ্যে অকস্মাৎ প্রতিবাদপ্রবৃত্তি জেগে উঠল; বললাম, নিশ্চয় হয়। তর্ক উপস্থিত হল। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বললেন, 'এ-তর্কের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা হয় তুমি যদি চার এবং পাঁচ সিলেব্‌ল্‌এ মিলিয়ে কবিতা তৈরি করে দেখাতে পার'। কবির আদেশ শিরোধার্য করে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর চার এবং পাঁচ সিলেব্‌ল্‌এ

১ বিচিত্রা—১৩৩৯ ভাদ্র, 'বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মিলিয়ে ত্রিবিধ ছন্দের কবিতা রচনা করে কবিকে দিয়ে এসেছি। আমার প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হল কি-না, সে-বিষয়ে সম্ভবত আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রকাশিত হবে এবং তারপর আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা'য় যে প্রবোধচন্দ্রের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হবে না, তাও বলা যায় না।"[১]

প্রথমেই বলা যায় যে, উপেনবাবুর ত্রিবিধ ছন্দের রচনার দ্বারা আসল তর্কের কোনো মীমাংসাই হয়নি। আমার বক্তব্য ছিল এই যে— লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতিপবের আশ্রয় হচ্ছে সাধারণত চার সিলেব্‌ল্ এবং কখনও কখনও তিন সিলেব্‌ল্, ও-ছন্দের সাহিত্যিক রচনায় কোথাও পাঁচ সিলেব্‌ল্‌এর পর্ব দেখা যায় না। আমার এই উক্তি মাত্রাবৃত্ত বা যৌগিক ছন্দের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। অথচ উপেনবাবু যে ত্রিবিধ ছন্দ রচনা করে আমার কথা অপ্রামণিত করতে চেয়েছিলেন, ওই ত্রিবিধ ছন্দই মাত্রাবৃত্তের অন্তর্গত; একটিও স্বরবৃত্তের অধিকারভুক্ত নয়। তাই উক্ত রচনা তিনটির দ্বারা আমার কথা অপ্রমাণিত হয়নি।

কবিগুরুর কাছে কিন্তু আমার বক্তব্যটি ঠিক ধরা পড়েছিল। সেইজন্যেই তিনি 'প্রাকৃত-বাংলা ছন্দের' (অর্থাৎ লৌকিক স্বরবৃত্ত ছন্দের) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি যে দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন সেটি ছড়া থেকে উদ্ধৃত। ছড়ায় পাঁচ সিলেব্‌ল্‌এর ব্যবহার প্রায়শ দেখা যায়, এ-কথা যথাস্থানে বলেছি। সাহিত্যিক রচনায় পঞ্চস্বর পর্বের প্রয়োগ দেখা যায় না।[২]

অতঃপর কবির 'পুনশ্চ বক্তব্য' সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে, "কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো, সে কথাটা" রসবিচারের পক্ষে সত্যই গৌণ, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পক্ষে সেটাই মুখ্য। কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজালে অভীষ্ট প্রকারের ঝংকার উৎপন্ন হয় সেটা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক

১ 'ছন্দের দ্বন্দ্ব'—বিচিত্রা ১৩৩৯ বৈশাখ পৃ ৫৬৮।

২ পৃ ৮৮, ৯১ দ্রষ্টব্য।

সন্ধানের বিষয়। বীণাযন্ত্রের স্বরবিস্তারই রসসম্ভোগের বিষয় সন্দেহ নেই ; কিন্তু উক্ত যন্ত্রের গঠনপ্রণালীর অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিকের কাছে কখনও গৌণ নয়। তেমনি স্বরবৃত্ত ছন্দে কয় সিলেব্‌ল্‌কে আশ্রয় করে ছয় মাত্রা ধ্বনি উৎপন্ন হয়, সেটা ছান্দসিকের কাছে অপ্রধান হতে পারে না। কেননা চতুঃস্বরাশ্রিত ছয় মাত্রার ছন্দ এবং স্বরসংখ্যানিরপেক্ষ ছয় মাত্রার ছন্দ রসোৎপত্তির দিক্ থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির জিনিস।

"ষাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পর্বে ঊর্ধ্বসংখ্যা কয় সিলেব্‌ল্‌এর স্থান আছে, তা আমি পূর্বে বিচার করে দেখিনি"—কবিগুরু যদি এ-কথাটি ষাণ্মাত্রিক 'প্রাকৃত' ছন্দ সম্বন্ধে বলে থাকেন, তাহলে বলতে হবে তাঁর এ-কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রথমত, তাঁর প্রয়োগপ্রণালী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি প্রাকৃত-বাংলা ছন্দকে স্বরাশ্রিত (অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌-আশ্রিত) বলেই কার্যত গণ্য করেছেন। তিনি স্বরবৃত্ত রীতিতে যৌগিক রীতির ছন্দোবন্ধের অনুরূপ যে-সব বন্ধ রচনা করেছেন, সেগুলিই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। যেমন, চোদ্দো বা আঠারো মাত্রার যৌগিক পয়ারের ছাঁদে তিনি যে-সব স্বরবৃত্ত পয়ার রচনা করেছেন তার প্রতিপংক্তিতে চোদ্দো বা আঠারো সিলেব্‌ল্‌ই পাই। আট-আট-দশ মাত্রার যৌগিক ত্রিপদীর ভঙ্গিতে আট-আট-দশ সিলেব্‌ল্‌এর স্বরবৃত্ত ত্রিপদী তিনি রচনা করেছেন। প্রাকৃত বা লৌকিক ছন্দের প্রতিপর্বের চতুঃস্বরতাই যদি মুখ্য কথা না হত, তাহলে অবিকল যৌগিক রীতির ছন্দোবন্ধ লৌকিক রীতিতে রচনা করা সম্ভব হত না। সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে, তাঁর মতে 'মেঘনাদবধ' কাব্যটাকে প্রাকৃত-বাংলায় এভাবে আরম্ভ করা যেত—

> যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
> বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
> যৌবনকাল পার না হতেই।

এটা চোদ্দো মাত্রার যৌগিক প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শে রচিত হয়েছে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, চোদ্দো স্বর বা সিলেব্‌ল্‌এর

পংক্তি এর আদর্শ ; মাত্রাগণনার হিসাবে এর পংক্তিতে যদি কুড়ি মাত্রা পাওয়া যায়, তাহলেও বলতে হবে যে সেটা গৌণ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, তিনমাত্রার ছন্দ গড়িয়ে চলে বলে যেখানে-সেখানে থামা যায় না এবং তাই ও-ছন্দে পংক্তিলঙ্ঘন বা প্রবহমানতা আনা যায় না। কিন্তু লৌকিক রীতিতে অনায়াসেই প্রবহমান ছন্দ রচনা করা যায় ; সুতরাং তিন মাত্রার হিসাবটা ও-ছন্দের পক্ষে গৌণ। লৌকিক রীতির মুক্তক ছন্দ সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত, বহুকাল পূর্বে[১] রবীন্দ্রনাথ—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে॥

লৌকিক ছন্দের এই পংক্তি-দুটিকে 'সাধুভাষার ছন্দে' রূপান্তরিত করেছিলেন এ-ভাবে—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরনে গোলাপ হইয়া উঠিবে॥

অথবা

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুমস্তবক ফুটিবে।
বেদনা-যন্ত্রণা রক্তমূর্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে॥

তখনই বোঝা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ছন্দের প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা গণন করে থাকেন। কিন্তু এরূপ গণনার সমীচীনতা সম্বন্ধে আমার মনে তখনই একটু খটকা লেগেছিল। তবে সুখের বিষয় তার দুমাস পরেই তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়ে আমার খটকার নিরসন ঘটে। ওই প্রবন্ধে[২] তিনি

কই পালঙ্ক, কই রে কম্বল,
কপনি-টুকরো রইল সম্বল,
একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল,
মিটবে সংকট ঘুচবে ধন্দ।

১ সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ। ২ সবুজপত্র ১৩২১ শ্রাবণ।

'বাংলা-প্রাকৃতের' এই চৌপদীটিকে সাধু বাংলায় রূপান্তরিত করলেন এ-ভাবে—

শয্যা কই, বস্ত্র কই,
কী আছে কৌপীন বই,
একা বনে ফিরে ওই,
নাহি মনে ভয়-চিন্তা।

এবার কিন্তু প্রাকৃত-বাংলার রচনাটিকে

কোথায় পালঙ্ক, কোথায় কম্বল,
কৌপীনখণ্ড যে রহিল সম্বল,

ইত্যাদি রূপে সাধুছন্দে রূপান্তরিত করলেন না। মনে হল প্রাকৃত-বাংলার ছন্দের প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা গণনা না করে চার সিলেব্‌ল্ গণনা করাই কবির অভিপ্রেত। তারপর যখন প্রাকৃত ও সাধু ছন্দের unitগুলিকে অঙ্কযোগে নীচে-নীচে সাজিয়ে দিলেন এ-ভাবে—

১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
কই	পা	লঙ্	ক ॥	কই	রে	কম্	বল্ ॥
শ	য্যা	ক	ই ॥	বস্	ত্র	ক	ই ॥

১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
কপ্	নি	টুক্	রো ॥	রই	ল	সম্	বল্ ॥
কি	আ	ছে	কৌ ॥	পী	ন	ব	ই ।

তখন আর কিছুমাত্র সংশয় রইল না যে, লৌকিক ছন্দ মূলত চতুঃস্বরপর্বিক (tetrasyllabic); অর্থাৎ প্রতিপর্বে চার সিলেব্‌ল্ থাকাই ও-ছন্দের মূলনীতি। শুধু তাই নয়। 'কই পালঙ্ক, কই রে কম্বল' প্রভৃতি প্রাকৃত-বাংলা ছন্দটির সঙ্গে

Ah distinctly | I remember
It was in the | bleak December

এই ইংরেজি শ্লোকটির তুলনা করে বললেন, এ-দুইটি মধ্যে "ধ্বনির বিশেষ

কোনো তফাত নেই"। তাছাড়া উক্ত ইংরেজি ছন্দটির সিলেব্‌ল্‌-বিভাগ করলেন এ-ভাবে—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
Ah dis tinct ly | I re mem ber |

তারপর বললেন "এর এক-একটা ঝোঁকে চারটি করে মাত্রা" (অর্থাৎ unit, এ-স্থলে সিলেব্‌ল্‌)। অতঃপর প্রাকৃত ছন্দের প্রতিপর্বে চার সিলেব্‌ল্‌ গণনা করাই যে কবির অভিপ্রেত, এ-বিষয়ে কি আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? সুতরাং প্রাকৃত-বাংলা ছন্দের "প্রত্যেক পর্বে ঊর্ধ্বসংখ্যা কয় সিলেব্‌ল্‌এর স্থান আছে, তা আমি পূর্বে বিচার করে দেখিনি"—কবির এ-কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

সেই সময় থেকেই চার সিলেব্‌ল্‌এর ভাগকে লৌকিক ছন্দের মূল আশ্রয় বলে স্বীকার করে আসছি। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথেরও তাই মত। সেজন্যেই ও-ছন্দকে স্বরবৃত্ত বা syllabic নামে অভিহিত করেছি। কিন্তু অবশেষে 'পরিচয়'এ [১] যখন আবার রবীন্দ্রনাথ লৌকিক বা প্রাকৃত ছন্দকে 'তিন-মাত্রার ছন্দ' বলে অভিহিত করলেন, তখন ও-ছন্দের স্বরূপ নিয়ে নূতন করে ভাবতে হয়েছিল। বোঝা গেল প্রাকৃত ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ কখনও ছয় মাত্রার ছন্দ [২] এবং কখনও চার সিলেব্‌ল্‌এর ছন্দ [৩] বলে গণ্য করেন। এ-ছন্দের যে-সমস্ত বন্ধ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, সেগুলির থেকেও তার চতুঃস্বর প্রকৃতির কথা কার্যত স্বীকৃত হয়, একথা একটু পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া অনেক স্থলে এ-ছন্দে ছয়ের বেশি মাত্রাও দেখা যায়। যেমন, পূর্বোক্ত 'কই পালঙ্ক, কই রে কম্বল' প্রভৃতি শ্লোকটিতে চার জায়গায় সাত মাত্রার

১ ১৩৩৮ মাঘ, "ছন্দের হসন্ত-হলন্ত"।

২ সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ এবং পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ।

৩ সবুজপত্র ১৩২১ শ্রাবণ।

ব্যবস্থা হয়েছে। এ-বিষয়ে মূলগ্রন্থের যথাস্থানে [১] বিশদ আলোচনা করেছি। যাহোক, সাক্ষাতে আলোচনাকালে তিনি যখন "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে" লাইনটাকে বিভাগ করলেন এক ভাবে, কিন্তু ব্যাখ্যা করলেন অন্য ভাবে—'আমি যদি'-কে দ্রুত উচ্চারণ করে তার মাত্রাল্পতার ক্ষতিপূরণ করার ভার দিলেন 'জন্ম নিতেম'এব উপর, তখন আমি সত্যই একটু মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু অবশেষে কবি নিজেই 'ছন্দ-বিতর্ক'-নামক প্রবন্ধে [২] ও-সমস্যার মীমাংসায় অগ্রসর হলেন। এখানেও তিনি বললেন, "প্রাকৃত-বাংলার ছন্দে যতিবিভাগ সকল সময় ঠিক কাটা-কাটা সমান ভাগে নয়। পাঠক এক জায়গায় মাত্রা হরণ করে আর-এক জায়গায় ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে নালিশ চলে না। এইজন্যে একই কবিতা পাঠক আপন রুচি-অনুসারে কিছুপরিমাণে ভিন্নরকম করে পড়তে পারেন"। তারপর তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালেন যে, ও-ছন্দের প্রতিপর্বেই ছয় মাত্রা থাকা আবশ্যক নয়; কোনো কোনো পর্বে ছয় মাত্রার কমও থাকতে পারে, কিন্তু ওখানে যে-কয় মাত্রা কম হল তা অন্য পর্বের ছয় মাত্রার উপরে যোগ দিয়ে মোট মাত্রাসংখ্যার সমতা রাখতে হয় এবং মাত্রার এই হরণ-পূরণ বিষয়ে পাঠকের কতকটা স্বাধীনতা থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃত ছন্দের প্রতিপর্বেই ছয় মাত্রা আবশ্যক না হলেও গড়ে ও-ছন্দের পর্বগত ধ্বনিপরিমাণ ছয় মাত্রাই হওয়া চাই। সুতরাং ও-ছন্দকে মোটামুটি ভাবে 'ষাণ্মাত্রিক' ছন্দ বলা গেলেও ঠিক 'ষণ্মাত্রপর্বিক' ছন্দ বলা চলে না।

যাহোক, রবীন্দ্রনাথের উক্তি তথা প্রয়োগ থেকে অনুমান হয় যে, প্রাকৃত ছন্দের কোনো পর্বেই চার মাত্রার কম থাকে না এবং যেখানেই চার মাত্রা থাকে সেখানে সিলেব্‌ল্‌ও থাকে চারটি; তিন বা দুই সিলেব্‌ল্‌এর ভিত্তিতে চার

১ পৃ ৯৪-৯৫ দ্রষ্টব্য।

২ পরিচয় ১৩৩৯ শ্রাবণ।

মাত্রার ব্যবস্থা করলে ও-ছন্দের নীতি রক্ষা হয় না। আর, যেখানে চার সিলেব্‌ল্‌এর কম থাকে সেখানে মাত্রাপরিমাণ হয় ছয়। যথা—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
ঘাটে ঘাটে ফিরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

এখানে রবীন্দ্রনাথের মতে 'আমি যদি' ও 'ঘাটে ঘাটে'তে আছে চার চার মাত্রা। কিন্তু ও-দুই জায়গাতেই সিলেব্‌ল্‌ আছে চারটি করে। আর—

আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে ?
আগাগোড়া 'সব শুনতেই' হবে।
—পলাতকা, ফাঁকি

এখানে 'সব শুনতেই'তে সিলেব্‌ল্‌ আছে তিনটি, কিন্তু মাত্রা ছয়টি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এ-ছন্দে দুয়েক মাত্রার ফাঁক সহ চার সিলেব্‌ল্‌এর ভিত্তিতে ছয় মাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই পূর্বোক্ত 'ছন্দ বিতর্ক' প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রতিপর্বার্ধের সিলেব্‌ল্‌ ও মাত্রাসংখ্যার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "প্রাকৃত-বাংলায় প্রায়ই সে-স্থলে মাপ দুইএর হলেও ওজন তিনের। যেমন—

১ ২ ১ ২
তো মার্‌ সঙ্‌ গে।"

অর্থাৎ প্রাকৃত ছন্দের পর্বার্ধে প্রায়ই দুই সিলেব্‌ল্‌এর ভিত্তিতে তিন মাত্রার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

অতঃপর আর সন্দেহ রইল না যে, রবীন্দ্রনাথের মতেও প্রাকৃত ছন্দের পর্বে গড়ে ছয় মাত্রা থাকলেও প্রায়ই ওই ছয় মাত্রার অবলম্বনস্বরূপ চার সিলেব্‌ল্‌ থাকা চাই।

বিতর্কের বিষয় বলে এ-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলতে হল। এবার আরও দুয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করেই এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করব

শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে, 'প্রভু বুদ্ধ লাগি' কবিতাটির ছন্দকে এক হিসাবে সমর্থন করাও চলে। আমার বক্তব্য ছিল এই—ও-ছন্দটিকে ষণ্মাত্রপর্বিক যৌগিক ছন্দ বলে গণ্য না করে যদি

প্রভু বুদ্ধ | লাগি
আমি ভিক্ষা | মাগি,
ও গো পুর | -বাসী,
কে রয়েছ | জাগি

এ-ভাবে বিভাগ করে চতুর্মাত্রপর্বিক যৌগিক ছন্দের ভঙ্গিতে আবৃত্তি করা যায়, তাহলে ওটিকে এক রকম করে সমর্থন করা যায়। কিন্তু ও-ভঙ্গি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভব নয় এবং ওই বিশেষ ধরনের ছন্দেও 'অনাথপিণ্ডদ'কে খাপ খাওয়ানো যায় না। কিন্তু যৌগিক ভঙ্গিতে ষণ্মাত্রপার্বিক ছন্দ 'না করলেই যে ভালো হত' এ-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। 'অনাথপিণ্ডদ' কথাটির মর্যাদা রক্ষা করে সমগ্র কবিতাটিকেই যদি—

"বুদ্ধ প্রভু লাগি ভিক্ষা আমি মাগি,
শুন গো পুরবাসী, কে কোথা আছ জাগি,"
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ
-নিনাদে

এ-ভাবে সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দে রচনা করা হত, তাহলে কবির কোনো কুণ্ঠার কারণ থাকত না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে,—ছন্দের দ্বন্দ্ব উপলক্ষ্যে উপেনবাবু যে ত্রিবিধ ছন্দ রচনা করেছেন, তার দ্বারা আমার কোনো কথা অপ্রমাণিত না হলেও ওই তিনটি রচনার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে যে ছন্দোগত অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য আছে তা অবশ্যস্বীকার্য। স্বরবৃত্ত ছন্দে চার ও পাঁচ

সিলেব্‌ল্‌এর মিলন দেখা যায় না বটে; কিন্তু তিনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রচনায় পাঁচ ও ছয় মাত্রার যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন তার অভিনব বৈশিষ্ট্যটুকু সাগ্রহে লক্ষ্য করার যোগ্য।

সেদিন সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোর কবিগৃহে শুধু যে স্বরবৃত্ত ছন্দের সিলেব্‌ল্‌-সংস্থানের বিষয়ই আলোচনা হয়েছিল তা নয়। অন্যান্য ছন্দ সম্বন্ধেও নানা কথা আলোচিত হয়েছিল। তার মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে এ-স্থলেই নিবেদন করলাম।

প্রসঙ্গক্রমে আমি 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে' প্রভৃতি পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের কথা উল্লেখ করেছিলাম। ওই উপলক্ষ্যে কবি বললেন, অনেকে ও-ছন্দের রচনাকে যে-ভাবে আবৃত্তি করে থাকেন তা ঠিক নয়।

পঞ্চশরে- | দগ্ধ করে- | করেছ এ কী- | সন্ন্যাসী-

অনেকে এ-ভাবে প্রত্যেক পর্বের পরে যতিটিকে একটু দীর্ঘ করে আবৃত্তি করেন। কিন্তু কবির মতে ওটা পাঁচ মাত্রার ছন্দের ভঙ্গি নয়; ও-ভাবে যতিকে দীর্ঘ করলে ছন্দ আর পাঁচ মাত্রার থাকে না, প্রতিপর্বের আয়তন ছয় মাত্রা হয়ে যায়। তারপর কবি ওই লাইনটিকে এবং 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' প্রভৃতি লাইনটিকে যথাযথরূপে আবৃত্তি করে শোনালেন। দেখলাম তাঁর আবৃত্তিতে ও-ছন্দের যতি অত্যন্ত লঘুপ্রকৃতির।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গদেবতা,

এই অংশটিকে তিনি কি-ভাবে আবৃত্তি করেন। তিনি আবৃত্তি করে বললেন, তিনি 'অনঙ্গ' শব্দটিকে সাধারণ ভাবেই উচ্চারণ করেন, ছন্দের খাতিরে বিভক্ত করেন না। লক্ষ্য করলাম, তাঁর আবৃত্তিতে প্রস্বর স্থাপিত হয়

অ-কারেব উপরেই, ন-এর উপব নয ; আর 'দেবতা' শব্দের মধ্যস্থ যতিটিও অত্যন্ত লঘু, প্রায় টের পাওয়া যায় না।

তাঁর রচনায় চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের আপেক্ষিক অল্পতাব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি নবপ্রকাশিত [১] 'মাঘের আশ্বাস' [২] নামক কবিতাটির ছন্দের কথা তুলি। কবিতাটির প্রথম দুটি পংক্তি হচ্ছে এ-রকম।—

জানিলাম এ হৃদয় একেবারে মরু না,

ঋতুপতি আজো দেখি করে তারে করুণা।

এই উপলক্ষ্যে কবি বললেন—চার-চার মাত্রার ভাগেব কবিতার শেষ পবে একটু ফাঁক থাকা চাই, নতুবা শুনতে খারাপ হয়।

আমি বললুম—কেন, ওই কবিতাটিতেই তো অনেক জায়গায় শেষ পবের চার মাত্রা পূরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফাঁক রাখা হয়নি। প্রথম লাইনেই যদি 'মরু না'র স্থলে 'মরু নয়' লেখা হত, তাহলে কি খাবাপ শোনাত ?

কবি বললেন—তা নয়, 'মরু নয়' খারাপ শোনাবে না, কিন্তু

জানিলাম এ হৃদয় একেবারে মরু নহে

এ-ভাবে চাব মাত্রা দিয়ে শেষ পর্বটিকে নিরেট করে বুজিয়ে দিলে খারাপ শোনায়। শেষের দিকে একটু ফাঁক না রাখলে ধ্বনি ভালো করে খোলাব সুযোগ পায় না।

কবির উক্তির গুরুত্ব ও সার্থকতা উপলব্ধি করলাম ; বুঝলাম, এ-জাতীয় ছন্দের শেষ ধ্বনিটি দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক হওয়া আবশ্যক। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রকারগণও মাত্রাসমক বর্গের ছন্দে প্রতিপংক্তির শেষ প্রান্তে একটি গুরুধ্বনিস্থাপনের বিধান দিয়েছেন।

১ পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ ২ 'বীথিকা'র 'কবি'

খ। গদ্যকবিতার ছন্দ

১

মনে আছে বহুদিন পূর্বে—তখনও 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক' প্রভৃতি গদ্যকবিতার বই বেরোয়নি, সবেমাত্র 'লিপিকা' প্রকাশিত হয়েছে—শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের অনুরোধক্রমে 'বিশ্বভারতী' আপিসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন 'লিপিকা'র গদ্যরচনার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে। ও-পুস্তকের কয়েকটি রচনা নিয়ে দুজনে মিলে নানা ভঙ্গিতে আবৃত্তিও করা গেল। কিন্তু আমি 'লিপিকা'র গদ্যছন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে রাজি হলাম না। কারণ মনে যথোচিত সাহস পাইনি।

বহুদিন পরে আবার 'পূর্বাশা'-সম্পাদক অনুরোধ করলেন রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ নিয়ে কিছু লিখতে। এবার অসম্মত হইনি। কারণ সৌভাগ্য-ক্রমে ইতিমধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুইবার ও-বিষয়ে আমার কিছু-কিছু কথা হওয়াতে তাঁর মনোভাব কতকটা জানতে পেরেছি। এ-স্থলে ওই ছন্দ-সংলাপের সারমর্মটা নিবেদন করা সংগত মনে করি।

প্রথমবার কথা হয়েছিল 'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ' প্রকাশিত হবার কিছুকাল পূর্বে ১৩৩৮ সালের চৈত্র মাসে।[১] সময়টা মনে রাখার পক্ষে আমার একটা অবলম্বন আছে। প্রসঙ্গক্রমে সেটা বললে অন্যায় হবে না। তখন তিনি 'পরিশেষ'এর কবিতাগুলি লিখছিলেন। নানা কথার পর উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন।[২] তার মধ্যে একটি ছিল সেইদিনকারই রচিত 'শূন্যঘর'নামক একটি কবিতা। ওই কবিতাটির কয়েকটি লাইনের আবৃত্তিভঙ্গি আমার মনে এমনভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে, তা আজও ভুলতে পারিনি। সেই স্মৃতিটুকুর যথোচিত মর্যাদারক্ষার উদ্দেশ্যে আজ সশ্রদ্ধচিত্তে ওই লাইন-কটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।—

১ পৃ ১৮২ দ্রষ্টব্য   ২ পৃ ১৯৩ দ্রষ্টব্য

নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্ অতিশয়,
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।
অতএব—আরে, অতএব-খানা থাক,—
আপাতত ফেরা যাক।

াহোক, কথার প্রসঙ্গে অতঃপর তিনি বললেন যে, এর পর তিনি গদ্যকবিতা াচনা করার অভিলাষ করেছেন এবং দুএকটি রচনা করেওছেন। রচনার তারিখ দেখে মনে হচ্ছে, 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন', এ-দুটি কবিতাব কথাই ছল তাঁর মনে। সংকোচবশত বলিনি তাঁকে একটু পাঠ করে শোনাতে। কিন্তু প্রশ্ন করলাম গদ্যকবিতার ধ্বনিবিন্যাসরীতির বিষয়ে। তাতে তিনি া-যা বলেছিলেন, মোটামুটি তা তিনি তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন পুনশ্চ' পুস্তকের ভূমিকায়। অতএব এ-স্থলে তার পুনরুক্তি করতে চাইনে।

তারপর তাঁর বহু গদ্যকবিতা প্রকাশিত হয়েছে এবং এর রচনারীতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমতও নানা উপলক্ষ্যে নানা স্থলে প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধাসহকারে যথাসাধ্য সেগুলিকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত, 'বঙ্গশ্রী'তে [১] প্রকাশিত এবং খণ্ডিত আকারে 'ছন্দ' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'গদ্য-ছন্দ'নামক প্রবন্ধটি। কবিগুরুর অভিমতের অনুধাবন করা সত্ত্বেও এ-সম্বন্ধে মনে নানারকম জিজ্ঞাসা সঞ্চিত হয়ে ছিল। ভেবেছিলাম কোনো সুযোগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে আমার জিজ্ঞাসা নিবেদন করব। কিন্তু তার পরে যত বারই দেখা হয়েছে ও-বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসা নিবেদন করা হয়নি, অংশত আমার অনবধানতার ফলে এবং অংশত অন্যান্য প্রসঙ্গের প্রাধান্যে।

১ ১৩৪১ বৈশাখ

গেল বছর পৌষ-উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। উৎসবের পরে একদিন (২৫ ডিসেম্বর ১৯৪০) সকালে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে গদ্যকবিতার ছন্দের কথা উঠে পড়ল। স্থির হল বিকালে কবিগুরুর কাছে দুএকটি প্রশ্ন নিবেদন করব। বিকালে অমিয়বাবু একটু আগেই গেলেন, আমি গেলাম একটু পরে।[২] গদ্যকবিতা ও ছন্দের প্রসঙ্গে আলোচনা উঠল। লক্ষ্য করলাম আলোচনাতে তাঁর মন বেশ গভীরভাবেই আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু দৈহিক গ্লানিবশত তাঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলোচনা শেষ করবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালাম; বললাম তাঁর কষ্ট হচ্ছে, অতএব আলোচনা সেদিনকার মতো শেষ করাই ভালো। কিন্তু সে-দিকে কান না দিয়ে কবি বলে যেতে লাগলেন, আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে একরকম জোর করেই আলোচনা সমাপ্ত করে তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম। কিন্তু তখন কল্পনাও করিনি যে, আমার পক্ষে ওই প্রণামই হবে শেষ প্রণাম।

পরের দিন অমিয়বাবু অনুরোধ করলেন ওই আলোচনাটুকু যেন যথাসম্ভব সমগ্রভাবে লিখে ফেলি এবং গুরুদেবকে দিয়ে অনুমোদিত ও সংশোধিত করিয়ে কোথাও প্রকাশ করি। কিন্তু নানা কারণে ওই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। নিজের ওই অক্ষমতাকে আজ যেন ধিক্কারের মতো বোধ হচ্ছে।

আজ এতদিন পরে কবিগুরুর মুখের কথাগুলি সমগ্রভাবে এবং হয়তো অবিকলভাবেও মনে নেই। তথাপি তিনি যা বলেছিলেন মোটামুটি সংক্ষেপে মনে আছে। এ-স্থলে সেই কথাগুলিই যথাসাধ্য আনুপূর্বিকভাবে প্রতিবেদন করব।

২ সাপ্তাহিক দেশ, ১৩৪৭ মাঘ ১২, পৃ ৪৫২-৫৩

প্রশ্ন করলাম গদ্যকবিতা রচনা করার সার্থকতা কি। উত্তরে কবি বললেন, বহুদিন যাবৎ তিনি নানারকম গদ্যসাহিত্য পাঠ করার সময় তাতে কাব্যের ধর্ম, তার রস ও স্পন্দন অনুভব করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাইবেলের উল্লেখ করলেন; বাইবেলের, বিশেষত ওল্ড্ টেস্টামেন্টের, অনেক রচনায় কাব্যের লক্ষণ এমন সুস্পষ্ট যে তার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা তিনি গভীরভাবে অনুভব না করে পারেননি। শুধু বাইবেল কেন, উপনিষদের গদ্যরচনাতেও কাব্যের বৈশিষ্ট্য অতি নিবিড় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা গদ্যে রচিত হলেও তার মধ্যে কাব্যের রস গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে। "আমি যখনই সে কাহিনীটি পড়েছি, তার কাব্যের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, অনুভব করেছি তার চমৎকার কাব্যমাধুর্য।"

'চিত্রা' কাব্যের 'ব্রাহ্মণ'নামক অপূর্ব কবিতাটির কথা স্মরণ করে মনে মনে তাঁর এই উক্তির সার্থকতা অনুভব করলাম। কিন্তু কোনো মন্তব্য করে তাঁর কথায় বাধা দিলাম না।

তিনি বললেন, গদ্যরচনার মধ্যে যদি যথার্থ কাব্য প্রকাশ পায় তবে তাতে আপত্তি কি হতে পারে তা তিনি বুঝতে পারেন না। বাইবেলে উপনিষদে যদি গদ্যরীতিতে কাব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে আধুনিক কালেই তা পারবে না কেন? কাব্যের প্রকাশই হচ্ছে আসল কথা, তার আকৃতি বা form নিয়ে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

এবার একটু সুযোগ পেয়ে আমি বললাম—আপনার এই উক্তি স্বীকার করি। তবু একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে। আপনারও তো বহু রচনায়, উপন্যাসে, ছোটো গল্পে গদ্যের রীতিতেই অতি চমৎকার কাব্যরস ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেগুলিকে কেউ কবিতা বলে না। সংস্কৃত পরিভাষায় গদ্যকাব্য স্বীকৃত হলেও আধুনিক কালে তো গদ্যরচনাকে কাব্য বলা হয় না।···

আমি শেষ করার পূর্বেই তিনি বললেন—ওই নাম আর পরিভাষা নিয়েই

তো যত গোলমাল। তোমরা ও-রকম রচনাকে কবিতা বলতে না চাও তে অন্য নাম দাও। কিন্তু তার কবিত্বরসটুকু স্বীকার করতেই হবে।

তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললাম—এ-ক্ষেত্রে আধুনিক পরিভাষাকে আঁকড়ে ন থেকে সংস্কৃত সংজ্ঞা অনুসারে গদ্যপদ্যনির্বিশেষে রসাত্মক রচনামাত্রকেই কাব বলে অভিহিত করলেই তো গোলমাল মিটতে পারে। কিন্তু আসল গোলমা তো গদ্যকবিতার ছন্দ নিয়ে। গদ্যরচনারও যদি ছন্দ স্বীকার করা হয়, তাহলে ছন্দ কথার অর্থ অতিব্যাপক হয়ে যায় এবং ও-কথাটির যে বিশিষ্ট অর্থ আছে সেইটেই নষ্ট হয়ে যায়।

কবিগুরু বললেন—কেন নষ্ট হবে? বৈদিক ছন্দেরও তো metre নেই কেবল কথাগুলি স্তরেস্তরে সাজানো আছে। তবু তো তাকে ছন্দ বলে।

আমার মনে হল বৈদিক ছন্দের metre নেই, এ-কথাটা এক হিসাবে সত হলেও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কিন্তু কবির কথায় বাধা সৃষ্টি করলাম না। তিনি বলে যেতে লাগলেন—গদ্যকবিতার ছন্দ পদ্যের ছন্দের মতো মাপাজোখা ন বটে, কিন্তু তারও একটা ছন্দ আছে। প্রকৃতির মধ্যে একরকম ছন্দ আছে যাকে অঙ্ক গুনে হিসাব করে পাওয়া যায় না, অথচ অনুভব করা যায়; এও হচ্ছে সে-রকম। যেমন গাছ; গাছের শাখা প্রশাখা পাতা, এগুলি এমনভাবে সাজানে থাকে যে, অনুভব করা যায় গাছেরও একটি ছন্দ আছে; অথচ তা হিসাবে ধরা পড়ে না। গদ্যকবিতার ছন্দও ঠিক সেইরকম। পদ্যছন্দের মতো হিসাবে পাওয়া যায় না; অথচ তার বাক্যগুলি এমন স্তরে-স্তরে সাজানো যে সবগুলিতে মিলে একটা ছন্দের রস পাওয়া যায়।

মনে পড়ে গেল 'গদ্য-ছন্দ'নামক প্রবন্ধটিতেও তিনি এই তুলনাই দিয়েছেন প্রশ্ন করলাম—গদ্যকবিতাকে 'ভাবের ছন্দ' বলার বিশেষ সার্থকতা কি?

উত্তরে বললেন—গদ্যকবিতা তো ভাবেরই কবিতা; পদ্যকবিতার মতো তো তার ধ্বনির অলংকার নেই। কাজেই ভাবকেই গুচ্ছে গুচ্ছে সাজিয়ে গদ্য-কবিতা রচনা করতে হয়।

আলোচনা শেষ হল না। কিন্তু মহাকবিকে আমার অজ্ঞাতসারেই শেষ প্রণাম করা হয়ে গেল। অসমাপ্তির অতৃপ্তি নিয়েই অতিথিশালায় ফিরে গেলাম। ওই আলোচনাটুকুতে সমস্ত জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হল না, বরং তাতে নতুন করে অনেক জিজ্ঞাসা মনে জেগে উঠল। গভীর রাত পর্যন্ত নানা প্রশ্ন ও নানারকম উত্তর আনাগোনা করে মনটাকে সজাগ করে রেখেছিল। যদি এই কথোপকথনটুকুকে যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করে ফেলতে পারতাম, তাহলে হয়তো কবিগুরুর কাছে তা উপস্থাপিত করে আরও অনেক মূল্যবান্ অভিমত লাভ করতে পারতাম।

নির্দেশিকা

পরিভাষা

৭, ৩১, ৩৬, ৫১

অক্ষরনিষ্ঠা ৩৮, ৫২

অক্ষরবৃত্ত ৪, ১৬, ৫৪, ১৮৬

অখণ্ড ধ্বনি ২৭, ২৮

অতিপর্ব ৭৬, ১০০

অর্ধপর্ব ১০৪

অর্ধযতি ১০৬, ১০৮

অন্ত্যস্পন্দ ১৪৯

অন্ত্যানুপ্রাস ১৪৯

অমিত্রাক্ষর ১০৫, ১১৬

অমিত্রাক্ষর, ভাঙা ১১৩

অযুগ্মস্বর ২৮

অসমপংক্তিক ছন্দ ১৪১

আক্ষরিক ছন্দ ৫২, ১৮৬

আক্ষরিক রীতি ৭, ১১

আঁজাবম্মা ১৮৪

আযাম্বিক ১০০

আশ্রিতান্ত ধ্বনি ৭, ৪৮

উচ্চারণ, বিশ্লিষ্ট ১৮৭

উচ্চারণ, সংশ্লিষ্ট ১৮৭

উপপর্ব ৮৪

উপযতি ৮৪

ঊনমাত্রিক চৌপদী ৬২

ঊনমাত্রিক পয়ার ৬১

একস্বর শব্দ ৪০, ৭৫

কলা ৮

গদ্য ১৭২

গদ্যকাব্য ১৭২

গৈরিশ ছন্দ ১২৩

গৈরিশ মুক্তক ১২৫

চতুর্দশপদী ১০৮

চতুর্মাত্রপর্বিক চৌপদী ১৩৭

চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দ ৫৬

চতুর্মাত্রপর্বিক ত্রিপদী ১১৬

চাল ৮৭

চৌপদী, ঊনমাত্রিক ৬২

- চতুর্মাত্রপর্বিক ১৩৭
- দীর্ঘ ১২৮
- পঞ্চমাত্রপর্বিক ১৩৭
- লঘু ১২৯
- ষণ্মাত্রপর্বিক ১৩৮

ছন্দ ১৭০

ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ১০৫, ১০৬

- অসম ১৮২, ১৮৩
- অসমপংক্তিক ১৪১
- অসম মাত্রার ১৮৪
- আক্ষরিক ৫২, ১৮৬
- গৈরিশ ১২৩
- চতুর্মাত্রপর্বিক ৫৬
- ছড়ার ২২, ২৬
- তিনমাত্রার ১৮৯, ২০৪
- ত্রৈমাত্রিক ১৮৯
- দ্বৈমাত্রিক ১৮০
- দ্রুত লয়ের ৩১
- ধামালি ৩১
- পঞ্চমাত্রপর্বিক ৬৮, ৬৯
- পয়ারজাতীয় ১০৬
- পংক্তিলঙ্ঘক ১০৭
- প্রবহমান পয়ার ১০৭
- প্রাকৃত বাংলা ২৪
- প্রাস্বরিক ২৮

বাংলা প্রাকৃত ২৪
বিষম মাত্রার ৮৪
ভাবের ১৭২, ২১৪
মাত্রাবৃত্ত ৮, ৫৪, ৫৫, ১৮৯
মাত্রাসমক বর্গের ২০৯
মুক্তক ১১৬, ১৯০
মুক্তকল্প ১৪১
যৌগিক ৪, ৪০, ৫৪, ৫৬, ১৮৯
রামপ্রসাদী ২১
লাইনডিঙানো ১০৭
লৌকিক ২৮
ষণ্মাত্রপর্বিক ৭২, ৭৩, ১৮৫
ষাণ্মাত্রিক ১৯৭, ১৯৯, ২০১
সপ্তমাত্রপর্বিক ৭৪, ৭৫
সমমাত্রার ১৮৪
স্বরবৃত্ত ২৮, ৫৪, ৮৫, ১৯০, ২০৪
স্বাভাবিক ২০
হরিগীতা ৭৬, ১০২
ছন্দপতন ১৯৬
ছন্দপংক্তি ১০৭
ছন্দস্পন্দ ১৪৮
ছন্দাভাস ১৭৬
ছন্দোগন্ধি ১৭৫
ছন্দোবন্ধ ১৪৭, ১৯০
ছন্দোমুক্তি ১৮০
ছড়ার ছন্দ ২২, ২৪
ছেদ ৫৪
জাতি ৮
ঝোঁক ১৮, ১০০, ১৫৫
টান ৮৯, ৯০
তাল ১৫৫
তাল, দাদরা ১৯০
ত্রিপদী, চতুর্মাত্রপর্বিক ১৩৬
দীর্ঘ ১২৮
পঞ্চমাত্রপর্বিক ১৩৭
যৌগিক ২০১
লঘু ১২৮
ষণ্মাত্রপর্বিক ১৩৮
স্বরবৃত্ত ২০১
দাদরা তাল ১৯০
দ্বিপদী ১২৮
দ্বিপদী, চতুর্মাত্রপর্বিক ১৩৬
দীর্ঘ ১২৮
পঞ্চমাত্রপর্বিক ১৩৬
লঘু ১২৮
ষণ্মাত্রপর্বিক ১৩৮
দ্বিস্বর শব্দ ৪৬, ৪৭
ধামালি ছন্দ ৩১
ধ্বনি, অতিপর্বিক ১০০
অপ্রস্বরিত ১০১
আশ্রিতান্ত ৭, ৪৮
ধ্বনিতরঙ্গ ১৪৮
ধ্বনিনিষ্ঠা ৫২
ধ্বনিশিল্প ২,৭
ধ্বনিসম্প্রসারণ ৯০
ধ্বনিসংকোচন ৯৪
ধ্বনিসংখ্যা ২৮
ধ্বনিসংখ্যাত ৩৩
ধ্বনিস্পন্দন ১৭৫
নব্যরীতি ১৬
নিঃসঙ্গ পংক্তি ১৫৬
পদ ১২৮
পদবন্ধ ১৪৭
পদ্য ১১৭, ১৭২
পদ্যকাব্য ১৭২
পদ্যগন্ধি ১৭৫
পদ্যের রং ১৭৮
পয়ার, অমিত্রাক্ষর ১০৫
অমিল প্রবহমান ১০৮
অসমপংক্তিক প্রবহমান ১১৬
আঠার মাত্রার ১১১
ঊনমাত্রিক ৬১

দীর্ঘ ১১১
প্রবহমান ১০৭, ১৮৪
বর্ধিত ১১১
মাত্রাবৃত্ত ১০৭, ১৮৮
মাত্রিক ১৯০
যৌগিক ৩৪, ১০৭, ১৯০,
লঘু ১১৩, ১২৮
ষোলমাত্রার ১১০
সমপংক্তিক প্রবহমান ১১৬
সমিল প্রবহমান ১০৯
স্ববৃত্ত ১০৭, ১৯০, ২০১
স্বরবৃত্ত দীর্ঘ ১২৮
স্বরবৃত্ত প্রবহমান ১৩০, ১১
স্বরবৃত্ত লঘু ১২৮
পর্ব, অতিপংক্তিক ১০০
চতুঃস্বর ৮৫, ৮৬
চতুর্মাত্রক ৫৫
ত্রিস্বর ৮৫
দ্বিস্বর ৮৫
পঞ্চমাত্রক ৬৭
ষণ্মাত্রক ৭২
সপ্তমাত্রক ৭৪
পর্ববন্ধ ১৪৭
পর্বযতি ৮৩, ৮৪, ১০৪
পংক্তি ১০৭
পংক্তি, বর্ধিত ১৯৬
খণ্ডিত ১৯৬
পংক্তিবন্ধ ১৪৭
পংক্তিলঙ্ঘন ২০২
পংক্তিলঙ্ঘক ছন্দ ১০৭
পূর্ণপর্ব ৮৪, ১০৪
পূর্ণযতি ১০৬
প্রবহমান ছন্দ ১০৭
প্রস্বর ১৮, ১০০
প্রাকৃত ছন্দ ১৯০
প্রাকৃত বাংলা ছন্দ ২৪
প্রাস্বরিক ছন্দ ২৮
ফাঁক ৯০, ৯২, ৯৬, ১ ১৬৮, ১৯১, ২০৬,
২০৯
ফাঁক, মিলের ১৫৬
ফাঁকপূরণ ৯৬, ৯৭
বন্ধ ১৪৭
বাক্‌পর্ব ১৭৬
বাংলা প্রাকৃত ছন্দ ২৪
বিরাম ১১৪
বিষম পর্ব ৮৪
বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ ১৮৭
বৃত্তগন্ধি ১৭৫
ভাঙা ছন্দ ১২৪
ভাবচ্ছন্দ ১৭২, ১৭৮
ভাবপর্ব ১৭৭
ভাবের ছন্দ ১৭২, ২১৪
মন্দাক্রান্তা ১৪৫
মাত্রা ৮
মাত্রা, অতিপর্বিক ১০১
মাত্রাপূরণ ৯৬, ২০৫, ২০৮
মাত্রাবৃত্ত ৮, ৫৮, ৫৫, ১৮৯
মাত্রাবৃত্ত, নব্য ১৬, ৫৫
প্রত্ন ১৬, ১৭
প্রাচীনরীতির ১৫
বাংলা ১৫
ষণ্মাত্রপর্বিক ৯৮, ৯৯
মাত্রানমক বর্গের ছন্দ ২০৯
মাত্রাসংখ্যাত ৩৩
মাত্রাহরণ ২০৫
মাত্রিক পদ্ধতি ৫৬
মাত্রিক পর্ব ৮
মিল ১৪৮, ১৯৫
মিল, ত্রিদল ১৪৯, ১৯৫
দ্বিদল ১৪৯, ১৯৫
পর্যায়বন্ধ ১০৮
পংক্তিক্রমিক ১০৮

মিশ্রপর্ব ৮৪
মুক্তক, অমিল ১১৮
  গৈরিশ ১২৫
  প্রবহমান ১১৮
  মাত্রাবৃত্ত ১৩৯
  যৌগিক ১৩২, ১৯১
  রাবীন্দ্রিক ১২৫
  সমিল ১১৮
  স্বরবৃত্ত ১৩২, ১৩৩, ১৯২
মুক্তক ছন্দ ১১৬, ১৯১
মুক্তকল্প ছন্দ ১৪১
যতি ৫৪
  অর্ধ ১০৬, ১২৮
  উপ ৮৪
  পর্ব ৮১, ৮৪, ১০২
  পূর্ণ ১০৭
যতিলোপ ৮৩
যুক্তপর্ব ৮৩, ৮৪, ১০৪
যুক্তপর্ব, খণ্ডিত ১০৪
যুগ্মধ্বনি ৭, ৩৯, ৪০
যুগ্মধ্বনি, গৌণ ৪৭
  মৌলিক ৪৭
যুগ্মস্বর ২৮
যৌগিক ছন্দ ৪, ৪০, ৫৪, ৫৬, ১৮৯
যৌগিক পয়ার ৩৪, ১০৭, ১৯০, ২০
রামপ্রসাদী ছন্দ ২১
লয় ১৯১, ১৯৭
লয়, দ্রুত ৩১
লাইনডিঙানো ছন্দ ১০
লৌকিক ছন্দ ২৮
শার্দূলবিক্রীড়িত ১৪৫
শিখরিণী ১৪৫
শ্লোকবন্ধ ১৩৮
শ্লোকস্তবক ৬১
ষণ্মাত্রপর্বিক চৌপদী ১
ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দ ৭২,
ষাণ্মাত্রিক ১৯৭, ১৯৯, ২০১
সনেট ১০৮
সপ্তমাত্রপর্বিক ছন্দ ৭৪, ৭৫
সম্প্রসারণ ৪৩, ৪৫, ৬২
সংকোচন ৪১, ৪১, ৬৮, ৬১
সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ১৮৭
সংশ্লেষণ ৪৫, ৫০
সার্ধপর্ব ১০৭
সিলেবল ২৭, ২৮
স্বরপর্ব ২৮
স্বরবৃত্ত ২৮, ৫৪, ৮৫, ১৯০,
স্বরবৃত্ত, বেফাঁক ৯৭
স্বরমাত্রিক ১৯১
স্বরসংখ্যা ২৮
হরিগীতা ছন্দ ৭৬, ১০২

কবি ও কাব্য

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭১, ১৯৪
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২৯, ৮৬, ১০২, ১৪৮
উপনিষদ্ ১৭২, ২১৩
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯, ২০৭
কাদম্বরী ১৭২
কালীপ্রসন্ন সিংহ
  হুতোমপ্যাঁচার নকশা ১২৭
কাশীরাম দাস ৩৩
কৃত্তিবাস ৩১, ৪১
  রামায়ণ ৩১
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১২৩, ১২৭
  অভিমন্যুবধ ১২৩
  রাবণবধ ১২৩
গোবিন্দদাস ৩১, ৬৭, ৭২, ৭৭

চণ্ডীদাস ১৮৩
জয়দেব ৬০
    গীতগোবিন্দ ১৩, ১৫, ৬৮
দাশরথি রায় ১৪৮
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
    স্বপ্নপ্রয়াণ ৮০, ১১১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২০৯
    আলেখ্য ৯৫
    মন্দ্র ৪৩
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
    সিন্ধুদূত ৯০
নবীনচন্দ্র সেন
    কুরুক্ষেত্র ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৬
বাইবেল ২১৩
বিজয়চন্দ্র মজুমদার
    ফুলশর ৭২
বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৮২
বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
    শক্তিসম্ভব কাব্য ২২৭
বৈষ্ণবপদাবলী-সংগ্রহ ১৩
ব্রজমোহন রায়
    দানববিজয় ১২৬
ভারতচন্দ্র রায় ৭, ১৬
    অন্নদামঙ্গল ৩০, ৩৩, ৭৭, ১০২
মধুসূদন দত্ত ২৯, ৩৫, ১২৬, ১৪৯, ১৪
        ১৭৭, ১৮৫
    চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৪২
    পদ্মাবতী ১৬, ১২৫
    ব্রজাঙ্গনা কাব্য ৪১
    মেঘনাদবধ ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫
        ১০৫, ১০৬, ১৩০, ২০১
মহাভারত (সংস্কৃত) ৭৫
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
    চণ্ডীমঙ্গল ৩৩
মেঘদূত ১৭৬
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
    হাসিরাশি ৫১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
    উৎসর্গ ২৫, ১১৩
    কড়ি ও কোমল ৫, ১১, ২১, ৬২, ৬৯,
        ৭৩, ১২১
    কথা ২২
    কল্পনা ২২
    কালমৃগয়া ১৯
    কাহিনী ২২৯
    ক্ষণিকা ২৩-২৫, ৮৮
    খাপছাড়া ১৪১, ১৫১
    খেয়া ২৬
    গীতাঞ্জলি ১৯৪
    চিত্রাঙ্গদা ১০৮
    ছবি ও গান ৪, ২১, ১২১
    জন্মদিনে ১৩৪
    নবজাতক ১৯০
    নৈবেদ্য ১০৮
    পত্রপুট ১৭৮
    পরিশেষ ১১৮, ১১৩, ১৪৪, ১৭৭
    পলাতকা ১৩০, ১৩২, ১৯২
    পুনশ্চ ১৭৩, ১৭৮, ২১১
    পূরবী ৯৬, ১৩১, ১৯২
    প্রভাতসংগীত ৫, ২০, ৭৮, ১২১, ১২২
    প্রান্তিক ১১৩
    বনফুল ৯
    বলাকা ১১৬, ১১৮, ১২০, ১২৩, ১৯২
    বাল্মীকি-প্রতিভা ১৯
    বিসর্জন ১০৮
    বীথিকা ১৪০, ১৪২
    ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৩, ৬৬
    মহুয়া ১৪১, ১৯৩
    মানসী ৫-১০, ১৩, ৫৫, ৬০, ৬৩, ৭০,
        ৭৩, ১০৯, ১২১, ১৮৩, ১৮৯

ম্যাক্‌বেথ (অনুবাদ) ১৯
রাজা ও রানী ১০৮
লিপিকা ১৭৩, ১৯৪
শিশু ২৫
শৈশবসংগীত ৪, ৬০, ৭১, ১২১
সন্ধ্যাসংগীত ৪, ১২১
সানাই ১৩৪
সোনার তরী ৬২
রাজকৃষ্ণ রায়
নিভৃতনিবাস ১২৬
হরধনুর্ভঙ্গ ১২৬
রামপ্রসাদ সেন ২০, ২৮
লোচন দাস ৩২
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৮৫, ১৩১, ১৯৪, ২০৪
অভ্র-আবীর ৯৫
বেলাশেষের গান ৪৭
হসন্তিকা ৪৮
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
পদাতিক ৫১, ১৬৯
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
বৃত্রসংহার ৩৭

বিবিধ

ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ) ৪৮, ৫০, ৮৬, ১৬৫, ১৭১
প্রবাসী ১৩২৯ ফাল্গুন ১৩০
প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ৭৬
বিচিত্রা ১৩৩৮ কার্তিক ৫০
বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ ১৯
বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ শ্রাবণ ২১
ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন ১৯
ভারতী ১২৮৮ মাঘ ১২৩
ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ ২০
সবুজপত্রের যুগ ১১৫, ১২০, ১৩২, ১৭১

সংশোধন ও সংযোজন

শুদ্ধ পাঠগুলি পৃষ্ঠা- ও পংক্তি-ক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল।

১৮ বিবৃত, 'গন্ধা' ও কল্পনা
।১২ 'আবার' ওই ছন্দটির প্রতি
।১১ 'অক্ষরসংখ্যার' সামঞ্জস্য
।৩,৪ 'অচেনার' লাগি, পদপরশন মাগি '।'
।১৯ 'উদয়'-দিকপ্রান্ত-তলে
৪৮।২১ জ্যোৎস্না 'ডালের' ফাঁকে
। । । ।
।১৪ বউ্ কথা কও্
১০ চতুর্মাত্র'পর্বিক' ছন্দ
সমস্ত 'কবিতাটিই'
৪, ১৫ 'কোথাও', শব্দ'মধ্য'বর্তী যুগ্মধ্বনিকে
বজ্রসম বাজে '?'
১৯ নিখিল 'চিত্তে'
।৭ ফুল'পল্লব'-পুঞ্জিত
স্বপ্নপ্রয়াণ 'প্রথম সং'
৪ 'দ্বিতীয়টা'
২ তা আছে '।'
'চতুঃস্বর' পর্ব
১ পাঁচ 'সিলেব্ল্ও'
'গা- ছমছম'
১ একদিন সে- ফাগুন মাসে
'নূতন অধ্' ধ্যায়
'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ
জোর 'দেবার' সুবিধে
'যৌগিক' ছন্দ-গঠনের
উন্মুক্ত বাতাসে '।'
এবং 'সাধারণত' তাতে

টীকা ১৮৭০ সালে প্রকাশিত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শক্তিসম্ভব' কাব্যের ছন্দও সমিল প্রবহমান পয়ার। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায়, তারও কিছু পূর্বে আরেকখানি কাব্য এই ছন্দে প্রণীত হয়েছিল। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯১ দ্রষ্টব্য।

৬ 'চোদ্দ' মাত্রার সংকীর্ণ পরিসরকে

১১১।২০ রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যের (১৮৫৮) 'অরিসিংহের যুদ্ধ' দীর্ঘপয়ার ছন্দে রচিত। যেমন—

সেইদিন রাজা তথা পরিহরি ছত্রসিংহাসনে।
রাজপাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে॥
অরিসিংহ নাম তাঁর, অরিপক্ষে সিংহের সমান।
তিন দিন পরে শূর সসৈন্যেতে রণভূমে যান॥

—পদ্মিনী-উপাখ্যান, অরিসিংহে

দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যেও এই দীর্ঘপয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে

১১২।৫, ১৫ স্বপ্নপ্রয়াণ 'প্রথম সং'

১২৪।৪ 'করিতে' চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।

১২৫।২৫ 'শকাব্দের'

১৩৩।২৪ এই কাব্যের কোমল গান্ধার, শালিখ, অস্থানে, এবং লবছাড়া, এই কবিতাও অমিল স্বরবৃত্ত মুক্তক ছন্দে রচিত। 'কোমল গান্ধার' কবিতা বোধ করি এই ছন্দের প্রথম রচনা। ছন্দ (দ্বিতীয় সং), পৃ ১৮৭ পাদটী দ্রষ্টব্য।

১৬৭।৪ 'কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (১৩০৪ অগ্রহায়ণ) নাটিক ষণ্মাত্রপর্বিক ছন্দে হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদের বহুল প্রয়োগ দেখা যথা—

কা করে কুড়োতে হইবে ভিক্ষে
মার কাছে তাই 'করবি' শিক্ষে।
কে 'জানত' তুই পেট না 'ভরতে'
উলটো বিদ্যে 'শিখবি' 'মরতে'॥

—কাহিনী, লক্ষ্মীর প

চলতি ক্রিয়াপদের এ-রকম ব্যবহারে নাটকের প্রয়োজন অতি সুন্দরভাবে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ কবিতায় ছয় মাত্রার ছন্দে এ-রকম দৃষ্টান্ত খুব বি

১৭০।২৪ দ্বিতীয় পাদটীকাটি পরের পৃষ্ঠায় যাবে ১নং পাদটীকারূপে।

১৭১।১ 'সবুজপত্রে'র[১] পৃষ্ঠায়

২০০।১২ 'অপ্রমাণিত' করতে

২০৭।১২ 'ষণ্মাত্রপর্বিক' ছন্দ